# সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা : অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ

STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
6.6.85

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়-১৩৩৯

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : কুড়ি টাকা

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| গণনায়ক | ১ |
| বন্যা | ২১ |
| আণ্টা-বাংলা | ৪০ |
| ষড়যন্ত্র মামলার রায় | ৫৫ |
| চকাচকী | ৭১ |
| বৈয়াকরণ | ৮১ |
| ডাকাতের মা | ৯৬ |
| মুনাফা ঠাকরুণ | ১০৪ |
| পত্রলেখার বাবা | ১১৩ |
| বাহাত্তুরে | ১২৬ |
| অভিজ্ঞতা | ১৪৪ |
| চরণদাস এম, এল, এ | ১৬২ |
| দাম্পত্য সীমান্তে | ১৮০ |
| অলোকদৃষ্টি | ১৯০ |
| জোড়-কলম | ২০০ |
| বয়োকমি | ২১০ |
| জামাইবাবু | ২২২ |
| ওয়ার কোয়ালিটি | ২২[illegible] |
| দিগ্‌ভ্রান্ত | ২৩০ |
| বর্মি-কপালিয়া | ২৪০ |

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## প্রাক্‌-কথন

ভূয়োদর্শী সেই প্রবাদটির কথা স্মরণে রেখে সতীনাথ ভাদুড়ির শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছি—'যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না।' যে কোনো নির্বাচনে থেকে যায় কিছুটা দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, যেহেতু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি মাত্রেরই তা বৈশিষ্ট্য। একের দৃষ্টিতে যা শ্রেষ্ঠ, অন্যের দৃষ্টিতে তা হয়তো ভাল—শ্রেষ্ঠ নয়। সেজন্যেই বুঝি প্র. না. বি. তাঁর গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছিলেন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতরতার আপেক্ষিকতায়। তবুও যেহেতু নির্বাচকও মূলত একজন পাঠক, সেহেতু পাঠকের সাধর্ম্যের একটা সাধারণ ভূমিতে তাঁকে হতে হয় স্থিতিবান। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একবুক সাহস নিয়ে উচ্চারণ করা যায়—এই সংকলনের অন্ততঃ অধিকাংশ গল্পই শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং লেখকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠগল্প নির্বাচন করতে গিয়ে পাঠকের চেয়েও বেশি হন বিপন্ন এই কারণে যে স্রষ্টা এবং তাঁর আস্বাদকারীর মনোভূমি একসমতলে বিন্যস্ত নাও হতে পারে।

সতীনাথের গল্পসংখ্যা ষাটকে অতিক্রম করে গেছে। সমস্ত গল্পগুলি একত্র সংকলন করলে বিপুলকায় গ্রন্থ কিছু হয় না। তবুও নির্বাচনের প্রয়োজন এই ভেবে যে সতীনাথও অন্য অনেক লেখকদের মতো তাঁর সব গল্পকেই কালোত্তীর্ণ ভাবতেন না। সেজন্য তাঁর ভাবনায় বিশিষ্টতাদ্যোতক অধিকাংশ গল্প এতে সংকলিত হল। 'ভালো হত আরো ভালো হ'লে' নিশ্চয়ই—কারণ পাঠকের রুচির চাহিদা হয়তো আরও দু'একটি গল্পের জন্যেও।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের আগমন গল্পের পূর্ণ মঞ্জুষা নিয়ে নয়, উপন্যাসের বৃহত্তর সৃষ্টি নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। 'জাগরী' একই কালে তাঁর জন্যে অর্জন করেছিল অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা এবং অপরিমেয় জনপ্রিয়তা। অবশ্য জনপ্রিয়তাই নয় সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড। সতীনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত নন তাঁর ভূরি পরিমাণ রচনার জন্যে। মাত্র ছ'টি উপন্যাস এবং এর দশগুণ গল্পসংখ্যা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ। 'জাগরী' তাঁর রবীন্দ্র

পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যদিও সতীনাথ নিজে ভাবতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন—তা তাঁরা অর্জন করেছেন তাঁদের উপন্যাস দিয়ে নয়, ছোট গল্প দিয়ে। বস্তুতপক্ষে বাংলায় উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পই বুঝি অধিকতর সার্থক। সে অবশ্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে, বিক্রয়ের দিক থেকে এটা সত্য নয় সর্বাংশে। সতীনাথের ক্ষেত্রে বুঝিবা এটা নিঃশেষে সত্য, সেজন্য তাঁর ভাল গল্পগুলির সঙ্গে একালের পাঠকদের পরিচয়ের প্রয়োজন। প্রয়োজন এজন্যেই যে প্রতিটি গল্প স্বতন্ত্র চিন্তা, স্বতন্ত্র বিন্যাসের পরিচয় কজন গল্পকারই বা সার্থকভাবে উপহার দিতে পেরেছেন আমাদের। এ বিষয়ে সতীনাথ বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য বিধৃত আছে তাঁর অভিজ্ঞতায়—যা ছিল বিচিত্রচারী, যা ছিল তাঁর জীবনের অতি-সংলগ্ন। তাঁর জীবনের সেইটুকু অংশ, যা তাঁর সাহিত্য দৃষ্টির সন্নিকৃষ্ট। আমরা আলোচনা করছি নিতান্ত সংক্ষেপে। যদিও আক্ষেপ আমাদের আছে সতীনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমন্বিত তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্যে।

প্রায় ছিয়াত্তর বছর আগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের সমাসন্ন সন্ধ্যায় (১১ আশ্বিন ১৩১৩ সাল) সতীনাথের জন্ম। বাংলাদেশের পূজোমণ্ডপে তখন বিজয়াদশমীর ঢাকে বিসর্জনের বাজনা। কিন্তু সতীনাথ জন্মেছিলেন দূর পূর্ণিয়া জেলার ভাট্টাবাজারে। পূর্ণিয়া অবশ্য প্রচুর বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল। অনেক বাঙালীর মতোই তাঁর বাবা ইন্দুভূষণ সতীনাথের জন্মের এগারো বছর আগে থেকে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের আদিবাসভূমি ছেড়ে পূর্ণিয়ায় বসবাস করতে থাকেন আইন ব্যবসায়ের সূত্রে। মূলতঃ অধ্যাপক বংশের সন্তান সতীনাথের পড়াশুনো আরম্ভ হল পূর্ণিয়াতেই। বাড়ি আর স্কুলের চারপাশের অশথ, তেঁতুল, বট, সেগুন তাঁকে টানে নাড়ীর টানে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় সতীনাথ এম. এ. আর ল'এর চৌকাঠ পার হয়ে এলেন যথাক্রমে ১৯৩০ এবং ৩১-এ—পঁচিশ বছরের পূর্ণবয়স্কতায়।

বাবার মতো তাঁকেও আসতে হল আইন ব্যবসায়। বলাবাহুল্য, কিছুমাত্র আকর্ষণ এতে অনুভব না করেই। বাবার সঙ্গে সম্পর্কে একটা দূরত্ব ছিল বরাবরই। তাই অবসরগুলি কাটতো হয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের সাহিত্যিক আড্ডায়, নয় টেনিসকোর্টের চৌহদ্দীতে।

বাবা দূরে। মা এবং দিদি আরও দূরে—চিরদিনের নাগালের বাইরে সেই ছাত্রাবস্থাতেই। একটা অনাসক্তি, একটা detachment সতীনাথের

চিরসঙ্গী হয়ে গেল, যা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ। এবং একটু গৃহিণীপনাতেও ছিল মনঃসংযোগ। অনাসক্তির সঙ্গে জুটল আত্মনির্ভরতা। এই আত্মনির্ভরতা শেষ অবধি তাঁকে টেনে নিয়ে গেল রাজনীতির গভীর স্রোতের বর্তুলতায়। সতীনাথ ঠিক তখন তেত্রিশ।

অথচ সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের পশ্চাদ্‌পট দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ছিল না সারগর্ভ। তবুও গায়ে তুলে নিলেন চিরদিনের জন্য খদ্দর এবং পায়ে চপ্পল—কংগ্রেসে যোগদান করেছেন সতীনাথ। সভাসমিতি আর বক্তৃতায় কবে তিনি লোকচক্ষে হয়ে গেছেন সম্মানিত 'ভাদুড়ীজী'। এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় প্রায়—ইন্দুভূষণ নিত্য প্রার্থনা করতে লাগলেন পুত্রের রাজনৈতিক জীবনের অভিপ্রেত সাফল্য।

তখনকার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে প্রথম সারিতে যাবার স্বীকৃতিপত্র আসতো কারাবরণের ওয়ারেণ্টের মধ্য দিয়ে। এবং এই কারাবরণ ( ১৯৪০-৪৪ ) চলতে থাকলো বিভিন্ন পর্যায়ে হাজারিবাগ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলের সেগ্রিগেশন ওয়ার্ড আর 'টি' সেলের চার নম্বর সেলে।

একথা বলা কতখানি সংগত হবে জানি না ( কারণ জেলের জীবন কোনো পর্যায়েই প্রার্থিত নয় ) যে সতীনাথ যদি জীবনের একটা পর্যায় জেলে না কাটাতেন তাহ'লে হয়তো উকিল অথবা রাজনীতিক সতীনাথকে আমরা পেতাম। সাহিত্যিক সতীনাথকে সম্ভবত নয়। তাঁর পছন্দসই সেলে বসে তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন পড়াশুনো করার। 'তাঁর প্রথম প্রবল সাহিত্য রচনা' 'জাগরী'র রচনাস্থান এই জেলকক্ষ এবং উপকরণ এই জেলেরই অভিজ্ঞতা। এই জেলের আবদ্ধতার মধ্যেই ফণীশ্বরনাথ রেণুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় সৃষ্টি করেছে মনের মুক্তাকাশ। দু'জনেই দুজনের লেখা পড়তেন এবং হয়ে উঠতেন ক্রমশ সমৃদ্ধ। 'ময়লা আঁচল' আর 'জাগরী'র সম্পর্ক নিয়ে যে হীন ইঙ্গিতই করা হোক্ না—মানসিকতার সাধর্ম্য রেণুজী অর্জন করেছিলেন এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ভাদুড়ীজীর সান্নিধ্যে।

জেল থেকে বেরিয়েও সতীনাথ কংগ্রেস। তাঁর কাছে আসেন জয়প্রকাশ, কখনো বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তারও পরে এসেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তর নেতাদের চেহারাটা তাঁর কাছে অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে অনতিবিলম্বে। তিনি বুঝতে পেরেছেন—'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন রাজকাজ ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।' ১৯৪৮-এর সূচনাতেই কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। হলেন সি. এস. পি.-এর সদস্য। স্বস্তি নেই এখানেও। 'ক্ষুরধার intellect-এর ছেলে,

সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere' সতীনাথ কি পারেন 'মূর্খ, মিথ্যাভাষীর, সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকতে? অতএব রাজনীতির স্থায়ী ফসল ফলল সাহিত্যে —তাঁর 'গণনায়ক' ছোটগল্পে, স্বাধীনতা লাভের ঠিক অব্যবহিত পরেই।

সতীনাথ এতোদিনে খুঁজে পেলেন তাঁর অভীষ্ট পথ। সাহিত্য হ'ল তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং মতপ্রকাশের বাহন। প্রাক্-স্বাধীন নিপীড়ন যুগের 'জাগরী' ( ১৯৪৫ )-কে বাদ দিলে 'গণনায়ক' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র প্রথম চরণ ও 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিদেশ যাত্রার পূর্বেই। লণ্ডন হয়ে যেদিন প্যারিসে পৌছলেন, সেদিন তাঁর ৪৪তম জন্ম দিবস। প্যারিসে গিয়ে তাঁর মিশবার মতো আপনজন খুঁজে পেলেন গ্রামের লোকজনদের মাঝেই। জার্মাণ, অষ্ট্রিয়া, জুরিখ, ইটালি, লণ্ডন হয়ে ফিরে এলেন ভারতে পুনশ্চ। হৃদয় তখন বেদনায়-বিধুর। চিরাকাঙ্ক্ষিত রুশ দেশে যাবেন বলে রুশ ভাষাকে করেছেন আয়ত্ত অথচ রুশ দেশে ভ্রমণের অনুমতি পেলেন না। তাঁর বিশ বছরের স্বপ্ন শিশুটি পঙ্গু হয়ে ফিরে এল দেশের মাটিতেই।

রবীন্দ্র পুরস্কারের টেলিগ্রামটি প্যারিসে থাকতেই সতীনাথকে করেছিল নন্দিত-অভিনন্দিত। অথচ 'জাগরী' আর 'গণনায়ক' গল্প প্রকাশের মধ্যে, পাঠক মনোনিবেশ করলেই লক্ষ্য করবেন, প্রায় দু'টি বছরের ফারাক। অর্থাৎ সতীনাথকে সাহিত্য এখনও নিঃশেষে টেনে নিতে পারেনি তার সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আশ্রয়ে। বাগান—যা ছিল এই অকৃতদার সাহিত্য সেবকটির প্রথম প্রেম—তাই তখন তাঁকে রেখেছে অধিকতর সংশ্লিষ্ট। এবং বলা বাহুল্য অশেষ পুস্তকরাজিও।

লম্বা দোহারা বলিষ্ঠ গঠন মানুষটির দেহে পুরনো নিউমোনিয়া ব্যাধিটি পুনশ্চ ফিরে এসেছিল তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে। চিকিৎসায় গররাজি হলেন সতীনাথ। অনেকটা ইচ্ছে করেই। বরং রাজি হলেন উইল সম্পাদনা করতে। করলেনও তাই। তারপর সেই আদি প্রেম আদি প্রাণ বৃক্ষরাজির মধ্যে বিচরণশীল বহুরূপী মানুষটির টিউমারটি যখন ফেটে গেল নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যে, তখন কিছু রক্তের মধ্যে প্রাণটিকে বিস্তার করে বিদায় নিয়েছেন সতীনাথ। হাতে কি বইটি তখনও ছিল অনিঃশেষে ধরা?

'জাগরী', 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ( দুটি চরণ ), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'অচিন রাগিনী', 'সংকট' এবং 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসাবলী ও ভ্রমণমূলক রচনা 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' বাদ দিলে সতীনাথের ছোটগল্পগুলির সংকলনগুলি হ'ল— 'গণনায়ক' ১৯৪৮, 'অপরিচিতা' ১৯৫৪, 'চকাচকী' ১৯৫৬, 'পত্রলেখার বাবা'

১৯৬০, 'জলভ্রমি' । ৩০ মার্চ ১৯৬০ মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই, এছাড়া প্রকাশিত হয় 'সতীনাথ-বিচিত্রা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। অর্থাৎ শেষ বইটি ধরে সতীনাথের গল্পগ্রন্থ সংখ্যা সাত। এই সাতটি বইয়ে যথাক্রমে ৫, ৭, ৮, ৯, ৯, ১০ এবং ১৪—মোট ৬২টি গল্প সংকলিত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ অনুসারে এদের প্রকাশকাল এবং প্রকাশস্থলের একটি তালিকা নিবদ্ধ হল সতীনাথের গল্পরচনার ইতিবৃত্ত সন্ধানীদের জন্যে।

| **গ্রন্থনাম / প্রকাশকাল ॥** | **গ্রন্থধৃত গল্প ও** | **তার প্রকাশপরিচয়** |
|---|---|---|
| গণনায়ক : | গণনায়ক | দৈনিক কৃষক \| শারদীয় |
| | বন্যা | বিশ্বভারতী পত্রিকা \| মাঘ-চৈত্র |
| | আণ্টা-বাংলা | দেশ \| শারদীয় |
| অপরিচিতা : | অপরিচিতা | দেশ \| শারদীয় |
| | ফেরবার পথ | দেশ \| শারদীয় |
| | রথের তলে | দেশ \| শারদীয় |
| | ষড়যন্ত্র মামলার রায় | উত্তরা \| অগ্রহায়ণ |
| | অনাবশ্যক | দেশ \| ৫ মাঘ |
| | ঈর্ষা | দেশ \| শারদীয় |
| | পরিচিতা | স্বাধীনতা \| শারদীয় |
| চকাচকী : | চকাচকী | দেশ \| ১৫ শ্রাবণ |
| | বৈয়াকরণ | দেশ \| ২৯ পৌষ |
| | ডাকাতের মা | যুগান্তর \| শারদীয় |
| | বিবেকের গণ্ডি | পূর্বাশা \| আশ্বিন |
| | মুষ্টিযোগ | দেশ \| শারদীয় |
| | রাজকবি | চতুরঙ্গ \| মাঘ-চৈত্র |
| | তবে কি | দেশ \| ১৬ আষাঢ় |
| পত্রলেখার বাবা : | পত্রলেখার বাবা | দেশ \| ১৪ আষাঢ় |
| | কমাণ্ডার-ইন-চীফ | দেশ \| শারদীয় |

| গ্রন্থনাম / প্রকাশকাল ॥ | গ্রন্থধৃত গল্প ও | তার প্রকাশপরিচয় |
|---|---|---|
| | বাহাত্তুরে | দেশ \| শারদীয় |
| | কণ্ঠকণ্ডূতি | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | সাঁঝের শীতল | দেশ \| শারদীয় |
| | একটি কিংবদন্তীর জন্ম | যুগান্তর \| শারদীয় : |
| | পূতিগন্ধ | যুগান্তর \| শারদীয় |
| | অভিজ্ঞতা | যুগান্তর \| শারদীয় |
| | ধস | দেশ \| ১০ মাঘ |
| জলভ্রমি : | মহিলা-ইন-চার্জ | যুগান্তর \| শারদীয় |
| | জলভ্রমি | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | স্বর্গের স্বাদ | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | চরণ দাস এম.এল. এ | দেশ \| শারদীয় |
| | দাম্পত্য সীমান্তে | দেশ \| শারদীয় |
| | দুই অপরাধী | পরিচয় \| ভাদ্র |
| | পদাঙ্ক | দেশ \| ২৮ পৌষ |
| অলোকদৃষ্টি : | হিসাব নিকাশ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা |
| | জাদুগণ্ডি | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | ব্যর্থ তপস্যা | অমৃত \| শারদীয় |
| | পরকীয় সন-ইন-ল | দেশ—শারদীয় |
| | তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা |
| | জোড়-কলম | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | বয়োকমি | দেশ \| শারদীয় |
| | গোঁজ | অমৃত \| শারদীয় |
| | সরমা | দেশ \| ২৬ মাঘ |
| সতীনাথ-বিচিত্রা : | | |
| | জামাইবাবু | বিচিত্রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ |
| | ওয়ার কোয়ালিটি | পরিচয় বৈশাখ ১৩৫৪ |

| গ্রন্থনাম / প্রকাশকাল ॥ | গ্রন্থধৃত গল্প ও | তার প্রকাশপরিচয় |
|---|---|---|
| | আন্তর্জাতিক | বিশ্বভারতী পত্রিকা \| পৌষ |
| | তলানির স্বাদ | দেশ \| ৩১ জ্যৈষ্ঠ |
| | অজা-গজ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা |
| | রোগী | অমৃত \| ৮ ফাল্গুন |
| | দিগ্‌ভ্রান্ত | আনন্দবাজার \| শারদীয় |
| | মা আম্রফলেষু | দেশ \| শারদীয় |
| | ব্লড প্রেসার | অমৃত \| শারদীয় |
| | এক ঘণ্টার রাজা | দেশ \| ৯ মাঘ |
| | করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ | আনন্দবাজার \| বার্ষিক সংখ্যা |

ভূত, পঙ্কতিলক, মুনাফাঠাকরুণ—এদের প্রকাশ পবিচয় এখনো জানা যায়নি। তালিকা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সতীনাথের অধিকাংশ গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল অভিজাত পত্রিকাগুলোতে।

সতীনাথের গল্পগুলির উৎসভূমি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। 'গণনায়ক'-এর গ্রন্থ সূচনায় লেখক মন্তব্য করেছিলেন—'লেখাগুলি বিবরণমূলক। বিববণের যথাতথ্য সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছি,—পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে এবং আবও কয়েকটি কারণে।' এই 'প্রাণহীন প্রতিলিপি'গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সতীনাথের ডায়েরিসমূহে প্রথম স্থান পেতো, পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। সতীনাথের গল্পসমূহের পটভূমি তাঁর চেনা পরিবেশ—পূর্নিয়ার মানুষ, পূর্নিয়ার মাটি। সে কারণে তাঁর সাহিত্যচর্চাকে কেউ কেউ বলেছেন আঞ্চলিক। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রতিটি গল্পে জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত, তার আধার হয়েছিল তাঁর এই আঞ্চলিক মানসিকতা। কিন্তু যেখানে তাঁর সৃষ্টি এই মানসিকতা ছাড়িয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর সতর্কতা, আত্ম-সমালোচনা, মার্জিত এবং পর্যবেক্ষণের নিপুণতায়, সেখানে তিনি কালোত্তীর্ণ রচনার স্রষ্টা। সতীনাথ তা বলে শরৎচন্দ্র নন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কি সরোজকুমার রায় চৌধুরীও নন। এর প্রধানতম লক্ষণ হল সতীনাথ কখনো এক গল্প দুবার লেখেন নি।

সতীনাথের গল্পের আরেক লক্ষণীয় গুণ এর ব্যঙ্গপ্রবণ চরিত্র—যদিও তা সর্বাঙ্গে জড়িত নয়। এই রহস্য প্রবণতা যেমন আপাত-অসংগতি—যার সঙ্গে তাঁর আপোষ-মীমাংসার প্রশ্ন ছিল না—তা থেকে জাত, তেমনি সম্ভবতঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যের কারণেও।

সতীনাথের একটি গল্পের নাম 'অপরিচিতা'। এটি সতীনাথের একমাত্র প্রেমের গল্প সম্ভবতঃ। এ থেকে বোঝা যায় 'প্রেম' সতীনাথের গল্পে উপকরণ জোগাতে সমর্থ হয়নি। সতীনাথের মনের কাঠামো ছিল না এর অনুকূল।

তবে সতীনাথের গল্পে কি আছে আর? সতীনাথের গল্প প্রবল humanistic. এরই প্রতি পরতে প্রবেশ করতে গিয়েই সতীনাথ বদলে গেছেন অনবরত। অথচ পরিবর্তনে পরীক্ষার ছাপ নেই। ফরাসী সাহিত্য পড়েছেন—গল্পের আঙ্গিকে তাকে করেছেন স্বীকারও, অথচ তাঁর শরীর সর্বস্বতাকে বর্জন করলেন—এ অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নয়! আসলে স্বাধীনোত্তর দেশের বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র এবং নানা অব্যবস্থা তাঁর মনকে করে তুলেছিল চিন্তাখিন্ন। অথচ আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে সেই অব্যবস্থাকে মোকাবিলায় গেছেন এগিয়ে। সেজন্যেই তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গীরস হয়ে উঠেছে স্থিতিস্থাপকতা। এটাই সর্বব্যাপী শিল্পের একটা আবশ্যিক ধর্ম।

এই সংকলনে ধৃত সমস্ত গল্পগুলির টীকা রচনা আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হওয়া উচিতও নয়। বিশাল পাঠকমণ্ডলী তাকে বিচার করবেন তাঁদের রুচির বিভিন্নতায়, দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতায়। কেউ তুষ্ট হবেন গল্পে নিরাসক্তি লক্ষ্য করে, কেউ বা খুশী হবেন তার হাস্যরসের স্নিগ্ধতায়, কেউ বা শুচিস্নাত বোধ করবেন এর মননশীলতায়। এমন ক'টি লক্ষণ তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গল্পে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

'গণনায়ক' গল্পটি তাঁর উক্ত-নামধেয় গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প—যদিও তাঁর লেখা প্রথম গল্প নয় (তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি শ্রেষ্ঠ হয়তো নয়, তবে প্রথম গল্পের মর্যাদার কারণে 'জামাইবাবু' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে)। দেশ-বিভাগের সমসাময়িককালে 'গণনায়ক' রচিত হয়েছিল বলে আবশ্যিকভাবে তখনকার অনুভূতি এই গল্পে উচ্চারিত। দেশবিভাগের 'মণ্ডকা' লুটেছিল যে হিন্দু-মুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের তথাকথিত 'দেশ প্রেমিকেরা' তাদের যথার্থ স্বরূপটি এই গল্পে ধরা পড়ে আছে। 'গান্ধীটুপি' এই ব্যবসায়ের প্রথম মূলধন। নির্লজ্জতারও তো একটা সীমা থাকে।

এই একই অত্যাচার-অবিচার এবং অন্যায়ের পাহাড়কে 'বন্যা' ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানিনা, কিন্তু তার স্রোতে রিলিফ ক্যাম্পের

যথাযথ ক্রিয়াবারিধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এটা গল্পের আপাত একটা দিক। মনুষ্য চরিত্রের সেই চিরন্তন দিকটা—অসহায় মুহূর্তে ঐক্যবোধে জেগে উঠে পুনশ্চ সংকটান্তে বিভেদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ—এই গল্পে পরিগ্রহ করেছে চিরন্তনী বাণীরূপ।

কিন্তু 'আন্টা বাংলা' তুলনাহীন। বরেন বসুর 'রিক্রুট' যেমন 'রঙরুটে' পরিণত হয়েছিল, তেমনি প্ল্যান্টার্স ক্লাব হয়েছে এখানে লোকমুখে আন্টা বাংলা। পূর্ণিয়ার নীলকরদের সেই ব্যভিচার ও ঐশ্বর্য বুঝি নীলদর্পণকেও হার মানায়। বাঙালীর 'নো-এন্ট্রি' ক্লাবে আসতে পেতো বিরসা ওঁরাওদের মতো খ্রীষ্টান বেয়ারারা, তবু বিরসারাও বাঁচতে পারে না। নীলকরদের আভিজাত্যে ভাটা পড়লেও বিরসার নাতি বোটরা ছাড়তে চায় না সেই ক্লাব অসীম মোহে। শেষে এক দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে তাঁকেও মৃত্যুবরণে হতে হল প্রস্তুত। তবুও তার মোহাচ্ছন্ন চোখে জেগে ওঠে আন্টাবাংলার মহিমা। উপন্যাসের এক বিস্তৃত মহত্ত্বতায় পরিস্থাপিত এই গল্পে দাসেদের দাসজীবন প্রার্থনার পটভূমিকায় প্রভুত্ববাদী শোষণবাদিতার একটা উলঙ্গরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গল্পে পরিণত করেছে এর কাহিনীকে।

'চকাচকী' গল্পে এক প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিতের মিলন ঘটেছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। 'জাগরী'র হরদাহাটের ডুবে-ডুবেনী 'চকাচকী' গল্পে এসে প্রেমের ভিড় জমিয়েছে। বাস্তব এই চরিত্র দুটি যে বিবাহিত নয় সামাজিকভাবে তা কে জানতো। সবাই যখন ভাবছে ডুবে-ডুবেনীর প্রেম বিচ্ছিন্ন হবার নয়, তখন হঠাৎ দেখা গেল মৃত্যুশয্যায় শায়িত ডুবেকে ফেলে ডুবেনী গেছে পালিয়ে। দেশ থেকে ডুবের ছেলে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল। কিন্তু হঠাৎ কেন আমরা দেখলাম সৎকারক্রিয়া যখন সম্পন্ন প্রায়, তখন শ্মশানের 'ওপারের কাশবন নড়ে' উঠেছে। 'না কিছু নয়, শেয়াল বোধহয়।'

পুরুষের প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'বৈয়াকরণ' গল্পের দেহ। শুদ্ধাচারী পণ্ডিতের চোখে রূপহীনা ছাত্রীর দোষ প্রতিপদে, অথচ রূপসী ছাত্রী পায় দোষেও মুক্তি। ইন্দ্রিয়াসক্তির এই বৈষম্য এক সময়ে পণ্ডিতের মনে জাগায় আত্মবিচারণীর প্রশ্ন। স্থূল প্রবৃত্তির স্থূলতাকে অতিক্রম করে গেছে শেষ অবধি এই গল্পের সূক্ষ্মতা।

এমনি চরণ দাস এম. এল. এ., মুনাফা ঠাকরুণ, পত্রলেখার বাবা, ডাকাতের মা প্রভৃতি গল্পে নির্মম সত্য, পরিহাসের কাঠিন্য এমন নিপুণভাবে উচ্চারিত যে সতীনাথ যে কি চান তা বুঝতে পারি না। এজন্যেই কি

তিনি 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের কপালটুকিতে ঐ শ্লোক দুটি উচ্চারণ করেছিলেন—'কালির লেখন সবাই পড়ে, কালের লেখন গুমরে মরে।'

সতীনাথ যতই বলুন কালের লেখন তাঁর গল্পে অন্ততঃ গুমরে মরে না।

একথা বুঝতে পেরেছেন বলেই সতীনাথের জীবিতকালের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স সতীনাথের 'কালির লিখন'কে এমন সম্ভারে সজ্জিত করায় হয়েছেন সানন্দ প্রয়াসী। আমার মতো অকৃতজনকে এই দায়িত্বদানের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়িক মনের সবুজভাব যে হরিদ্রাভ হয়নি এখনো, তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। মন্মথবাবুর বাবা আমাকে অশেষ স্নেহে সিক্ত রেখেছেন দীর্ঘকাল—তিনি তারই পুত্রকৃত্য করলেন কিনা জানিনা। এই নির্বাচনে স্বভাবতই বিভিন্ন গল্প সংকলন, সতীনাথ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকযুগল, শ্রীগোপাল হালদারের চমৎকার বইখানি, শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সতীনাথ স্মরণে' এবং অন্যান্য নানা টুকরো রচনার সাহায্য পেয়েছি। এ সব ঋণ স্বীকারের আনন্দ তখনই কূল ছাপিয়ে উঠবে, যখন বাঙালী পাঠক এই শ্রেষ্ঠ গল্পকে বরণ করে নেবেন তাঁদের সহজ আনন্দে।

শ্রীননীগোপাল আইচ এবং শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ গ্রন্থ প্রকাশের নানা পরতে বিজড়িত—সে কথা স্বীকার না করলে 'হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।'

রোজভিলা
বর্ধমান

বারিদবরণ ঘোষ

# গণনায়ক

পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। পার্বত্য 'নাগর' এখানে খুব খামখেয়ালী নয়। তাই তার সোহাগের অজস্রতার উপর রূঢ় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কাঠের নড়বড়ে পুলটি। আগেকার যুগে উত্তর বাংলা থেকে উত্তর বিহারে ফৌজ পাঠাবার যে পথ ছিল, তারই উপর ছিল, এই সেতু। সেই রাস্তা এখনও পুলের দু'দিকেই আছে কিন্তু তার সে জলুস আর নেই। কেবল গত বছর কয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়াখোয়ার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে— বিহার আর বাংলার মধ্যের বে-আইনী জিনিসের কেনা-বেচায়। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। এই হাটের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে আর একটা রাস্তা, মালদা জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। অগণিত মাল-বোঝাই গরুর গাড়ি মালদা, দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি তিনদিক থেকে পুলের সম্মুখে এসে মিলিত হয়। গত বছর হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে, বকরিদের আগে শান্তিরক্ষার মুচলেকা নেওয়ার জন্য এসে, এস. ডি. ও সাহেবের মোটরকার যায় পথে আটকে। তার পর থেকে পথের গর্তগুলো বুজেছে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের সুধানী স্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ, চিনি, ঘি ; আর বাংলা দেশ থেকে আসে চাল আর ধান।

হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত জনসংখ্যা। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। গত বছরের কলকাতা, নোয়াখালি আর বিহারের নানা প্রকার বিকৃত খবর, তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ঠিকই, কিন্তু এর চিড়খাওয়া মনও কয়েক দিনের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার তাগিদে, পেটের ধান্দায় জোড়াতালি দেওয়া জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই পুরনো ফাটল দিয়ে ভাঙন ধরল হঠাৎ।

সুধানী-গোলার জহুরমল ভোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলির উপর

ত্রিপল বিছানো। রাতে খেয়ে-দেয়ে গাড়ি চড়লে আরুয়াখোয়ায় গাড়ি পৌঁছুবে কাল সকালে। বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছোট অবশিষ্টটুকু গাড়োয়ানকে দেয়। বিলটু গাড়োয়ান খুশী হয়ে ওঠে।

'গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন মুনীমজী। একেবারে আরুয়াখোয়ায় উঠবেন। ঘণ্টায় কোশ যায় গরুর গাড়ি, দূরের সফরে। আর ধরুন রাতবিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম। সকাল এক প্রহরের সময়, আরুয়াখোয়ায় গিয়ে দাঁতন করবেন।'

মুনীমজী আজকে খুব খুশী আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র সকলেই তাঁর কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করে। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, এমন কি কন্‌সী এল. পি. স্কুলের গুরুজী পর্যন্ত তাঁর কাছে খবর জিজ্ঞাসা করে। একে অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম; তাঁর উপর তাঁর মালিকের বাড়িতে 'বিজলী'তে খবর আনাবার কল আছে। সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করবার জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজীর কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদের কাছে অনেকখানি।

'দেখিস রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কী নিয়ে যাচ্ছিস, তাহলে বলিস, আলু; আলুর বোরাটা সম্মুখে আছে তো?'

'জী'।

'আমি পিছনেই শুই চিনির বস্তাগুলোর উপর। সম্মুখের দিকে চিনির বস্তাগুলো রাখতে পারলে একটু আরামে শোয়া যেত, ঝাঁকানি কম লাগত।'

'জী'।

'মীরপুরে একটু সাবধান থাকিস। ওখানকার গ্রাম এডভাইজরি কমিটির সেক্রেটারি ভারি বজ্জাত। তার উপর আজকাল দুনিয়াসুদ্ধ সকলে সেক্রেটারি হয়ে উঠেছে, দেখিস না? ওখানে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমাকে ডেকে দিবি। ও' গাঁখানা দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে যাস্; চুপচাপ গেলেই সন্দেহ করবে। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ। গাঁয়ের সেক্রেটারির দাম গড়ে টাকা দশেক। মীরপুরেরটাকে কিনতে টাকা পঞ্চাশের কম লাগবে না। সাবধান।'

'সে আর আমায় বলতে হবে না হুজুর। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব হেপাজৎ করে চালাব; খানা গর্ত বাঁচিয়ে।'

মুনীমজীর ঘুম আর আসে না। যে খবর তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তা শুনলে হাটসুদ্ধ লোক চমকে যাবে। এমন জবর খবর বহুকাল এ মুল্লুকের লোক

শোনেনি।—না, চিনির বস্তার পিপড়েগুলো আর ঘুমোত দেবে না। ঐ হাঁদা-গঙ্গারাম বিলট্টা কি বস্তাগুলো তুলবার সময় ঝেড়েও তোলেনি!

'এই বিলট্ ঢুলছিস না কি?'

'না, এই একটু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল হুজুর।' মুনীমজী জানেন যে এইবার বিলট্ আমতা আমতা করে বিড়ি চাইবে ঘুম ভাঙানোর জন্য। আর করেই বা কী বেচারি—সারারাত জাগতে হবে তো?—বিলট্ আবার ঐ ভাসাভাসা শোনা খবরটা পথের লোকদের দিতে দিতে না যায়।

'এই বিলটা। এই নে, দেশলাই রাখ্। আর আজকের সুধানীতে শোনা খবরটা কাউকে বলিস না যেন।' বিলট্ এতক্ষণ খবরটি সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি। মুনীমজীর কথার পর খবরটা মনে করবার চেষ্টা করে।—

'না, না, মুনীম সাহেব, সে আর আমায় বলতে হবে না। এতকাল আপনাদের নুন খাচ্ছি, কোনোদিন খবর বলতে শুনেছেন? গরীব মানুষ, আমাদের খবর দিয়ে দরকার কী?'

প্রসন্ন মনে সে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। তারপর বাঁয়ের বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে তার নিকট আত্মীয়ার উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করে।

মুসহর সাওয়ের দোকানের সম্মুখে গাড়ি পৌঁছায় প্রায় বেলা দশটার সময়।

'রাম রাম মুনীমজী!'

'জয়গোপাল! জয়গোপাল।'

মুসহর সাও আর তার ছেলে, গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির বস্তাগুলি বাড়ির আঙিনার ভিতর নিয়ে রাখে,—এখনি আবার অন্য লোকেরা এসে পড়বে।—

'চার বোরা মোটে?'

'কত ধানে কত চাল, তার তো হিসাব রাখো না! ঐ আনতেই হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, মিলের ছাপমারা বোরার উপর অন্য বোরা ঢুকিয়ে, ডবল বস্তার মধ্যে কোনো রকমে আনা।'

আলুর বোরাটা দোকানের সম্মুখেই নামিয়ে রেখে, সাওজী বলে 'এবার বলুন হালচাল।'

মুনীমজী গম্ভীর হয়ে যায়; প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দাঁতন আনতে বলেন। সাওজী বোঝে, আজ কিছু জবর খবর আছে। একে একে লোক জমতে আরম্ভ করে। বেশির ভাগই দোকানদার; দুচার জন দূর গাঁয়ের লোক, যারা চালের গাড়ি নিয়ে এসেছে হাটে। অজস্র 'রাম রাম মুনীজী'র

প্রত্যভিবাদন ইঙ্গিতে সেরে মুনীমজী এক মনে দাঁতন করতে থাকেন ; ভাবে মনে হয়, সংসারে তাঁর দিকদারি ধরে গিয়েছে ! সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে,—কতক্ষণে তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হবে, কতক্ষণে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনতে পাবে।—এইবার গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন ; আবার স্নানের জন্য তেল চাইবেন না তো—।

অন্য দিন হলে সাওজী স্নানের কথা তুলত ; এখন ইচ্ছা করেই খবর শোনবার লোভে সে কথা ওঠায় না। মুনীমজী বিলট্ গাড়োয়ানকে দুইজনের জন্য দই চিঁড়ে কিনবার পয়সা দেন।

'ভাল দেখে গুড়ও কিছু আনিস ; চিনি তো আর পাওয়ার জো নেই এক চিমটি, এই যবে থেকে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হয়েছে।'

তারপর মুনীমজী সমবেত লোকদের দিকে না তাকিয়ে, ট্যাঁকে কয়েকটি অবশিষ্ট খুচরো পয়সা গুঁজতে গুঁজতে বলেন, 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' কথার সুরে মনে হয় এ একটা সাধারণ খবর, হামেশাই এ রকম বহু জেলা পাকিস্তান হয়ে থাকে। এতক্ষণে তাঁর সম্মুখের লোকদের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়। ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে ; কোনো বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদেব বৈঠক ডেকেছেন যেন।

মুহূর্তের জন্য সকলে নীরব হয়ে যায়। শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আর সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করে—না জানি তার জেলার কী হয়েছে ; এইবার বুঝি মুনীমজী তাঁর গাঁয়ের কথা বলবে। সাওজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভয়ে,—তার দোকান, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার! সে সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে—'আর আমাদের আরুয়াখোয়া ?

'আরুয়াখোয়া তো পূর্ণিয়া জেলা, হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়,—এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর কারও টু ফ্যাঁ চলবে না।'

হাটের দোকানদাররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মুনীমজী এক সঙ্গে খবর বলে ফেলেন না,—আস্তে আস্তে টিপে টিপে খবর ছাড়েন। এতগুলি লোক উদগ্র উৎকণ্ঠায় তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, লাটসাহেবের বেতার বক্তৃতার মতো তাঁর কথার দাম আছে এখানে। এই সময়টুকুকে যত টেনে বড করা যায়,—এই মানসিক বিলাসের মোহ কম নয়।

দূরের হাটুরেরা চালের গাড়ি নিয়ে সকলের চেয়ে আগে আসে। তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে এসে জমেছে এখানে।

অছিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, 'মীরপুর কোথায় পড়ল হুজুর ?'

'মীরপুর কোন জেলায় ?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে অছিমদ্দী বলে, 'হরিশচন্দ্রপুর থানা।'

সাওজী বলে দেয়—'ও হল মালদা জেলা।'

'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।'

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে আর কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বজরগাঁর পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান আছে। সাওজী উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজীর সম্মুখে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন—'আর বজরগাঁ ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা ?'

'বাবাজী, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তা করবেন না। রামজীর আশীর্বাদে ওটা হিন্দুস্থানেই পড়েছে।'

'পড়বে না ? বাপ-পিতাম'র আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হল ! জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে ? বড়লাট ভারি সমজদার লোক। নারায়ণ ! নারায়ণ !'

নারায়ণকে প্রণাম করবার সময় অছিমদ্দীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কৌতূহল ও উদ্‌বেগের মধ্যে এতক্ষণ সকলে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন সকলেই তার দিকে তাকানোয়, সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।—এক কাসেম ছাড়া আর সকলেই তাকে অপরাধী মনে করছে। তার গাঁয়ের আসগর আলী পত্তনিদারই নিশ্চয় চেষ্টা করে তার গাঁ'কে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে।—

খবরটায় তার আনন্দ হয়েছে এইটুকু তার অপরাধ। তবুও সে বোঝে যে সে এখানে অবাঞ্ছিত। সে কাসেমকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। দূরে তাদের গাড়ীর কাছে গিয়ে অছিমদ্দী একগাল হেসে বলে, 'বাপকা বেটা আসগর আলী পত্তনিদার ; কথা রেখেছে। চল্, তাড়াতাড়ি ধান বেচে—যা দাম পাওয়া যায়। গাঁয়ে গিয়ে পত্তনিদারের সঙ্গে দেখা করে শোকরিয়া জানাতে হবে।'

কাসেম বলে, 'এখনই ফিরে চল ; ভয় করে হাটে আজ এদের মধ্যে।'

'ধান না বেচলে ওষুধ কিনবি কি দিয়ে ? একবার খরচ করে দু'জেলার চাল ধরার পুলিশদের মণ পিছু দুটাকা করে দিয়েছিস। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে

হলে আবার ঐ খরচ করতে হবে। এদিকে রোজগারের নামে খোঁজ নেই। এখানে হাজী সাহেব হাটের ইজারাদার। ভয়টা কিসের শুনি? গোলমাল হলে লেঠেল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে না!'

কাসেম সাহসে ভর করে ইজারাদারের কাছারিতে যায়—হাজার হোক মুসলমানতো ইজারাদার সাহেব! আগে হ'লে কাসেমের এ সাহস হ'তো না, কিন্তু গত বছর বিহারের কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কসেম দেখে যে সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত করেন। দূরের লোকদের তখনই বাড়ী ফিরতে বলেন। 'চারিদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষানগঞ্জ সাবডিভিসন হিন্দুস্থানে গেলেই হ'লো! এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কি?'

কাসেম আর অছিমদ্দীর মনে শেষের কথাটা ছাঁৎ করে লাগে। তুজনেই একসঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ করে ওঠে। উপস্থিত সকলে কটমট করে তাদের দিকে তাকায়। তা'রা তাড়াতাড়ি ইজারাদার সাহেবকে তাদের ধানটা কিনে নিতে বলে—যে কোন দামে হোক। নিজের 'মঝবে'র লোকের জন্য ইজারাদার সাহেব দরকার না থাকলেও তাদের ধানটা কিনে নিতে কর্মচারীকে আদেশ দেন। 'দরটা ঠিক করে নিও, মাস্থম, বুঝলে।' মাস্থম পুরানো কর্মচারী—সে মনিবের ইঙ্গিত ঠিক বোঝে।

ইজারাদার সাহেব সকলকে বোঝান। 'আরে মিয়া, লাটসাহেবের কথাও বদলায়—ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পাঁচশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্স—সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হলো এ জেলা হিন্দুস্থানে। কেবল কতগুলো টাকা অনর্থক খরচ হবে এই যা।'

হাট আর আজ জমলো না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজীর খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজীর দোকান লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায়। সকলেই মুনীমজীর নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দলবেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজী বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজীকে—কি জানি কোন মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজীর স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে

তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয়; আত্মীয় পরিজনদের বাড়ী থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না করে হাট ভালভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আর্দ্রস্বরে মুনীমজী তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত দেরী করা উচিত নয়। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোল টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

খানিক পরে ইজারাদার সাহেবের সেপাই খবর দেয় যে, তিনি মুনীমজীকে ডেকেছেন। তিনি যেতেই তাঁকে এক আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান ইজারাদার সাহেব। বেতারের খবর সম্বন্ধে কথাবার্তা হওয়ার পর ইজারাদার সাহেব বলেন 'আমার এ হাট এবার গেল। যাক, সে তো বরাতে যা আছে হবেই। এসব তো এখনো অনেক কাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক' বোরা চিনি এনেছো?'

'এনেছি চার বোরা। এক বোরা সাওজীকে দিতে হবে। তোমার তিন বোরা। এবার কিন্তু সত্তর টাকা মণ।'

'তাজ্জব কথা! এতদিন ছিল যাট টাকা, আজ হঠাৎ দাম বাড়ালে চলবে কেন? আর সাওজীকে আধবস্তা দাও—আমাকে সাড়ে তিন বস্তা। গতবারে যে চিনি দিয়েছিলে, তা ছিল একেবারে ভিজে।'

'সাওজীর তো মোটে এক বস্তা—তার মধ্যেও তোমার পাকিস্তানের দাবি! সে হয় না; ওকে এক বস্তা পুরো দিতেই হবে; কথার খেলাপ যেতে পারে না। আর চিনি ভিজবে কি করে? ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা। হ্যাঁ, আর জুটো করে পাটের বস্তা যে বিনা পয়সায় পাচ্ছ, তার দাম কি আমি ঘর থেকে দেবো নাকি? বললেই হলো, ভিজে! তার উপর মালদা আর দিনাজপুর এখন তো পাকিস্তান হ'লো। সেখানে এখন তো খুব ক'দিন মোফিল চলবে। ঈদের জন্য চিনিও লোকে এখন থেকেই যোগাড় করবে; আড়াই টাকা সের অনায়াসে তুমি পাবে।' মুনীম সাহেবের কথার বন্যায় ইজারাদার সাহেবের যুক্তিস্রোত ঘুলিয়ে যায়; থই না পেয়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। 'কি যে বলো মুনীমজী; মুসলমানের হাতে পয়সা কোথায়?'

'আচ্ছা যাও, দু টাকা কম দিও। হ্যাঁ, তবে আর একটা কাজ করতে হবে ইজারাদার সাহেব, আমাকে খান কয়েক গরুর গাড়ী ঠিক করে দিতে হবে। সুধানীর গোলায় চাল নিয়ে যাবে। এখানে অত রাখবার জায়গা নেই। বর্ষার দিন, বাইরে পড়ে রয়েছে। তোমার হাতে আছে অনেক গাড়োয়ান।'

'আচ্ছা সে হয়ে যাবে সব ঠিক। ভোর রাত্রে গেলেই হবে তো?'

মাসুম এসে খবর দেয় যে, হাটের লোকরা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা দল বেঁধে কাছারিবাড়ীর মাঠে ঢুকছে। তারা মুনীমজীকে ফেরত চায়—আপনি নাকি তাঁকে আর জিন্দা ফিরতে দেবেন না।

বাইরে তুমুল কোলাহল শোনা যায়।

'লোকগুলো পাগল হলো নাকি!'—ভয়ে ইজারাদার সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

দু'জনে এক সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা ইজারাদার সাহেবকে দেখে, হাটুরেদের সম্মুখে আগিয়ে দেয়, হাজার হোক তাদের জমিদার তো। মুনীম সাহেব এসে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। স্বর নামিয়ে সম্মুখের লোকদের বলেন, 'ওর সাধ্যি কি আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ী ফেরনি? আজকালকার দিনে বাড়ী ঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভাল। তোমরা তো সব বোঝই। আমি আর কি সলা দেবো! নিজের নিজের গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভাল হয় ক'রো।—মেয়ে-ছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁসিয়ার থাকবে। আমরা তো সুধানী বাজারেও জানানাদের রাখতে সাহস পাইনি—সব রাজপুতানায় রেখে এসেছি এই মাসে। যন্তপাতির কর্ম, বলাতো যায় না, কি বলতে কি বলে। শালা লাটসাহেবের মুখ ফসকে পূর্ণিয়াটা বেরুলেই তো সব চৌপট হয়েছিল—সাবধানের মার নেই।'

রাজবংশীদের সরু সরু চোখগুলি ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'পোলিয়া' মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে।

'আর এখন নুন কিনতে হবে না'; 'ওরে বাচ্চিদাই, কোন দিকে গেলি শীগ্‌গীরি আয় না', 'ওঠ নবাব পুত্তুর, এখনও জাবর কাটছে!' 'আজ দাম চাই না, খালি তুমি ওজন করে নিয়ে রাখো'—'এই টাকাটা মুনীমজী আমানত রাখবেন গোলায়, কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না'—

আতঙ্কমুখর পরিবেশ সুস্থ মনকেও দুর্বল করে তোলে। অল্পক্ষণের অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার পরই হাট নীরব হয়ে আসে।

পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো—এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে দলে মেয়ে, ছেলে, গরু, ছাগল। ছোট ছেলেটির মাথায় পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে হাড়জিলজিলে

কালাজ্বরের রুগী, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ী—পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি! এতদিন ছোট্‌টো ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মত, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে; যদি ক্ষেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কি—এখন তাল পাকার সময়।

পূর্ণিয়া আর দিনাজপুর, দুটো ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনটাই 'নাগরে'র উপরের পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বড়ে পুলটার উপর খুব ধকল চলেছে আজ ক'দিন থেকে। পুলের দু'দিকে ক্যাম্প পড়েছে। মুনীমজী কলকাতার এক রিলিফ সোসাইটীকে বলে ক'য়ে শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আক্‌য়াখোয়ায় একটি ক্যাম্প খুলিয়েছেন। লোকাল বোর্ডে খবর দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছেন। সব কাজ হ'চ্ছে মুনীমজীর সহযোগিতায়।

কতলোক মুনীমসাহেবের ক্যাম্পে সুখ দুঃখের কথা বলতে আসে। তিনি কাউকে আশ্বাস দেন, কাউকে রামজীর শরণ নিতে অনুরোধ করেন, কাউকে ধৈর্য ধরতে বলেন; কারও কাছে বা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলনীতির নিন্দা করেন। তারপর রিলিফ কমিটির চিঁড়ে-দইয়ের স্লিপ কাটতে কাটতে বলেন 'ক'জন? পাঁচ; এক বাচ্চা? আচ্ছা ঐ ঝাণ্ডাওয়ালা তাঁবুতে মোহর করিয়ে সাওজীর দোকানে নিয়ে যাও। সব ঠিক হয় যাবে।' কৃতজ্ঞতায় শরণার্থীর মন ভরে ওঠে—এই বিপদের সময় মিষ্টি কথাই বা ক'জন লোক বলে!

পুলের ওপারে রেলিঙের উপর লাগানো হ'য়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকেদেওয়া হয়েছে কংগ্রেসী তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চীৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান', 'বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্তান'; এদিকের দল চ্যাঁচায় 'বন্দে মাতরম্‌', 'জয়হিন্দ্‌।'

তিক্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হতে দেরী লাগে না। এই বুঝি কোন কাণ্ড হয়, হয়! এদিকে গুজব ওঠে যে ওরা পুলে আগুন লাগিয়ে দেবে—যাতে জিনিসপত্র নিয়ে ওদিক থেকে আর কেউ না আসতে পারে। অমনি এদিককার লোক গর্জে ওঠে, 'এদিকের গরু মোষ আর যেতে দেবো? আমরাই আগে পুলে আগুন ধরাবো।' এপারের লোকদের মুনীমজী ঠাণ্ডা করে; ওপারের লোকদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়—

মুনীমজী তাদের বোঝায়, 'দু'দিন সবুর করতো। দেখোনা কি হয়। মহাত্মাজী কি আর চুপ করে বসে আছেন? লাটসাহেবকে দিয়ে 'কমিশন' বসিয়েছেন। হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানী লোক, রাজার বাড়ীর ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যাও সকলের মুখেই ঐ একই কথা, 'কমিশন', 'কমিশন'।

শ্রীপুরের চুন্নালাল রাজবংশীর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে। মুনীমজী সব খবর বলেনা না কি; তাই তাকে সকলে চালের গাড়ীর উপর বসিয়ে মুধানী ইষ্টিশনে পাঠায় 'কমিশনে'র খবর আনতে। চুন্নালাল ভয় পাবার ছেলে নয়; সে সোজা পয়েন্টসম্যান সাহেবকে 'কমিশনে'র খবর জিজ্ঞাসা করে। পয়েন্টসম্যান বলেছিল যে কমিশনের খবর তো বেরিয়েছে। তাদের মাইনে আর ভাতা বাড়বে। শ্রীপুরের লোকেরা এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি।

কমিশন! ইজারাদার সাহেবের পুরানো সেপাই ইসরাইল লাঠি ঠুকে বলে 'কমিশন নেওয়া হয় গোড়াতে, পাট খরিদের উপর 'ধর্মদায়' ব'লে। কোন মুসলমান আজ থেকে আর এ দিচ্ছে না। বের করাচ্ছি কমিশন। আরুয়াখোয়া হাটিয়া হিন্দুস্তানে এলেই হলো!'

দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবা শুকনো উরুতে তাল ঠুকে বলে 'এই হাটের তোলা মুসলমান ইজারাদারকে কোন লোক দিও না। ঘর দোর জমি জিরেৎ ছেড়ে হিন্দুস্তানে এসেছি কি এমনি। সেখানে হিন্দুকে মেয়ে-বেটী নিয়ে থাকতে দেবে না শুনেছি। এখানেও আবার মুসলমানকে তোলা দিতে হবে?' —সে আরও কত কি বলতে যাচ্ছিল, দর্পণের মা তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যায়— বদলোকদের চটিয়ে লাভ কি?

হাটের তোলা দেওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মুনীমজী সাওজীকে বলে, 'দেখছো, ইজারাদার সাহেব আর রাতে এ পারে থাকে না। ওদিককার ক্যাম্পের খরচ কি ওই চালাচ্ছে নাকি?'

'না, চাঁদা তুলে চালাচ্ছে ইজারাদার সাহেব। গোপালপুর থানাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কলকাতায় কমিশনকে টাকা খাওয়াতে হবে বলে, ও আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলছে।'

মুনীমজীর চোখ দু'টি জল জল করে ওঠে; ইজারাদার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় না ঈর্ষায়, ঠিক বোঝা যায় না।

সাওজী আবার বলে 'তা মুনীমজী, আমরাও হাট থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দিতে পারি, গোপালপুর থানাকে পাকিস্তান থেকে বাঁচানোর জন্য। ইজারাদার ভারি ফন্দিবাজ লোক—কমিশনকে আবার টাকা দিয়ে হাত না

করে নেয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই আমাদের প্রাণটা বাঁচে, পূর্ণিয়া জেলাটাও বাঁচে।'

মুনীমজী এই হিসাবই এতক্ষণ মনে মনে খতিয়ে দেখছিলেন। তাঁর হিসাবে ভুল হয় না। এখন চাঁদা তুলে যা লাভের সম্ভাবনা, তার অনুপাতে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী। এক করলে হয় একটি জিনিস—চাঁদা তুলে চুপচাপ থাকো, যদি পাকিস্তানে যায় জায়গাটা তা'হলে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে, বলা যাবে যে হাকিমদের ঘুষ খাওয়ানো গেল না; আর যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হ'লে টাকাটা নিয়ে বললেই হবে যে কমিশনকে খাইয়েছিলাম। ——না, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যা রয় সয় তাই ভাল।—

'না না সাওজী, ওসব হাঙ্গামায় আমি পড়তে চাই না। ওর জন্য কংগ্রেস সরকার রয়েছে, মহাত্মাজী রয়েছেন, আমার মালিক রয়েছেন। কিন্তু পুলের দুদিকেই যে মাল আটকাচ্ছে, তার কি উপায় করা যায় বল। বর্ষার নদী। অন্য সময় হলেও না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেত!'

'দুদিককার ধান চালের পুলিশও দেখছি, আজ কদিন থেকে যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা হয়ে উঠেচে। আজ দেড়শো টাকার লোভ ছেড়েচে—দেড়শো মোষ যাচ্ছিল মজঃফরপুর থেকে মেমনসিং। ওপারের চালের অফিসারও ক'দিন থেকে টাকা নিচ্ছে না, এ হাটতো উঠে যাবে দেখছি। সাথে কি আর ইজারাদার হাটে থাকার অভ্যাস কাটাচ্ছে!'

'হাকিম টাকিম আসতে পারে, এই ভয়ে নিচ্ছে না বোধ হয়। দুচার দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। এত ভাবনা কিসের? রিলিফের কাজ তো তোমার দোকান থেকে চলছেই। এত এখন ভাববার দরকার কি তোমার? কারবারী লোক আমরা, কোন রকমে দুপয়সা রোজকার করবই।'

সাওজী এ কথায় সায় দেয় বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না——রিলিফের জিনিসের লাভের থেকে টাকায় চার আনা দিতে হবে, মুনীমজীকে—কত আর থাকবে।———

'এক মানুষ হয়েছিলো পাটের গাছগুলো,' 'গোঁয়ার গোবিন্দ জামাই এলো না, মেয়েটার কপালে অনেক খোয়ার আছে', 'ওলাউঠায় গাঁ যখন উজার হ'য়ে গিয়েছিল তখনও গাঁ ছাড়িনি—নিত্য নূতন স্বরে, নূতন ভাষায় শোনা যায়,—একই দুঃখগীতির পুনরাবৃত্তি।

দর্পণ সিং বাবাকে সান্ত্বনা দেয়, যাক, মেয়েদের ইজ্জৎ বেঁচেছে। বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে, 'আমার চাকর এরফান আমার ষাট বিঘা জমি পেয়ে যাবে। এই হ'লো ভগবানের বিচার!'

ইজারাদার সাহেব দিনের বেলায় কাছারি ঘর থেকে দেখে তিনরঙা ঝাণ্ডাটি——হাওয়ায় উড়ছে আর ঐ সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে নৈরাশ্য, বিদ্বেষ, আর আতঙ্কের বিষ—যার প্রতীক ঐ তিনটি রং——ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে ওপারের সবুজ পতাকার কাছের ক্যাম্পে চলে যাই। এতটুকুর মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে কত পার্থক্য। একটি তার নিজের। এর নীচে আছে শান্তি, সুখ, অনাবিল আনন্দ, 'অল হিলালে'র ছায়ার তলের নিরাপত্তা।— কিন্তু এই রাজবংশীগুলোর ভয়ে, নিজের জমিদারি ছেড়ে পালালে আর কখনও ভবিষ্যতে এ হাট থেকে, এক পয়সাও তোলা উসুল করা যাবে? কমিশনের রায় কি হবে বলা যায় না—সবই খোদার মর্জি।—

দর্পণ সিং-এর স্ত্রীকে সাওজীর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'তোমরা তো পুলের ওপারে পাকিস্তান হওয়ার পর একদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রসুন ফোড়নের দুর্গন্ধ নাকি? লোকগুলো শাক ডাঁটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি আরম্ভ করেছিল বুঝি?'

প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে সে কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আপন মনে বকে চলে—'লকলকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে একদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি! সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল না কি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল।—চ্যালাকাঠ দিয়ে আসবার সময়, উনুনটা ভেঙ্গে দিয়ে এলাম,—কি সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম,—তাতে রাঁধবে কিনা অরফানের চাচী,—আর যে জিনিস রাঁধবার নয় সেই সব জিনিস!—বিপদ হ'য়েছে ঠাকুরের মূর্তিটিকে নিয়ে। ঐ জন্যই ছিল ভয়। ঠাকুরের অসীম কৃপা।—আমরা বোকা মূর্খ মানুষ, তাই তাঁর ভাবনা ভেবে মরি। দেখি আবার পুরুত মশাই ও সম্বন্ধে কি বিধান দেন। এখানে ছত্রিশ জাতের মধ্যে ভাল করে যে দুটো ভোগ দেবো সে উপায়ও রাখলে না ঠাকুর,—'

দর্পণের স্ত্রী ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে বোঝে যে দু'জনেরই অজ্ঞাতে কখন সাওজীর স্ত্রী তার বেনে-সুলভ হিসাবনিকাশের মন ভুলে গিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে। দরদী হাতের স্পর্শ ছাড়িয়ে ঠাকুরকে যুক্ত করে প্রণাম করতেও মন চায় না।—মাত্র তিন দিনের পরিচয়—কোন দূর দেশ সেই বালিয়া—সেখানকার বেনে বৌ;—তার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে দর্পণের স্ত্রী নিজের মনের গুরুভার লাঘব করার চেষ্টা করে।—

দুরদৃষ্টের আকস্মিকতা লোকদের এ কয়দিন অভিভূত করে ফেলেছিল।

দিন কয়েকের মধ্যে বিপদ গা সওয়া হ'য়ে যায়, আতঙ্কের তীক্ষ্ণ অনুভূতি আসে ভোঁতা হয়ে। গরুর গাড়ীর ভাড়া আর খাবারের দাম যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, আবার কমে আসে। চালের পুলিশদের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার তিন দিনের বাতিক সেরে যায়। গাড়ী গাড়ী চাল পুল পার হ'য়ে আসতে আরম্ভ করে, হাজারে হাজারে গরু মোষ ওপারে যায়।

সব কাজের মধ্যেও লোক কমিশনের খবরের জন্য ব্যস্ত। মুনীমজী প্রথম হিড়িকেই যত চাল কিনেছেন, সব পাঠাচ্ছেন স্বধানীতে; প্রত্যহ অজস্র গাড়ীতে বোঝাই করে। মুনীমজীর কথা স্বতন্ত্র, তাই তাঁর ভাড়া কম লাগে। লোক তাঁর কাছে এত কৃতজ্ঞ যে তিনি যদি বিনা পয়সায়ও গাড়ী নিয়ে যেতে বলেন,—তাহ'লেও গাড়োয়ানরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো হয়তো।—

'কিন্তু মুনীমজী সাচ্চা আদমী;—হিঁদুর ছেলে, আর এদিককার মছলী খাওয়া হিঁদু নয়। রাজপুতানা, বীরের দেশ,—রাজা আর শেঠের দেশ,—তারা মুসলমানদের কাছে একদিনের জন্যও মাথা নীচু করে নি। তিনি মাগনা তোমাদের গাড়ী নেবেন না; বেগার গাড়ী নিতে পারে মুসলমান ইজারাদার। মুনীমজী ওয়াজিব ভাড়া দেবেন তোমাদের।'

'সে কথা আর বলতে হবে না সাওজী। কমিশনের খবর কবে বেরোবে?'

'কে জানে। শুনছিতো দু এক দিনের মধ্যে। মুনীমজী বলছিল যে মুসলমানরা আবার এতেও বখেরা লাগিয়েছে।'

'সাওজী, মুনীম সাহেবের চিঠি আজ আমার হাতে দিও।'

'তুই তো পরশু নিয়েছিলি শুকদেব। আজ আমাকে দিও।'

'আমাকে' 'আমাকে'—কমিশনের খবরের জন্য মুনীম সাহেব প্রত্যহ স্বধানী গোলাতে যে চিঠি দেন, সব চালের গাড়ীর গাড়োয়ানই, তা নিয়ে যাবার সৌভাগ্য পেতে চায়।

সিরিলাল সাওজীকে জিজ্ঞাসা করে, 'স্বধানী গোলায় যে লাট সাহেবের খবর দেওয়ার কল আছে, তাতে যত খবর আসে সব কি দোকানের লম্বা খাতায় লেখা হয় না কি? সেদিন মুনীমজীর চিঠি গোলায় দেওয়ার পর সেটা তারা খাতায় লিখে নিল; আর খাতা থেকে দেখে দেখেই জবাবের চিঠি দিল।'

'হবে। ওসব বড় বড় গোলার কাণ্ড কারখানা। আমরা আদার ব্যাপারী—ওসব খোঁজও রাখি না। রামজীর কৃপায় আর তোমাদের সেবা করে বালবাচ্চাকে দুটো খেতে দিই। মিশ্রিলাল আজ চিঠি নিয়ে যাবে। আর সিরিলাল, কাল মুনীমজী নিজেই যাবে স্বধানীতে। তোর গাড়ীতে

একটা টপর দিয়ে নিতে পারবি না? আচ্ছা, আমি যোগাড় করে দেবো। ইজারাদার সাহেবতো তার উপর দেওয়া গাড়ী মুনীম সাহেবকে দিতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু মুনীমজী সে বান্দাই নয়। ও মরদ কা বেটা। ইজারাদারের কাছ থেকে এক কানাকড়ির উপকার নিতেও রাজী নয়। কাল চাই একজন বিশ্বাসী গাড়োয়ান। লোকের আমানতী টাকা চাল কেনার পরেও কিছু বেঁচেছে মুনীমজীর কাছে। সেই সব পাবলিকের টাকা গোলায় রাখতে হবে। চোর-ছ্যাঁচড় ভরা হাটের মধ্যে কি অত টাকা রাখা যায়? গোলা থেকে পরে, গোলমাল মিটলে এই পুরো টাকা ফেরৎ দেবে সকলকে;—এক পয়সাও কেটে নেবে না। তেমন চোর গোলাই নয়: ডোকানিয়াজীর গোলা—লাটসাহেব পর্যন্ত জানে।'

'মুনীমজী!' 'মুনীমজী!' যেখানে যাও কেবল মুনীমজীর গল্প।

তাঁর স্নানাহারের পর্যন্ত সময় নেই। দিন-রাত কাজ করছেন, কি করলে শরণার্থীদের একটু সুখ-সুবিধা হয় কেবল তারই চেষ্টা!

দর্পণ সিং-এর বাবাকে তিনি আগাম টাকা দেবেন বলেছেন। বুড়ো চেয়েছিল এরফানকে ঠাণ্ডা করতে—সে কিনা রাজবংশীর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। সব বিপদ তুচ্ছ করেও মুনীম সাহেব এরফানকে সায়েস্তা করবার জন্য, দর্পণের যাট বিঘা জমি কিনে নেবেন কথা দিয়েছেন। আর গোলার জোতের অধীনে পনর বিঘা বন্দোবস্ত দেবেন বলেছেন দর্পণকে—অবিশ্যি কমিশনের রায়ের পর।

মুনীম সাহেবের কর্মক্ষমতায় বিহার বাংলা দুই দিককার সরকারী কর্মচারীরাই সন্তুষ্ট, কলকাতার রিলিফ সোসাইটি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; হিন্দুরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, মুসলমানরা তাঁর উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ নয়।

'পনেরই আগষ্ট, হিন্দুস্থান আজাদ হবে'—মুনীমজী সব দোকানদারকে খবর দেন।

'আর পাকিস্তান?'

'হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও আজাদী দিতে হবে ঐ দিন।'

সমবেত শত শত লোক প্রশ্ন করতে চায়—'ওটা কি আর কিছুতেই আটকানো যায় না?' যেন এই নীরব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে বাধ্য হয়ে মুনীমজী জবাব দেন 'এই নিয়েই যদি খুসী হ'স তো নে।' মুসলমানদের প্রতি একটা দমকা উদারতার ঝাপটায়—'দিন কয়েক পরেই ঠেলা বুঝবি'—কথা কয়টা জিভে আটকে যায়।

দিনাজপুর আর মালদার শরণার্থীদের ভীতিবিহ্বল মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এক সঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করে—'কমিশন' 'আর কমিশনের রায় ?'

'ও বেরোবে দিন কয়েক পর। তবে পূর্ণিয়া জেলা, মানে এই আরুয়াখোয়া পাকিস্তানে যাবে না একথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।' পূর্ণিয়া জেলার লোকরা, বিশেষ করে আরুয়াখোয়া বাজারের দোকানদাররা চীৎকার করে ওঠে 'গান্ধীজি কী জয়।' ছাতা, খড়ম, গামছা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। যদু পানওয়ালা আনন্দে নাচতে নাচতে, তার সমস্ত পানের খিলি হরিরলুঠ দিয়ে দেয়।

মালদা, দিনাজপুরের অনেক লোক পূর্ণিয়া জেলায় মুনীমজীর কাছ থেকে জমি দেওয়ার কথাটা আবার তোলে।

পূর্ণিয়া জেলার এদিকটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের এলাকা। পড়তি জমি পড়ে আছে কোশের পর কোশ···অভাব পয়সার, অভাব চাষ করবার লোকের।

——এত সিকমীদার পাওয়া যাবে।—তার উপর প্রচুর সেলামী। অধিকাংশই জোত আর রায়তী জমি। ভাগ্য ভাল—না হ'লে আবার মিনিষ্ট্রি জমিদার ওঠাচ্ছে, কি হ'ত বলা যায় না।—ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির ছবি মুনীমজীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের অনুনয়ের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান—নেওয়া না নেওয়া তোমাদের ইচ্ছে, আমার ওতে কোন আগ্রহ নেই।

'তবে একটা কথা! জমি বিলি ব্যবস্থার কথা আসবে পরে। এখন যে এই সব শরণার্থীরা এত যে গরু-মোষ নিয়ে এসেছে, এ তো যেখানে সেখানে চিরকাল চরতে পারে না। গেরস্তরা তা চরতে দেবেই বা কেন? এদের চরবার জন্য আমি মাসিক হারে জমি ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি—সস্তায়; কিন্তু দেওয়া চাই নগদ।'

সকলেই একটা সমস্যার সুরাহা পেয়ে তাঁর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। কার কাজ আগে হবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

এদিককার এই জয়ধ্বনি পুলের ওপারেও চাঞ্চল্য জাগায়। 'কী! কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই কিছু ঘটে থাকবে। ঘাবড়াস্ না।'

টিনের চোঙটা হাতে নিয়ে একবাল চিৎকার করে 'নারে তকবীর।' অপর সকলে বলে 'আল্লাহো আকবর'—'মুর্দা না কি? জোরে বলতে পারিস না?

ওপারের আওয়াজকে ডুবিয়ে দিতে হবে।'—হানিফ একৃবাল, আরও কয়েকজন জয়ধ্বনির কারণ জানতে বেরোয়।—

'তোরা ততক্ষণ থামিস না যেন বুঝলি।'

'কে যায় গাড়িতে ?'

'শ্রীপুরের দর্পণ সিং-এর জামাই আর মেয়ে।'

'সার্চ কর গাড়ি, পাকিস্তান থেকে আবার কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছে না তো।'

সঙ্গে সঙ্গে এরফান এসে পড়ে।—কে, দিদিমণি ? জামাইবাবু ?—যেতে দাও গাড়ি। পালিয়ে যাচ্ছ কেন ? আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কী দিদিমণি ? খোকাবাবু কত বড়টা হয়েছে দেখি। ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। কিছু ভয় নেই দিদিমণি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার এসো। তোমাকে তো, জামাইবাবু, ভেবেছিলাম মরদ। তুমি আবার পালাও কেন ?'

জামাইবাবু আমতা আমতা করে। এরফান খোকার হাতে একখানা কাগজের তৈরি লীগের ঝাণ্ডা দেয়—'কেমন সুন্দর দেখতে, না খোকাবাবু ?'

তারপর সঙ্গে গিয়ে গাড়িখানা পুল পার করে দিয়ে আসে। বিদায় নেওয়ার আগে জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা করে—'রাজা হেঁটে, আর পেরজা (প্রজা) গাড়িতে।'

খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলার যেসব মুসলমান একৃবালের সঙ্গে ছিল, তারা ইজারাদারের উপর চটে আগুন হয়ে ওঠে।—ওটা চাঁদার টাকা নিশ্চয় খেয়েছে। আজকে ওটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে—এখন আরুয়াখোয়া কাছারিতেই আছে বোধ হয়। হিঁদুদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, ওদের দিকে রায় করে দিল না তো ? আজ রাত্রে এদিকে আসতে দে না।—

মুনীম সাহেবের খবরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দুই পারের লোকের মধ্যে। দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবাও জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে—শ্রীপুর হিন্দুস্থানে আসবে এ দুরাশা যে কদিন জীইয়ে রাখা যায়। তার পরই তো সম্মুখে পড়ে আছে দুঃখ-বেদনাময় জীবন—যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই পুল পার হওয়ার দিন থেকেই। দীর্ঘ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির স্মৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কি সম্ভব ? আর, এই দেশে ? এতটা বয়স হল—'নাগর' নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জ্বরের দেশ বলেই জেনে এসেছে। আজ একে সোনার হিন্দুস্থান বলে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ করে নাচার অসংগতি

বৃদ্ধের সংসারাভিজ্ঞ মনে খচখচ করে বেঁধে। কেন এমন হল তা সে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

সেবার 'নাগর' যখন ঘর-দোর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাচা বেঁধে বাঁধের রাস্তার উপর কতদিন কাটাতে হয়েছে; এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।—কিছুক্ষণ ভাববার পর যেই এরফানের কথা মনে পড়ে, অমনি ব্যর্থ আক্রোশের বেড়াজালে, সকল যুক্তিতর্কের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই উত্তেজনার মধ্যে মুনীমজী ছ'খানা গাড়ি বোঝাই করে কী সব জিনিস এনেছে, সে কথা সকলে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যায়।

মুনীমজীর হুকুম, আর পুলের এপার-ওপারের লোকের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি নয়। পনেরই দুই দিকেই প্রাণখোলা উৎসব করতে হবে, যা হওয়ার হয়েছে।

নিজে এগিয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে মুনীমজী যেচে আলাপ করতে যান। এতদিন তিনি যেতেন পুলের মধ্যখানের 'নো ম্যান্স ল্যাণ্ড' পর্যন্ত। এখন যান একেবারে ওপারের ক্যাম্পে। সকলে বলাবলি করে—আলবৎ হিম্মৎদার লোক।

মুনীমজীর মধ্যস্থতায় দুদিককার লোকের মধ্যে প্যাক্ট হয়, কোনো দলই কারও সম্বন্ধে 'মুর্দাবাদ' বলতে পারবে না— 'আর পাকিস্তানের নতুন ঝাণ্ডা পেয়েছ তোমরা? না না, এ নয়। এ তো পুরনো, লীগের ঝাণ্ডা। নতুন ফ্ল্যাগের খবর রাখো না বুঝি? দরকার থাকে তো আমাকে বলো যত লাগে। সবরকম দামের আছে।'

এপারের লোকদেরও মুনীমজী হিন্দুস্থানের নতুন ঝাণ্ডার কথা এতদিনে বলেন।

'সে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সে কি আর আমি ব্যবস্থা করিনি? সবরকম দামের পাবে।'

সাধে কি আর লোক 'মুনীমজী' করে অস্থির হয়! যখন যেখানে যে জিনিসটার দরকার, মুনীমজীর তা নখদর্পণে।

উৎসব লেগে গিয়েছে রিলিফ ক্যাম্পের কাছে। কলকাতায় বিলটু গাড়োয়ানের ভাই কাজ করত পাটের কলে। সেখানে নাকি পনেরই আগস্ট খুব দাঙ্গা লাগবে, তাই সে বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বাপ বেটায় দুদিন থেকে রিলিফ সোসাইটির ক্যাম্পে কাজ করে। কলকাতা-ফেরত ছোকরা—আজ-পাড়াগাঁয়ের নিরীহ ছেলেদের উপর খুব মোড়লি করছে। ছেলেদের সে নূতন ভুত-ভুত খেলা শিখিয়েছে—অবিশ্যি, আসলে

খেলাটা শিখিয়েছে রিলিফের বাবুরা।—একদল হয়েছে বেহ্মদত্যি, একদল হয়েছে মামদো ভূত। একদিককার নাম বেলগাছের দিক, আর একটা কবরের দিক; মধ্যেখান দিয়ে একটা কঞ্চির দাগের লাইন টানা। নোয়াখালিতে মরলে হবে বেহ্মদত্যি, বিহারে মরলে হবে মামদো! কবরের দিকে নূতন কোনো খেলোয়াড় এলেই মামদোরা উল্লাসে নাকি সুরে চিৎকার করে 'বিহার থেকে এসেছে রে'; আর বেলগাছের দিকে কেউ এলেই সকলে জিজ্ঞাসা করে 'নোয়াখালি নাকি?' জবাব দিতে হবে, 'না, চিৎপুর'—

ছেলেরা বিকৃত উচ্চারণে জায়গাগুলোর নাম নেয়। বড়রা সকলেই এই তামাসা দেখে, আর ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হয়।

মুনমেজা এসে সকলকে তাড়া দেয়, 'এ সব কী হচ্ছে? আবার একটা গোলমাল পাকাবে নাকি? পালাও সব ছোকরারা, ফের যদি আমি এই দেখি, তাহলে তোমাদের সব কটাকে পুলের থেকে 'নাগরে'র মধ্যে ফেলে দেব।'

তারপর রিলিফের বাবুদের বলেন, 'আপনাদের কাছ থেকে আর একটু দায়িত্বশীলতার আশা রেখেছিলাম।' তারা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

দুদিনের মধ্যে সব ঝাণ্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। স্বজাতির লোকের ভয়ে ইজারাদার কোথায় যেন গিয়েছে—তার সেপাই বলে পাটনায়।

নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। আতর গোলাপের ছড়াছড়ির মধ্যে পুলটি কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়—খানিকটা পাকিস্তানে, খানিকটা হিন্দুস্থানে খানিকটা শূন্যে—। উৎসবের মধ্যে এই পুলটির কথাই দর্পন সিং-এর মনে হয়।—সে-ও থাকে অ[illegible]য়ায়, মন পড়ে থাকে শ্রীপুরের জমির উপর। এই পুলটিই তার দে[illegible]নের সংযোগের সূত্র। এরই জন্য সময় মতো এদিকে পালিয়ে আসা স[illegible]ছে, ভগবান যদি সুদিন দেন তাহলে এই দিয়েই আবার নিজের দেশ[illegible]রে যেতে পারবে। না ভগবান কেন, কমিশন। কমিশন কি ভগবানের [illegible]?—

[illegible]দের লোকের সম্মতি নিয়ে রিলিফের বাবুরা পুলের মধ্যেখানে [illegible] খেলা দেখায়। ইংরাজের মড়াবাণ্ডা জড়ানো ছেলের দল প্রথমে [illegible] চলে যায় মাতুমের পান গেয়ে। তারপর হিন্দুস্থান আর

পাকিস্তানের নূতন জিন্দা ঝাণ্ডা নিয়ে দুদল ছেলে কোলাকুলি করে,—দর্পণ সিং-এর বাবার মন একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

শরণার্থীর দল ছাড়া আর সকলে বোধ হয় যখন কমিশনের কথা ভুলেছে তখন হঠাৎ মুনীমজী খবর দেন, 'কমিশনের রায় বেরিয়েছে।' সকলে মুনীম সাহেবের কাছে ছোটে।

'শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে।'

দর্পণ সিং মুনীম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। তার মা কি বোঝে, হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। তার বাবা ভগবানকে আর কমিশনকে প্রণাম করে।—কমিশন তাহলে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।—

'হরিপুর থানা পড়েছে পাকিস্তানে।'

'আর মালদা?'

'তোমাদের দিকটা এসেছে হিন্দুস্থানে, গুরুদেব। আর কি, মেরে দিয়েছ।'

কপালে তিলক কাটা গোড়াগোঁসাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই প্রথমে রসিকতা করেন, 'এই আসছি। গরুর গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখি সিরি সাওয়ের দোকানের দেওয়ালে রং দিয়ে 'কাপস্টান' লেখা। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ছাঁৎ করে মনে হল লিখেছে পাকিস্তান,—উর্দুর উচ্চারণে উলটে। ভাবলাম তাহলে আরুয়াখোয়া নিশ্চয়ই গিয়েছে পাকিস্তানে। তারপর শুনলাম ওটা এক রকম সিগারেট।—এখন আমার খবর বলুন মুনীমজী।'

মুনীমজী তার কথার জবাব ইচ্ছা করেই দেয় না। রাজবংশীরা তাদের গুরুদেবের উপর মুনীমজীর এই ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যে আশ্চর্য হয়।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কুসংবাদ জানাতেই হয়। 'জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে।'

'বললেই হল? চলে গেলেই হল আর কি।'

পরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়েন।—ভগবান এ তুমি আমার কী করলে—শেষকালে মরলে কবরে যেতে হবে।—মন্দিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এও কি আমার কপালে ছিল।—

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার স্বস্তি পায় অধিকাংশ শরণার্থীরা। আবার সেই পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একদিনের মধ্যে শরণার্থীদের ক্যাম্প ভেঙে যায়। দূর দূর থেকে ফিরে আসে গাড়ি, মানুষ, গরু, মোষের মিছিল। গাড়িগুলির উপর তিনরঙা ঝাণ্ডা লাগানো। মিছিলের লোকদের মধ্যে কারও কারও

হাতে হিন্দুস্থানের পতাকা, মুখে রাজ্য জয় করে ফিরবার দীপ্তি। বাঘের মুখ থেকে বাঁচবার আনন্দে মেয়েরা মশগুল।—

—দ্রুতগতিতে চলছে দুনিয়া। এতকাল যাঁরা সৃষ্টি সংসার চালিয়েছেন, তাঁরা এত দ্রুত তালের কল্পনাও করতে পারেননি। এত লোকের মন নিয়ে এমনভাবে ছিনিমিনি খেলতে সাহসও করেননি।—সেই কথাই ভাবছে একুবাল পুলের উপর থেকে পাকিস্তান ঝাণ্ডাটা নামাবার সময়।—দরকার কি ছিল কদিনের এই রাজত্বের? খাবার দিয়ে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল? দুশো বছর লেগে গেল ইংরেজের পতাকা সরাতে আর তার ঝাণ্ডা সরাতে তিনদিনও সময় লাগল না! মানসিক দুঃখ বেদনা তো এতে আছেই; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে যে এ অপমান রাখবার জায়গা নেই। পুলের উপর, পথের উপর শরণার্থীর সারি, ওপারে হাটসুদ্ধ লোক দেখছে।—মাথা কাটা যায় অপমানে, নদীতীরের বালির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কত উৎসাহের সঙ্গে এই ঝাণ্ডা সে তুলেছিল। 'তিনদিনের ভিস্তির বাদশাগিরি শেষ হল'—রামজী সাওয়ের এ টিপ্‌পনি তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এইখানেই এখনই ওরা ওড়াবে হিন্দুস্থানের ঝাণ্ডা। কিন্তু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে যে এই ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিলাম সে কি এইজন্য? কালই হয়তো শ্রীপুরের ছেলেরা এই ঝাণ্ডা নিয়ে এই পুলের উপর মড়াঝাণ্ডার ভূতের খেলা করবে। কার উপর অভিমান করবে—দুনিয়া যখন তার পিছনে লেগেছে—

কোনো দিকে না তাকিয়ে একুবাল ঝাণ্ডাটি নামিয়ে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায়—উত্তরের দিকে—যেখানে এ ঝাণ্ডা এখনও মরেনি।

হানিফ নিজের নির্লিপ্ততা দেখানোর জন্যে বিড়ি ধরিয়েছিল। সে খাওয়ার আগে আধ খাওয়া বিড়িটা পুলের ওপর ফেলে যায় আর ভাবে এটা দিয়ে পুলটায় আগুন লেগে গেলে বেশ হয়।—আরুয়াখোয়া আর শ্রীপুর আলাদা হয়ে যাবে তাহলে।—সে জানে যে এ থেকে ঐ কাঠে আগুন লাগা সম্ভব নয়, তবু এটুকু ভেবেও আনন্দ পায়।

মুনীমসাহেব ওপারে ইজারাদার সাহেবের ক্যাম্প দখল করেন।

ছেলেরা পাটের ক্ষেত থেকে একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসে,—কী মতলবে লুকিয়েছিল,—আগুন লাগাবে বলে মনে হয়—

'আরে অছিমদ্দী যে।'

অছিমদ্দী কেঁদে পড়ে।—'গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনছি পূর্বদিকে মুখ ঘুরিয়ে

নামাজ পড়াবে। মুরগী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ভাবলাম দিনমানটা পাটের ক্ষেতে থেকে, সাঁঝ হতে চলতে শুরু করব'—সে কাঁদতে কাঁদতে মুনীম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

'ছেড়ে দাও একে। এরা আমার চেনা লোক।'

'দয়ার শরীর হুজুরের।'

'মুনীম সাহেব কী জয়।' 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!'—জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকালে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্ণমেন্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।'

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়া-গোঁসাইয়ের খালিবাড়িতে উঠবেন, তাঁর জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দু' দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হল। 'কমিশন' অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের, কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিসেবে কোথাও ভুল হয়নি।—

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ভেসে আসছে 'মুনীম সাহেব কী জয়!'—একটু সন্দেহ মনের মধ্যে খচ খচ্ করে—একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধ হয় আর একটু সুবিধে হত—হয়তো হিসেবে একটু সুবিধে হত—হয়তো হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। যাকগে, রামজী যাকে যা দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।—

মুনীমজী কুঠিয়ালী ভাষায় পকেটবুকে হিসাব লিখতে বসেন।

## বন্যা

কুশীতে বান আসিয়াছে; একরকম নোটিস না দিয়াই। নেপালে কোন্ পর্বত-শিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন্ পাপে ভগবান তাহাদের ওই শাস্তি দিতেছেন।

বহিকপুরা গ্রামের নিয়মানুসারে মেয়েরা সকলেই শেষ রাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই আঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চিৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লইয়া আসে। সাপ বাঘ চোর, কত কী হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের মতো, ঢাক, ঢোল শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। দর্শন মডর[1] চৌকিদারের মতো হাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে বিপদ-আপদের সময়. গাঁয়ের মোড়লদের প্রথমের মোহন্ত রাঘোদাসের আস্তানের সম্মুখের আখড়ায় বিরাট লোহার গদাটি ধরিয়া বসিবার কথা।

কেরোসিন তেলের অভাব। কোনো বাড়িতে আলো ছিল না। কেবল একটি দুইটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে। মডরের এতটা অভাব নাই। আখড়ায় পৌঁছানো শক্ত। রাস্তা দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলি চিৎকার করিতেছে।

মেয়েরা আঙিনায় বলে, 'ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।' চোখের উপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। আরও এক আঙুল বাড়িয়াছে।

'মজা দেখছিস কী। খুঁটে কথানা তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা।'

ভূসির জালাগুলো কী করিয়া সরানো যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।

'ছাগলটি কোথায়?'

'সে নাই। তুলসী গাছটি যে এরই মধ্যে ডুবে গেল।'

'রান্না ঘরের উনুন যে গেল ডুবে। উখলিটি[2] ভেসে চলল। কি হবে গো!'

'আঃ। কী হল্লা করো। যত মেয়েছেলের কাণ্ড। সরো। মাচা বাঁধতে দাও। তিন হাতের খুঁটি কাটবি। বেশি হলে ক্ষতি নেই—কম যেন না হয়।'

'কৌশিকী মাঈকি জয়!' মোহন্তজী প্রত্যহই প্রত্যুষে দুবার এই জয়ধ্বনি করেন পূর্বাকাশের দিকে তাকাইয়া। খলিফা[3] আর গ্রামের জোয়ানেরা ল্যাঙ্গোটা পরিয়া আখড়ায় আসিবার জন্য তৈরি হয়। আজ কাহারও উৎসাহ বা সময় নাই; কিন্তু এই জয়ধ্বনি আজ নূতন ঝংকারে সকলের কানে বাজে। ক্রুদ্ধা কৌশিকীমাতাকে শান্ত করিবার জন্য মোহন্তজী

১ মোড়ল ২ উদূখল ৩ পালোয়ান

যেন মন্ত্র পড়িতেছেন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলে এই স্বরে স্বর মিলায়। —'কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা। আমাদের উপর সদয় থেকো মা।'

কোনো বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই। একখানা ঢোল বাজিতেছে মোহন্তের আস্তানে। তুলগা মাঝির ছেলে সাঁওতাল টোলায় একখানা কড়া বাজাইতেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মতো ফৌজী তাল। জাগো, জাগো, কেবল তাতেই চলবে না; সাজো সাজো; আর এক মুহূর্তও দেরি করা নয়। চলে এসো ঘরে, মকাই ক্ষেতের মাচার উপর থেকে; চলে এসো ঘরে বীচদরিয়ার ডিঙির উপর থেকে। গরু মোষ শুয়োর ছাগল লইয়াই মুশকিল। জানের লাগে মাল সামলাও।

একেবারে তছনছ কাণ্ড। এক মুহূর্তে এই জগৎটির উপর কী করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল!

সবাই উঁচুতে থাকিতে চায়। আরও উঁচুতে উঠিতে চায়। উঁচুতে জিনিস-পত্র রাখিতে চায়। আকাশে যদি শিকে ঝুলানো যাইত!

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এইরূপ বান এদিকে নিয়মিত হয় না। তাই কেহই ইহার জন্য তৈরি নয়। সাম্প্রতি তিয়রের কেবল একখানি ডিঙি আছে—ওপারের চর ও ভুখনাহা দিয়ারা হইতে গরুর খাইবার ঘাস আনিবার জন্য।

মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নিচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল বলিয়া। তাহারা অন্য পাড়ায় এক এক করিয়া আসিয়া জোটে। মাচা তৈরি করা সেখানে বৃথা। একটি ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর্ ধর্! তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া গেন্থুয়া মুসহর আগাইয়া আসে। তাহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে তো হাঁড়িকুঁড়ি, উখলি সামাট্। কোন স্থানেই বা তাহারা এক নাগাড়ে বেশিদিন থাকে? কোনো রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সেদিনটার মতো হইলেই হইল। কথায় বলে, 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।'

কতক লোক উঠিয়াছে নৌথে ঝার উঁচু দাওয়ায়; কতক স্বয়ং তিয়রের বৈঠকে। গেন্থুয়া মুসহরের স্ত্রী চিৎকার করিয়া উঠে, তাহার পঙ্গু ছেলেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গেন্থুয়া আবার এক কোমর জলে নামিয়া পড়ে ছেলে খুঁজিতে। বারান্দার অন্যান্য মুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালয় ভালয় গেন্থুয়া আনিয়া পৌছাইয়াছে।

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া গেল। তিল ধরানোর স্থান নাই। নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুই জনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।

বহু বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুমৃতের পিতা তাহার এক মৃগীরোগগ্রস্ত আধিয়াদারকে সামান্য প্রহার করিবার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহার মূর্ছাভঙ্গ হয় নাই। নৌখের বাবা থানায় খবর দিয়া নাকি আসামীকে ফাঁসি দেওয়াইবার চেষ্টা করে। দুই বৎসরের সাজা হয়। সেই সময় নৌখের বাবা যখনই সদরে যাইত, তখনই ভাঁড়ে করিয়া তাজা সরিষার তেল লইয়া আসিত। বলিত, 'জেলখানার তেল।' গ্রামের লোকের সম্মুখে তেল মাখিবার পূর্বে, তিনবার অশ্বত্থামার নাম লইয়া শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিত আব বলিত, 'বড বাড বেড়েছিল ; তাই একটু একটু করে তেল বের করছি।'

সেই হইতে আরম্ভ, এখনও চলিতেছে। এখনও দুই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। সুমৃৎকে দেখিলে নৌখে ঝা শব্দ করিয়া থুতু ফেলিয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। সুমৃৎ দাঁত কড কড করিয়া নিকটস্থ মহিষের পিঠে জোরে লাঠি দিয়া মারে—'শালা পথ জুড়ে বসে আছে।'

কুশীর দুকুলভাঙা প্লাবনের মুখেও মাতব্বরদের কর্তব্য তো করতেই হইবে। তাই নৌখে ঝা পুরুবটোলায় লোকেদের অবস্থা তদারক করতে গিয়াছেন—কোনো কাজের শৃঙ্খলা যদি থাকে এই পাড়ার লোকেদের! তুরিয়া বাঁতার এই সময়েও মোটা সুতায় বাঁধা বড়শির সহিত প্রকাণ্ড ছাল-ছাড়ানো সোনা ব্যাঙ গাঁথিতেছে। নৌখে ঝা জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে তোরা জিনিসপত্র সামলেছিস ?'

'আমার পুতহু[১] আছে সেয়ানা।' সে আর বেশি কথা খরচ না করিয়া সুতাটিকে একটি বাখারির সহিত বাঁধিতে থাকে।

পশ্চিমটোলায় সুমৃৎ তিয়র এক বুক জলে দাঁড়াইয়া চিৎকার করে—'মাল গেলে মাল আবার হবে ; জান গেলে কিন্তু জান আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ওরে পাতরঙ্গী, তুই আবার চালের উপর উঠছিস কেন ? লাউ—কটা পাড়বি ? এখন আর লোভ করিস না। ও কী। আবার পুঁটুলি ওঠাচ্ছিস যে চালের ওপর। ছাগলটাকেও যে টেনে তুললি। মরবি, মরবি !'

পাতরঙ্গী জবাব দেয় না। শতছিন্ন শাড়িটি মাথার উপর একটু টানিয়া দিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। ভাদ্দরের রোদবৃষ্টির মধ্যে, কী করিয়া

১ পুত্রবধূ

চালের উপর তাহার দিন কাটিবে, সে-কথা সে ভাবে না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না।

'যা, সব গরু মোষগুলো নিয়ে রেল-লাইনের উপর যা। রেল-লাইনটা উঁচু আছে, এখনও ডোবেনি।'

সকলে একে একে গ্রামের উঁচু স্থানগুলিতে আসিয়া জুটে। উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে। নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে মুমূৎ তিয়রের বাড়ি। মুসলমানেরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়। বহুকালের পুরনো পাথরের মসজিদ, আগে নদীর ওপারে ছিল। নদী সরিয়া যাওয়ায়, এখন এপারে হইয়া গিয়াছে।

প্রথম আলোড়নের পর পরিস্থিতি থিতাইয়া আসিয়াছে। প্রাণে সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন থাকিয়া গেল প্রাণধারণ করিবার প্রশ্ন। তিয়রের বাড়ির মেয়েরা, অন্য ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উঠোনে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছে। আঙিনার আর-এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া তৈরি উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে। তিয়র-গিন্নী এক ঝুড়ি ভুট্টা আনিয়া সেখানে দিলেন। মুসহর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, 'আমরাও বাড়িতে ভাত খাই। এখন ও চাল বাঁচাচ্ছে কার জন্যে বুঝি না। বাড়ির আঙিনায় যখন পেয়েছ, যত ইচ্ছে অপমান করে নাও। নিজেদের কথা হলে ভাবতামও না। ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খাই খাই ক'রে জ্বালাতন করে, আর ঐ বেচারারাই বা করবে কী? পাশেই গেরস্তদের ছেলেদের ভাত খেতে দেখলে, তারা কি চুপ করে থাকতে পারে?'

ধাঙর, মুসহর, বাঁতার, সকলেরই আলাদা আলাদা 'চৌকা' হইল। গেরস্ত বাড়ির লোকেরা খাইতে বসিল বাড়ির আঙিনায়; মুসহর, ধাঙর, বাঁতার, তাৎমারা বাহিরের বৈঠকখানায়।

বেশ একটা চড়াইভাতির মনোভাব। তাহার পর চলে একটানা কুশীর বান দেখা। কালো জল—গঙ্গার জলের মতো ঘোলাটে সাদা নয়। হুড়াহুড়ি করিয়া একসারি ঢেউ, আর এক সারিকে তাড়া করিয়াছে। তীব্রগতির তোড়ে একটি বিরাট গাছের গুঁড়ি উষ্ট্রারোহীর মতো সামনে পিছনে দুলিতে দুলিতে, চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গরু ভাসিয়া যাইতেছে—মরা না জ্যান্ত? নামব নাকি—জয় কৌশিকী মাঈকী জয়। না, নামা বৃথা। ওটি বোধ হয় নীলগাই। কুমীরে প্রকাণ্ড একটি মাছ ধরিয়াছে। জলের উপর হুটোপুটি করিতেছে। যাক, মাছটি পলাইয়াছে। ওটা কিন্তু আর

বাঁচবে না—ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাপটায় নিশ্চয়ই ওটার হাড়টাড় ভেঙে দিয়েছে।

বন্যার জলের উত্তাল কল্লোলধ্বনি সকলেরই কানে সহিয়া গিয়াছে। সূর্যের কিরণ ঢেউয়ের উপর পড়ায় সে দিকে তাকান যায় না। একটি চালা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপর তিনজন লোক পরিত্রাহি চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে—কি বলিতেছে বুঝা যায় না; না বুঝা গেলেও আন্দাজ করা যায়। চালার চতুর্দিকে সর্পিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ফণা তুলিয়া সহস্রমুখ বাসুকি শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এক রাশ সাদা আলোকময় বারিকণা চালাটিকে ভিজাইয়া দিল।

পিছনে একটি শব দেহ আসিতেছে তীব্র গতিতে। একটি কাক চোখ-মুখের উপর ঠুকরাইতেছে।

মুমূৎ তিয়রের দাওয়ার নিচেও ঢেউ লাগিতেছে—ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ মধুর মনোরম ছন্দে। এ আঘাতে প্রচণ্ডতা নাই, মাটির চাপ ভাঙিয়া ফেলিবার, অশথগাছ ভাসাইয়া লইবার উগ্র উদ্দণ্ডতা নাই। কৌসিকী মাঈ, অভয় হস্ত বুলাইয়া তিয়র শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছেন। ওপারে ভুখনাহা দিয়ারার দক্ষিণের পাহাড় অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এর মধ্যেও 'আধেঙ্গা' হাঁসের দল পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। এখানে বৌনী বাঁতারের আর মসজিদের বারান্দায় কুদরতি মিঞার শিকারের হাত একই সঙ্গে নিশপিশ করিয়া উঠে।

দিনের পর রাত আসে, আর রাতের পর দিন।

একগলা জল বহিয়া পশ্চিমের উঁচু ঘরের বারান্দা হইতে আধশুকনো মকাই লইয়া আসা হয়।

'দেবীস্থানের পশ্চিমের নিচু জমিটায় এবার সাড়ে তিন বিঘা অঘানী ধান লাগিয়েছিলাম। এই এক-এক হাত হয়েছিল।'

'আমি তো বাঁতারটোলার পাশের দহের ধারের ধান, তৈরি ভাদই ধান, তুলতেই পারলাম না। সারাবছর বালবাচ্চারা কী যে খাবে।'

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাওয়াবেন।' সকলেই শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলে; কিন্তু কথাটি যেন অন্তরের ভিতর হইতে আসে না; মন মানিতে চায় না।

'মুমূতের সাত শো বিঘা ধানের ক্ষেত ডুবেছে, পাঁচ শো বিঘা ভুট্টার ক্ষেত।'

'নৌখে ঝার বারো শো বিঘা ধানের ক্ষেত, আর সাত শো বিঘা মকাইয়ের ক্ষেত।' 'নৌখের বেলায় ছোটকী বিঘা দিয়ে মাপছিস নাকি—সাড়ে চার হাতের লগার বিঘা?'

'প্রায় অর্ধেক মকাই কিন্তু আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল।'

'তোলা হয়েছিল তো তোলাই থাকল।' সকলে হাসিয়া উঠে। 'মকাই হয়েওছিল তো ভারি। বর্ষাতে জল বসে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম গাছগুলো কুটি-কেটে গরুকে খাওয়াব; তাও কৌশিকী মাঈয়ের দয়ায় হল না।' সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কেহ বাধা দেয় না, বারণ করে না। একই ব্যথা সকলের। একজনের অশ্রুর ভিতর দিয়া সকলের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ পাইতে চায়।

জল কমিবার নাম নাই। এরূপ করিয়া আর কতদিন চলে। তিনদিন তো হইয়া গেল। আজ জেলে-ডিঙিতে করিয়া পাতরঙ্গী ও তাহার ছাগলটিকে এখানে আনা হইয়াছে। সেই চালার উপর দুইটি সাপ উঠিয়াছিল। তাহারা মানুষ দেখিয়া নড়ে না; তাড়া দাও, হাততালি দাও, সরে না—কেবল পিট্ পিট্ করিয়া তাকায়। ভয়ে পাতরঙ্গী চিৎকার করে।

ছেলেপিলের চ্যাঁ ভ্যাঁ। নৌথে ঝার বারান্দা ও আশেপাশের সব জায়গাই নরক হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসপাতা পচার গন্ধও আকাশে বাতাসে সর্বত্র।

নদী দিয়া কোনো নৌকা গেলেই বারান্দার লোকেরা তাহাদের ডাকে—চিৎকার করিয়া, হাতছানি দিয়া, গামছা উড়াইয়া। কিন্তু গরু ছাগল ধান ছেলেমেয়ে ভরা নৌকাগুলি ফিরিয়াও তাকায় না। কোনোটিতেই তিল-ধারণের স্থান নাই।

হতাশায় গ্লানিতে যখন লোকের মন ভরিয়া গিয়াছে সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় একখানি হাজারমনী নৌকা। 'এই দিকেই তো আসিতেছে।' তাহা হইলে কি শেষ পর্যন্ত কৌশিকী মাঈয়ের দয়া হইল! জয় কৌশিকী মাঈকি জয়! ছেলে-বুড়ো সকলে উঠিয়া দাঁড়ায়। নৌকা হইতে গান্ধীটুপি-পরা ছেলে চ্যাঁচায়—'আগে বাচ্চারা আর মায়েরা। পরের দলে আসবে পুরুষেরা। যাবে গঞ্জের বাজারে। সেখানে আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বানের জল আবার বাড়বে। কাদার দেওয়াল ধ্বসে পড়বে। তার আগেই সকলে চলে এসো, চলে এসো,—দেরি কোরো না।'

মেয়েরা বলে, 'আমরা একা যাব নাকি? তার চেয়ে এখানে মরা ভাল।' বলে, আর যে যার আমসি আচার আর বড়ির পুঁটুলি গুছায়।

'আচ্ছা, তাহলে একজন দুজন বেটাছেলে আসুন।' একে একে নৌকায় লোক ওঠে। ছোট ছেলেরা মুখে আঙুল দিয়া হাসে। মেয়েরা চোখে আঙুল দিয়া জল মোছে। পুরুষেরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায় আর বলে, 'ভাবিস না, আমরাও আসছি।'

'এটা নৌখে ঝার বাড়ি না? আসুন, আপনারাও আসুন।' 'নৌকায় কারা? মুসহর ধাঙড়ের মেয়েরা? সুমুতের লোকেরা? আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়েরা পরের নৌকায় যাবে। না, না, ভয় পাচ্ছি না। আপনারা মহাৎমা। আপনাদের সঙ্গে পাঠানোতে আবার ভয় কিসের? কথাটা অন্য।' গান্ধীটুপি-পরা ছেলেরা তাড়া দেয়, বচসা চলে, তাহার পর ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েরা একে একে নৌকায় ওঠে, মুসহর মেয়েরা সরিয়া তাহাদের জন্য আলাদা জায়গা করিয়া দেয়, সুমুতের বাড়ির মেয়েরা কুশীর অন্য পাড়ের পাহাড়ের গাছগুলি গুনিবার চেষ্টা করে।

'পুরুষদের মধ্যে থেকেও দু-একজন আসতে পারেন; পরের ব্যাচে বাকি সকলে যাবেন। ততক্ষণ কিছু ভুট্টার ছাতু দিয়ে যাব নাকি?'

'চাল আছে নাকি? ভুট্টার দরকার নেই। কেরোসিন তেল আছে? পোকা-মাকড়ের মধ্যে রাত-বিরেতে দরকার হয়। সরসের তেল? নুন? দেশলাই? পাঁকুই-এর ওষুধ? কিছুই নেই?'

'না, আমরা রিলিফ পার্টির লোক না—রক্ষা-পার্টির লোক। রিলিফ দিতে আসিনি, লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এসেছি।'

'না না, ভুট্টার কথা বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চলে। চলিতে আর চায় না—হাওয়া থাকলেও, না হয় পাল তুলিয়া দেওয়া যাইত।

'হরিণকোল সড়কের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবি।' হরিণকোল সড়ক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, হরিণকোল পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তা কোথায় ছিল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কেবল রহিকপুরার পশ্চিমে যেখানে ভীষণার নালী আসিয়া কুশীতে পড়িয়াছে, সেইখানে ভীষণার উপর একটি পুল ছিল। পুলের রেলিঙের উপরাংশ দেখা যাইতেছে।

গোবরাহার নিকট পৌঁছিতেই সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এখানে জলে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী; বিরাট পরিধি লইয়া সাদা ফেনিল আবর্ত। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালভৈরব দুধ দিয়া সিদ্ধির সরবৎ তৈয়ারি করিতেছেন; আঙুল দিয়া নিচের থিতানো চিনি, সিদ্ধিবাঁটা দুধের সহিত মিশাইতেছেন। নৌকার সকলেই তাহা জানে এবং সেইজন্য এখানে প্রণাম করে—রক্ষা করো আমাদের কালভৈরব! এই জলের নাগরদোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে একটি কলা গাছের ভোঙা, কয়েকটি পোড়াকাঠ, একটি কলসী, আর ফেনার সহিত রাশীকৃত আবর্জনা।

'সামহালকে! বাঁয়ে দাব্ কর্ চলো।' হঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলিয়া

উঠে। একদিকে কাত হইয়া যায়; মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা চিৎকার করিয়া এ ওর গায়ে গিয়া পড়ে। তাহার পরই নৌকাটি অন্যদিকে কাত হয়। নৌকার ভিতর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিয়া ধরে। নৌখে ঝার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সুমুৎ তিয়রের স্ত্রী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ব্রাহ্মণদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌখে ঝার পুত্রবধূকে কাঁধ ধরিয়া বসায়। শাশুড়ী বৌ দুজনকেই বলে, 'ভয় কী! কৌশিকী মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। সেও পাশে বসিয়া নৌখের পুত্রবধূকে ধরিয়া থাকে—আহা, বৌটি এখনো ভয়ে কাঁপছে। মাঝিরা চিৎকার করে, 'কালভৈরো কী জয়!'

'নৌকার একদিকে সবাই কেন? মেয়েদের কি কোনো কালে আক্কেল হবে!'

আর-একজন মাঝি বলে, 'হাজারমনী নৌকা বলে বেঁচেছে। না হলে এখনই কালভৈরোর ভাঙের গোলমরিচ হয়ে যেত।'

'আর খানিকটা!' 'জোরে!' 'দাঁড় বন্ধ কোরো না ভাইয়ো!' 'বাস! আর এক কোশ!'

গঞ্জের বাজার। সেদিকটা উঁচু। তাই সেখানে জল পৌছায় নাই। সেখানে আশ্রয়-প্রার্থীদের একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। চৌবেদের আম-বাগানে বার্মা ইভাকুয়ীদের জন্য যে ক্যাম্প হইয়াছিল, তাহারই অবশেষ এখনও সেখানে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। এক কোণে একটি কুষ্ঠ রোগীর কালো ঝুলমাখা মাটির হাঁড়ি বাঁশের সহিত ঝুলিত; আর রাজ্যের গরু ছাগল এখানে থাকিত। তাহাই এই চার বৎসর লোকে দেখিয়া আসিতেছিল। আজ হঠাৎ ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে—'রিফিউজি ক্যাম্প'।

মেয়েদের আনিয়া এখানে নামানো হইল। আর দূরদূরান্তর থেকে লোক আসিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন কোনো যোগের সময়ের গঙ্গার ঘাটে ভিড়—'বান তো সোজা হয়নি। ফুলকাহা থেকে বাঘডোবরা—সাতাশ মাইল। কত গাঁ যে ভেসেছে তার কি ঠিক আছে।' তাই এই ভিড়। তবু তো কত লোক ধর্মশালায় আছে; কত লোক এখানে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে।

এখানে এক-এক গাঁয়ের লোক, এক-একদিকে জায়গা দখল করিয়াছে।

'আপনারা কোথাকার—ফুলকাহার নাকি? আপনারা? আর আপনারা?'

মোটামুটি আলাপ-পরিচয় জমিয়ে ওঠে। তা কেবল মৌখিক। হাজার হইলেও তারা ভিন্‌গাঁয়ের লোক, নিজের গাঁয়ের লোক হইল আপনার জন।

'আর চাটাই চাই এখানে—চাটাই!'

ভলান্টিয়ররা চেঁচায়, 'কটা উনুন হবে? চারটে? স্লিপ নেন। রিলিফ আপিসে যান। ঐ যে নিশান টাঙানো—গেটের পাশে গরু শুয়ে রয়েছে—ঐ বাড়িটা। ঐখানে ইট পাবেন।'

'কে কে যাবে ভাই, ইট আনতে?' ঝা-গিন্নী, তিয়র-গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুসহরনীরা বলে, 'আমরা আনবো'; সাঁওতালনীরা বলে, 'আমরা আনবো।'

'তোমরা কি মা এসব কাজ করতে পার, না কোনোদিন করেছ। আমাদের গাঁয়ের ইজ্জৎ খ্যাতি আমাদের হাতে। তোমাদের কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।'

সব দরকারী জিনিসই বাহির হইত—মায় শিলনোড়া পর্যন্ত। সাঁওতালনীরা ছাড়া আর সকলেই বলে, আমরা বামুনের পেসাদ পাবো। ব্রাহ্মণীরা হাসিয়া উনানের দিকে যান। তিয়র মহিলারা মশলা বাঁটিতে বসে।

ছোট ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া দেওয়া হইবে। দিয়াছে ভুট্টার ছাতু। তিয়র মেয়েরা ছাতু মাখে, ব্রাহ্মণীরা রুটি সেঁকেন।

সুমৃতের স্ত্রী নৌখের স্ত্রীকে বলেন, 'দিদি ঐ কচি পোয়াতি বৌটাকেও এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে খাইয়ে দাও। কম ঝক্কি তো গেল না ওর ওপর আজ। এখন সবই ভগবানের কৃপা।'

বৌ ঘাড় নাড়িয়া এখন খাইতে আপত্তি জানায়। ঝি-গিন্নী হাসিয়া বলেন, 'দেখলে তো আমার বৌয়ের ঘাড় নাড়া। আর একবার ঘাড় নেড়েছে, আর ওকে 'হাঁ' বলাও তো।'

তিয়র-গিন্নী বলেন, 'এই জিনিসই তো ভালবাসি না বৌমা। যা বলি তাই শোনো, 'না' কোরো না। তাহলে বড্ড রাগ করব কিন্তু, মা।'

বৌ শালপাতা লইয়া বসে।

শাশুড়ী একগাল হাসি মুখে লইয়া বলেন, 'এ আজ আজব কাণ্ড দেখালে বহিন।'

বড়দের খাওয়া দাওয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে আর দুইখানি নৌকায়, গ্রামের পুরুষেরা ও মসজিদের বারান্দার লোকেরা আসিয়া পড়ে। ছেলেদের অধিকাংশই শুইয়া পড়িয়াছে। যাহারা জাগিয়াছিল তাহারাই পেট্রোম্যাক্সের আলোতে প্রথম চিনিয়াছে আত্মীয় পরিজনকে।

ব্রাহ্মণ মেয়েরা পাতা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। অন্য জাতের মেয়েরা ঘোমটা

টানিয়া হাত গুটাইয়া বসে। সাঁওতালনীরা সাঁওতালদের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত দিয়া মকাইয়ের রুটি খায়।

মসজিদের দলের লোকদের মধ্যে অধিকাংশই শীর্ষাবাদিয়া মুসলমান—এদেশে বলে 'বাধিয়া'। ইহাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। মাছের মতোই যেন ইহারা জলের জীব। গঙ্গাতে যেখানে চড়া পড়ে সেখানে তাহারা হানা দেয়। এমনি করিয়া দলে দলে রাজমহলের গঙ্গার পথে বিহারে আসিয়া এ অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারা নাকি মুর্শিদাবাদের নবাবের হাবসী সৈন্যদের বংশধর। তাই জলের ধারে থাকিলেও ইহাদের রক্ত এখনও গরম। হাসিমস্করা করিতে করিতে হঠাৎ চটিয়া রামদা লইয়া মারিতে যায়। এদের মোড়ল মনিরুদ্দি শীর্ষাবাদিয়া সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর তিয়রদের বলে, 'চলুন, আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। দেখছেন না, নইলে মাঠাকরেনদের খাওয়া হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো' বলিয়া নৌখে ঝার সহিত সকলে বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা আবার খাইতে আরম্ভ করে ভিনগাঁয়ের বেটাছেলের সম্মুখে খাইতে আবার লজ্জা কী? তাড়াতাড়ি সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া লয়। আবার উনুনে ফুঁ-দেওয়া আরম্ভ হয়।

ফুলকাহার দলের এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেন, 'এদের রান্নাবাড়ার কি আর বিরাম নাই?'

রহিকপুরার ব্রাহ্মণ, তিয়র, শীর্ষাবাদিরা, বাঁতার সব মহিলাই এক সঙ্গে বলিয়া উঠে—'তাতে আপনার কী হচ্ছে', 'আমরা সারা রাত রাঁধব', 'বাড়িতে আমরা খেতে পাই না, এখানে এসে দুটি পাচ্ছি। না ভাই তাই না?' আরও কত মন্তব্য তাহারা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলে। বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িবার ভান করে।

'নিশ্চয়ই গোবরাহায় বাড়ি।' রহিকপুরার সব মেয়েরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠে। এ অঞ্চলে গোবরাহার লোকদের বোকা বলিয়া দুর্নাম আছে।

পরের দিন

সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। ক্ষতির পরিমাণ এই কয়দিন কেহই ভাবিবার সময় পায় নাই। নদীরও কূল-কিনারা নাই; দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়াও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। বাড়িটি এখনও দাড়াইয়া আছে কিনা কে জানে।

ডাকবাংলাতে জেলা হইতে হাকিম আসিয়াছেন। কোথাকার এক ছোকরা কুশী নদীর ভয়ানক বানের কথা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরা। আবার লিখিয়াছে, 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র'। একখান রদ্দী কাগজ—তাতেই আবার লেখা 'জাতীয় দৈনিক পত্র'। উহা দেখিয়াই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এতক্ষণে হয়তো জেলা-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার খবর-দেওয়া কাগজের কাটিং সেক্রেটারিয়েট হইতে কৈফিয়ত তলব করিয়া কালেক্টরীতে আসিয়া যাইবে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরি করিবার কপাল আর আজকাল নাই।

কেরানীবাবু আসিয়া খবর দেন, 'কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে; এ অঞ্চলের 'রইস' এঁরা।'

'আচ্ছা, আসতে বলুন।'

'হেঁ হেঁ হেঁ—এই আপনার সঙ্গে ফ্লড সম্বন্ধে কথা বলতে এলাম। আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে এসেছি। একটা আলাদা ফ্লড-রিলিফ-কমিটি কায়েম করা যায় না?'

'একটা আছে না?'

'ওটা কংগ্রেসীদের ঘরোয়া। সেবার কাজ তো কেবল খদ্দরধারীদের একচেটিয়া নয়।'

'আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে কথাবার্তা হবে। এখন একটু অন্য কাজ আছে।'

'হেঁ হেঁ, আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখা করব'—কয়েকপাটি পান-খাওয়া দাঁতের সমাহার।

'বোরস্'! কম্পমান দরজার পর্দায় এখনও তিনটি ছায়া দেখা যাইতেছে।

ক্রীং ক্রীং।

'হজৌর।'

'ওভারসিয়ার বাবুকো সেলাম দেও।'

'হজৌর।'

'ওভারসিয়ারবাবু, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একস্ট্রা নৌকা নেই?'

'১৯৩৭-এর গত ফ্লড-এর পর আটখানা নৌকা এখানে রাখবার ব্যবস্থা হয়। এতদিন এখানে পড়েছিল। এ কয় বছর কোনো কাজে আসেনি। এইসব 'রইস'রা নিজেদের বাড়ির কাজে লাগাইতেন। ব্যবহারের অযোগ্য বলে এ বছর চেয়ারম্যান সাহেব নিলাম করে দিয়েছেন।'

'কিনেছে কে?'

'এই খানিক আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই।'

'তাঁরা ব্যবহারের অযোগ্য নৌকা নিয়ে কী করবেন? ব্যবহারের অযোগ্য রিপোর্ট দিয়েছিল. কে? আপনি? ব্যবহারের অযোগ্য—ননসেন্স। ঐ নৌকায় বেঙ্গলে হুন 'স্মাগল' করা হবে। সব খবর আমরা রাখি। কেরানী-বাবু লিখুন। টু দি চেয়ারম্যান। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কখানি নৌকা দিতে পারেন? টু দি কালেক্টর—আজকের রিপোর্ট ভোরের ট্রেনে যেন চলে যায়, কেরানীবাবু।'

'নিরঞ্জনবাবুকে ডাকো—রিলিফ কমিটির সেক্রেটারিকে। চাই ফিগার্স। কত গ্রাম অ্যাফেক্‌টেড, লোক মরছে কি? গরু বাছুর? কোন কোন গ্রাম একেবারে ভেসে গিয়েছে? কত নৌকা দরকার? ভেটারনারি ডাক্তারকে নিশ্চয়ই সপ্তাহে একদিন এখানে সেণ্টার খুলতে হবে। আরও কত লেখাপড়ার কাজ আছে। স্টেনোকে নিয়ে এলাম না, বড় ভুল হয়ে গেল।'

দিনরাত লেখাপড়ার কাজ চলিতেছে; আর চলিতেছে সোডা আর রম্।

'মেডিকাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লেখাপড়া। ভেসেলিন লাগবে বললেন না ডাক্তারবাবু পাঁকুইয়ের জন্যে? আর সালফিনামাইড্। কলেরা ইনকুলেশন, সে তো পরে হলেও চলবে। কুইনিন, মেপাক্রিন। ডি. ও. দিন হেলথ্ অফিসারের কাছে। আর—একখানা দিন রিজিওনাল গ্রেন সাপ্লাই অফিসারের কাছে—হু' ওয়াগন ভুট্টার জন্য তাগাদা। কালেক্টরের কাছে চিঠি দিন—জল সরলেই বীজ লাগবে। হাজার মন কলাই, হাজার মন কুরথী।'

'স্টাটিস্টিক্স যোগাড় করুন, কত বাড়ি ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তাদের জন্যে গড়ে দেড়শো টাকা করে বাড়ি তৈরির হারে গ্রাটুইটাস রিলিফ দেওয়া হবে। হিসেবের ফর্দ করে পাঠিয়ে দিন নেক্‌স্ট ডাকে। হ্যাঁ আর একটা লিস্ট করতে হবে 'তাকাভি' লোনের। লোনে বীজ দেওয়াই ভাল; টাকা পেলে তারা অন্য কাজে খরচ করে ফেলবে।'

'টু দি কালেক্টর—এ অঞ্চলের গরু মহিষ যে সকল নির্বিঘ্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছে সেখানকার জমিদারেরা, অথবা তাহাদের কর্মচারীরা গরু চরার জন্য মোটা টাকা আদায় করিতেছে। সমাজের 'পেস্ট' এরা। তাদের কাছে চিঠি দিন, এই টাকা লওয়া বন্ধ করিতে। আরোগ্যের পথের রুগীর জন্য চাই মিছরি। সরকারী জেলা ফ্লড কমিটির যে আটখানা নৌকা ছিল তাহার কী হইল?'

'এখানকার রিলিফ কমিটিতে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসী দলে বিশাল মতদ্বৈধ আছে। নির্দেশ দিন কী করি।'

'একটা স্কীম এসেছে—পাট দেওয়া হবে বন্যাপীড়িত লোকদের। নেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে পাটের দড়ি। মজুরি তারা পাবে। মজুরির কিছু অংশ গভর্ণমেন্টের ঘর থেকে দিতে হবে। এর নাম স্বৎরী সেন্টর স্কীম।'

লেফাফা, চিঠি, টেলিগ্রাম, সার্ভিস মার্কা ডাকটিকিট, দিস্তা দিস্তা কাগজ, কলিং বেল্—'অত বড় কাগজে লিখবেন না। অর্ধেক করে নিন।' কেরানী-বাবুর নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই। লেখা পড়ার কাজ বাড়ে, কাজ এগোয় না। কাগজের চাপে আসল কাজের দম বন্ধ হইয়া আসে।

উত্তর আসা আরম্ভ হইয়াছে। ফাইল বাড়িতে থাকে।

'জেলায় অধিক বীজ না থাকায়, কৃষি বিভাগকে লেখা হইয়াছে। তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না আশ্বাস এখনও পাওয়া যায় নাই। অসুবিধা হইতেছে যে, কণ্ট্রোল দাম বাজার-দরের অর্ধেক।'

'রেললাইনে গরু চরা বারণ। উহার উপরের ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যাহারা ঐ ঘাস রেল-কোম্পানীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে, তাহাদের কী হইবে। যাহা হউক, রেলওয়ে এস. ডি. ও-কে এ বিষয়ে লিখিতেছি।'

'স্বৎরী সেন্টর স্কীম অসম্ভব। যাহা হউক আমি লোকাল গভর্ণমেণ্টকে রেফার করিতেছি।'

'বার্লি লোকাল মার্কেট হইতে যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবেন।'

'ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড লিখিতেছে যে, বন্যাপীড়িত লোকদের নৌকা সাপ্লাই করিবার নৈতিক অথবা কানুনী দায়িত্ব তাহাদের নাই। তাহাদের এই জবাবের জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।'

'গ্রাটুইটাস রিলিফের জন্য পাঁচশো টিন কেরোসিন তেল চাহিয়াছেন। আজকাল কণ্ট্রোলের বাজারে ইহা অসম্ভব। পনের টিন লোকাল মার্কেট হইতে লইবেন। আমি পরে রিপ্লেস করিব।'

'ডিষ্ট্রিক্ট ফ্লড কমিটির সরকারী নৌকাগুলির কোনো হদিস পাওয়া যাইতেছে না। যে অফিসারের দায়িত্ব তাঁহার কাছে কৈফিয়ত তলব করিয়া চিঠি দিয়াছি।'

চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা, এখানে কেবল কথা আর কথা—কথার ফেনা! লাল ফিতার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে বর্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে অজগরের নিষ্পেষণে হরিণ-শিশুর মতো।

'এদিকে স্মৃৎ নৌখেকে জিজ্ঞাসা করে, ও কী করছে মহাত্মাজীর চেলারা?'

'আঁসশেওড়ার জঙ্গলে গন্ধওয়ালা দাওয়াই দিচ্ছে। সাপের ওষুধ।'

'এদিকে এত জাঁতা কেন?'

জবাব দেয় ভলান্টিয়র, 'বসে বসে ভুট্টা পেষো। অর্ধেক তোমাদের। অর্ধেক আমাদের ফেরত দেবে। বসে খাবে কেন? ভিক্ষে নেবে কেন? নিজের রোজগার নিজে খাও।'

নৌথে আর স্বমৃৎ দুজনে বলাবলি করে, 'কথাটি বলেছে মার্কার কথা, দামী কথা।'

সারঙ্গীলাল 'রইস' হাকিম সাহেবকে লইয়া বজরায় উঠিতেছে; সাহেবকে বন্যাপীড়িত এলাকা দেখাইতে হইবে। সঙ্গে লইয়াছে কলের গান, থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়র, সোডার বোতল, আরও কত কী।

স্বমৃৎ আর নৌথে বোতলের দিকে ইশারা করিয়া চোখ টেপাটেপি করে।

রাত্রে হঠাৎ নৌথে ঝা'র পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। স্বমৃতের স্ত্রী উৎকণ্ঠা চাপিয়া বলে, 'এ আমি আগেই ভেবেছি। এ শরীরের অবস্থায় কি এত টানাপোড়েন সয়।' স্বমৃৎ দৌড়িয়া রিলিফ কমিটিতে খবর দিতে যায়। শীর্বাবাদিয়া মনিরুদ্দি আর তাহার ভাই দলিমুদ্দি ক্যাম্পের কোণায় নিজেদের চাটাইগুলি ঘিরিয়া আবদ্ধ করিয়া দেয়। কানী মুসহরনী মালসাতে করিয়া কাঠের আগুন লইয়া আসে। স্বমৃতের স্ত্রীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই ঘেরা স্থানে সারারাত চেঁচামেচি করে। ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোনা যায় ঝা-গিন্নী বলিতেছেন, 'এতটা বয়স হল; কিন্তু এখনও আমি এসবে একেবারে হকচকিয়ে যাই। ভাগ্যি তুমি ছিলে বহিন। না হলে বিদেশে বিভুঁয়ে কি দশা যে হত এখন, তাই ভাবি।'

বাড়ি ছাড়িয়া কাহারও মন টিকে না। মৈনা বলদ জোড়ার সোজা শিং দুটিতে কতদিন তেল দেওয়া হয় নাই। লালিয়া গরুটি আবার জোলো ঘাস খায় না। হরযু চরবাহা গরুগুলিকে ভোখলাহার মাঠে কী অবস্থায় রাখিয়াছে, কে জানে। গোলার মকাইগুলি পচিয়া উঠিল। পশ্চিমের ঘরের দেওয়াল বোধ হয় এতদিনে পড়িয়া গিয়াছে। পাৎরঙ্গীর লাউগাছটি বোধ হয় এত জলে মরিয়া গেল। আলিজানের বড় বলদটার আবার ঘাড়ের ঘা শুকাইতে ছিল না। গাঁয়ে বলদের ঘায়ের জন্য একটুও ফিনাইল পাওয়া যায় না। আর এখানে নালীর মধ্য দিয়া ফিনাইলের নদী বহিতেছে। কবে যে আবার ওপারের সবুজ মখমলে ঢাক। পাহাড়ের নিচেটা আবার দিনকয়েক আগের মতো সাদা হইয়া যাইবে, কোশের পর কোশ সাদা কাশের চুনকামে। দিনরাত গল্পগুজব। কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেলের অভাবের সেই একই

কথা একঘেয়ে লাগিতেছে। রিলিফের বাবুদের আজব চালচলনের কথা, আর কতদিন বলা যায়। একটু প্রাণভরে নদীর জল খেতে দেবে না, এরা। কি যেন একটা বদ গন্ধওয়ালা ওষুধ মিলাইয়া দিবে। এখানে খয়নির থুতু ফেলতে দেবে না। থুতু আবার গিয়ে ফেলে আসতে হবে কোথায় ?

নিরবচ্ছিন্ন অবসরের একঘেয়েমির এইসব বাধানিষেধগুলি আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। নৌখে, সুমুৎ আর মনিরুদ্দি প্রত্যহ বহু রাত পর্যন্ত জাগিয়া গল্প করে। ভিন্ন গাঁয়ের নানারকম লোক—বলা তো যায় না। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি রাতে ভয়ডর পাইয়া চিৎকা:' করিয়া ওঠে।

ঘুম ভাঙিলেই প্রত্যেকেরই মনে পড়ে—জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে কি ? ভোর হইতেই প্রত্যহ সকলে ছুটিয়া দেখিয়া যায় জলের অবস্থা। স্টীমারঘাটের পাশে ময়দার দোকানের নিচে ছিল একটি টিউবওয়েল। এখন আর তাহা ব্যবহার করা হয় না ; কিন্তু এখন সেটি হইয়াছে কত জল বাড়িয়াছে তাহা মাপিবার যন্ত্র।

'আজ যেন কলের উপরের খাঁজটি দেখা যাচ্ছে।' 'দূর, ও তো হাওয়ায় জলে ঢেউ লেগেছে, তাই।'

সেদিন প্রত্যুষে নৌখে মা নদীতে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে। হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসে। হঠাৎ চিৎকার করিতে করিতে আসে, 'জল কমছে, জল কমছে সুমুৎ—'

'সত্যি ?' যেন বিশ্বাস হইতে চায় না।

'তা না তো কি মিথ্যে বলছি ? দু আঙুল নয়—আধ হাত কমেছে।'

'চুপচাপ থাক্, আর বলিস না। আবার হয়তো বেড়ে যাবে।' সকলে ধড়্মড় করিয়া উঠে, ছেলেরা কাঁদে। মায়েরা ছেলে ফেলিয়া জল দেখিতে যায়। লোকে লোকারণ্য, টিউবয়েলের ত্রিশ গজের মধ্যে যে পৌঁছিতে পারে সেই ভাগ্যবান।

'পুবে হাওয়া দিচ্ছে। আর জল বাড়বে না।'

'কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।'

'আবার আশ্বিনে আর-এক ঝোঁক আছে।'

'আর এখনই একটু গরম পড়লে আজই আবার জল বেড়ে যাবে।'

হট্টগোলে হাকিম সাহেবের ঘুম ভাঙে, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডোবাকাটা স্লিপিং স্যুট পরিয়া এদিকে আসেন। কেরানীবাবু, ওভারসিয়ারবাবু আগাইয়া আসে। 'জল তাহলে সত্যিই কমল। কালকের স্টেট্‌সম্যানে দেখছিলাম যে এলাহাবাদে গঙ্গার ম্যাক্সিমাম জল বাড়বার রেকর্ড পৌঁছুতে

আর মাত্র এক ফুট বাকি।' ওভারসিয়ারবাবু এই অভাবনীয় সংবাদের আরও বিস্তৃত খবর জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করেন।

'হটো, হটো, রাস্তা ছাড়ো।' হাকিম ডাকবাংলাতে ফিরিয়া যান।

হু হু করিয়া জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেরূপ গতিতে বান আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে।

দলে দলে লোক প্রতি ঘণ্টায় জলের মাপ দেখিতে আসে।

এ কয়দিন বন্যায় স্রোতে, গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীণ মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন গোবরাহা দিয়ারার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন আবার চেতন হইয়া উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীণ মনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

কালো, ভিজা, আঠালো পলিমাটি। কলাই কুর্থী ফেলিয়া দাও, কোঁচড়ের মধ্য হইতে কেবল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। জমি তৈয়ারি করিবার দরকার নাই, কেবল ফেলিবার মেহনত। নরম পাঁকের মধ্যে পা বসিয়া যায়, সেই পা কাদা ঠেলিয়া তোলার মেহনত। নিড়ানোর দরকার নাই, মজুরের খরচ নাই; সোনার ফসল ফলিবে।

যাহা পাও নিজস্ব করিয়া লও। সব জিনিস ব্যক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর; নিঙড়াইয়া লও, শুষিয়া লও। চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও।

জমি, পলিমাটি-পড়া কালো জমি দেখিয়া, আদিম লোভাতুর কিষাণ মন চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে? বন্যার জল সরিতেছে—রাখিয়া যাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্বের উর্বর ভূমি; কলাইয়ের ও কলহের ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

নাম লেখাও, কণ্ট্রোল দরে কলাই কুর্থীর বীজের জন্য। সুমৃৎ নিজের জমি লেখায় তিন হাজার বিঘা, নৌখে লেখায় চার হাজার বিঘা।

সুমৃৎ অন্য তিয়রদের নাম লেখায়। হাকিম বলেন, 'গনা তিয়র, কত বিঘা জমি, কত টাকা তাকাভি চাই? এক সঙ্গে সকলে কথা বলবেন না; আপনি কেন ওর হয়ে বলছেন? যার জমি, সেই বলবে।'

সমৃৎ বলে, 'ও জাতে তিয়র, নিরক্ষর অন্ধ, তাই আমি বলে দিচ্ছিলাম।'

'অন্ধ?'

'লেখাপড়া জানে না তাই বলছিলাম, দৃষ্টি নেই।'

'নৌখে ঝা ব্রাহ্মণদলের নেতৃত্ব করে। বলে, 'ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গতি ; একে হজুর বিনা পয়সায় বীজ দিতে হবে, এর জমি নেই এক ধুরও।'

সমৃৎ বলিয়া উঠে, 'না হুজুর, এর পনের-ষোলো বিঘা জমি আছে।'

বচসা জমিয়া উঠে। হাকিম অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওভারসিয়রবাবু, আপনিই তাহলে লিস্টটা করুন। আমি একটু আসছি।' যে যাহা পারে সঞ্চয় করিতেছে। সাঁওতালদের জন্য বীজের কথা, না নৌখে ঝা, না স্বমৃতের মনে আসে। বিরসা মাঝি গরুর জন্য ফিনাইল চুরি করিয়া মাটির গেলাসে রাখে। মঙ্গল মুসহর রিলিফের বাবুদের কাছে চুপি চুপি ইহার খবর দিয়া আসে। পাৎরঙ্গীর ছাগলটা শুকনো শালপাতা চিবাইতেছিল। গোকুল তিয়র এদিক ওদিক তাকাইয়া তাহার পেটে সজোরে এক লাথি মারে। তুরিয়া বাঁতাবের পুত্রবধূ কাপড়ের আঁচল, আধসেরটাক নুন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ভিজিয়া উঠিয়াছে। কানী মুসহরনী ভয় দেখায়, আমি হাকিমকে বলিয়া দিব। সাঁওতালেরা শুকনো শালপাতার বোঝা বাঁধে, বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য।

স্বমৃতের স্ত্রীর কাপড়খানি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানিকে আ[illegible] খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'যত চোরের আড্ডা' বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ম[illegible] [illegible]ের দিয়া চলিয়া যান।

[illegible] কত তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে পারে, তাহারই জন্য বাঁধাছাঁদা চলিতেছে। কয়দিনের মেলা ভাঙিয়া গেল। গনুয়া মুসহর বলে, 'বাধিয়ারা যাবে না ?'

'মুখ সামলে কথা বলিস। 'শীর্ষাবাদিয়া' না বলে ফের যদি 'বাধিয়া' বলিস, তা হলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব—বলে রাখলাম।'

মুসহর আর সাঁওতালেরা বাহির হইয়া পড়ে, এ কয়দিনের হাসিখুশি আলাপ নাই। সকলের মনের মধ্যে আগামী সমৃদ্ধির ছবি ; বাড়ি গিয়া কী দেখিব, এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও অতীতের ক্ষতি অনায়াসে ভুলিবার প্রয়াস।

তুচ্ছ জিনিস লইয়া ছোটখাটো ঝগড়া লাগিয়াই আছে। হাতগজ, চেন, লগা, বিঘা কাঠার দ্বারা সীমায়িত, সংকীর্ণ জমির মালিক। উদারতা আসিবে কোথা হইতে ? শীর্ষাবাদিয়া, মুসহর ও সাঁওতালদের নৌকার দরকার নাই। মধ্যের কোশখানেক একবুক জল তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে। কিছু কষ্টই নাই। কতটুকুই বা বোঝা—কত কটা বীজই বা পাইয়াছে। মুসহর ছেলেপিলেরা এখনই বীজের কলাই চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মনিরুদ্দি বলে, 'ছোটলোক কোথাকার, গায়ে কাদা ছিটোচ্ছে ?'

'আমি কি ইচ্ছা করে দিচ্ছি নাকি'—বিরসা সাঁওতাল জবাব দেয়।

গেনুয়া মুসহর ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'সেদিন ইস্কুলের কাছে বানে একটা হরিণ ভেসে এসেছিল। সেটাকে আমি আর হরিয়া প্রথম ছুঁয়েছিলাম। ঐ শালা বাধিয়া মনিরুদ্দি কোথা থেকে এসে খচ করে ছুরি দিয়ে হরিণটিকে জবাই করে। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটার গায়ে থুতু দিয়ে দেয়—যাতে আর কেহ ঐ মাংস না খায়। একেবারে পাষণ্ড। কি দিয়েই যে ভগবান এদের সৃষ্টি করেছিলেন! হরিণটার পেটে আবার বাচ্চা ছিল। 'বাধিয়া' বলবে না ,ওঁকে গুরুঠাকুর বলবে।'

তিয়রদের মধ্যে একা সুমৃৎ নৌকা আনাইয়াছে, অনুরূপ ঝা তাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। সুমৃত বলে, 'সরিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জায়গা নেই।' অনুরূপ ঝা কাকুতি মিনতি করে।—নৌখের পুত্রবধূ আর একটু ভাল না হইলে, নৌখে ঝা যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণদের মধ্যে, আর কাহারও নৌকা ভাড়া করিবার সংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিবার দেরি হইয়া যাইবে। শীত পড়িলে আর কলাই বুনিয়া কী হইবে? পাঁক শুকাইলে, কলাই বোনা না-বোনা সমান।

'ও সব আবদার তোমার গুরু নৌখে ঝার কাছে গিয়ে করোগে যাও। শীগগির নামো বলছি।'

'আচ্ছা, ভগবান আছেন।'

'শাপ দেওয়া হচ্ছে! রহিকপুরার বামুনের দেওয়া শাপ সুমৃত তিয়র এই—' ফুঃ ফুঃ বলিয়া হাতের তেলোয় ফুঁ দিয়া, নদীর দিকে উড়াইয়া দেয়।

সুমৃৎ মেয়েকে বলে, 'মাকে ডাক! এখনও সেখানে কী হচ্ছে?'

সুমৃতের স্ত্রী নিজের কাপড়খানি তখনও খুঁজিতেছিলেন—'থাক্, ও আর পাওয়া যাবে না। কোন মুসহরনী নিয়ে গিয়েছে কে জানে। একবার আঁতুড়ঘরে কচি বৌটিকে দেখে আসা যাক—যতই ঝগড়া থাক্ বৌটি একদিন তো মা বলেছিল। বড় ভাল মেয়েটি, হাজার হলেও রহিকপুরার বামুনের ঝাড় তো নয়। এখনও সঙ্গদোষে খারাপ হতে পারেনি!'

হঠাৎ আঁতুড়ঘরে ঢুকিতেই দেখেন, নৌখে ঝার স্ত্রী তাড়াতাড়ি একখানি তাঁহারই শাড়ির মতো আধময়লা শাড়ি প্রসূতির বালিশের নিচে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিয়রগিন্নির মাথায় রক্ত চড়িয়া যায়। বৌটির সহিত দেখা করিবার কথা আর মনে থাকে না। বন্যার স্রোতের মতো গালির স্রোত বহিতে থাকে। একজন সাঁওতালনী, ঠেলিয়া দুইজনকে আলাদা করিয়া দিতে দিতে, নির্বিকারভাবে সঙ্গিনীকে বলে, ,বিদেশে বিভুঁয়ে

আজকালকার দিনে আঁতুড়ের কাপড় জোটানো যে কি ব্যাপার, তা কেউ ভাববে না।'

ভলান্টিয়াররা কর্ডন করিয়া বামুনের দলকে ঘিরিয়া রাখে। তিয়রেরা নৌকা হইতে চিৎকার করে 'চোট্টা ভণ্ডের দল।' কর্ডনের ভিতর হইতে বামুনেরা বলে, 'ছোটজাতের পয়সার গরম শীগগিরই বেরবে।'

নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পাৎরঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াইয়া দিয়াছে নৌকার উপর। স্বমৃৎ তিয়র ছুঁড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে ফেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ করিয়া বলে, 'তোর জ়াতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিস।'

পাৎরঙ্গী চিৎকার করিয়া এককোমর জলে নামিয়া পড়ে, ছাগলটিকে বাঁচাইবার জন্য।

## আণ্টা-বাংলো

তরাইয়ের বন্য প্রকৃতিকে ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষদের আয়ত্তে আনিয়া যে সময় নীলকর সাহেবরা একচ্ছত্র আধিপত্য করিত, সেই সময়ের কথা। মানুষদের কথাই বলি ; সমুদ্রের নীল রং দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই, আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনোদিন তাকাইয়া দেখে নাই ; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালশিরার দাগ।

নীলায় বিচ্ছুরিত আলোকে প্রতিফলিত বৃত্তদের কেন্দ্র ছিল 'প্ল্যান্টার্স ক্লাব'—জেলার লোক বলিত 'আণ্টা-বাংলা'। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডার্নেভি সাহেব শীতে ও গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়িয়া মফস্বলে টুরে বাহির হইতেন, আর সারা বর্ষাকালটা আণ্টা-বাংলায় বসিয়া মদ খাইতেন।

একটি বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিলাতী কটেজের ধরনের একটি বাড়ি। ধবধবে চুনকাম করা দেওয়ালের উপর সোনালী খড় দিয়া ছাওয়া——জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতহস্তীর মতো। ভিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া বহুদূর হইতে লোকে দেখিত ভীতি, কৌতূহল ও সম্ভ্রমের সহিত। তর্জনী-সংকেতে সঙ্গীকে দেখাইয়া দিত—'ঐ ছাখ আণ্টা-বাংলা'। সাহেবদের কুকুরগুলি পর্যন্ত ছিল বিলাতী। ক্লাবের মেথর 'দুসাধ' চাকরগুলো আর কেরানীবাবু ছাড়া, কোনো নেটিভ দেখে নাই বারান্দায় পাতা সারি সারি

চেয়ারগুলি, ছাতার মতো গুগ্‌গুল গাছটার তলায় পাতা চেয়ার, টেবিল, টিপয়। কোনো ইণ্ডিয়ানের কানে পৌছায় নাই, ঘরের ভিতরের বিলিয়ার্ড বলের শব্দ, কাচের গ্লাসের নিক্কণ; সাহেবদের কোচম্যান সহিসগুলোও পর্যন্ত নয়। তাদের গাড়ি দাঁড় করাইতে হইত ফটকের বাইরে, অশথ গাছের তলায়। চীনের প্রাচীরের মতো রহস্যভরা ভিউব্যাণ্ডার বেড়া—এমন সমান করিয়া ছাঁটা যে, মনে হয় বুঝি-বা উহার উপর শোয়া যায়—ভিজা মেঝে এমন কি পেট নিচু খাটিয়ার চাইতেও আরামে শোয়া যায়।

নীলকর সাহেবরা 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব' বলিত না! 'খ্‌লাব' না হয় 'ইরপিয়ন' খ্‌লাব'।

সব সাহেব কালেক্টারই ইহার মেম্বার হইতেন। কেবল এক হর্ন সাহেব ইহার মেম্বার হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্যিকারের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্য হইতে পারেন, এ ক্লাবের নয়। নীলকরেরা এই অপমান মাথা পাতিয়া লয় নাই। দিন কয়েকের মধ্যে হর্নসাহেব বদলি হয়ে যান। এই প্ল্যাণ্টাররাই তখন আসল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কেবল নিজের কুঠির কাছের এলাকায় নয়, সরকারী দপ্তরও তখন ইহাদের কথায় উঠে, বসে। এ জেলা ছিল সাহেব অফিসারদের স্বর্গরাজ্য। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাহারা প্রথমে আসিতে চাহিত না। এখানে বদলি হইলেই বলিত, 'কালাপানির' সাজা হইয়াছে। ট্রান্সফার নাকচ করিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটে দৌড়াদৌড়ি করিত। পরে একবার আসিয়া পড়িলে আর ফিরিয়া যাইবার নাম করিত না। এমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সঙ্গসুখ, নেপাল তরাইয়ের এমন শিকারের প্রাচুর্য, আর কোথায় পাওয়া যাইবে। 'কালাপানির' একটি আগুল্‌ফ গাউন পরিহিতা স্বর্ণকমলের সঙ্গে টমটমে চড়িয়া কুলের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাওয়া, স্বপ্নরাজ্যের মতই মধুর। এই ভুজ-মৃণালের বন্ধন, কখন যে বৈধতার শৃঙ্খলে পরিণত হইত, তাহা অনেকে বুঝিতেও পারিতে না।

সেই যুগের রবিবার।

সকাল হইতেই মফস্বলের বহু দূর দূর হইতে সাহেব মেমের দল শহরে আসিতেছে।

কালো টমটমে মিস্টার আর মিসিজ মোবার্লি। গাড়ির চাকাগুলি লাল। দেওনন্দন মোক্তার হাকিমদের বাড়িতে সাপ্তাহিক তীর্থ পরিক্রমা করিতে বাহির হইয়াছেন—সাদা টমটম। সাহেবদের টমটম পাস করাইবার জন্য, নিজে পাশ কাটাইয়া রাস্তার কাঁচা অংশটির উপর গাড়ি থামাইলেন।

মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া মোক্তার সাহেব সাহেবকে সেলাম করিলেন। মোবার্লি বোধ হয় দেখিতে পাইলেন না। নেটিভদের গাড়ি পাশ করিলেই তখন মেম সাহেবরা গাউনের ধূলা ঝাড়িতে অভ্যস্ত। সেই প্রত্যাশিত ধূলা ঝাড়িবার সময় মিসিজ মোবার্লি মোক্তার সাহেবের গাড়ির দিকে এমন ভ্রূকুটি হানিলেন যে, তিনি সংকুচিত হইয়া যেন নিজের ঐ সময়ের গাড়ি চালানোর ধৃষ্টতায় নিজের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

কালো রঙের ঘোড়ায় বেলী সাহেব। এমন জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছেন যে, এই ভোর বেলাতেও ঘোড়ার মুখ দিয়া গ্যাজলা বাহির হইতেছে। ঘোড়াটি প্রোটেস্টাণ্ট গির্জার য়্যালোর ( aloe ) বেড়া লাফাইয়া পার হইয়া গির্জার হাতায় ঢোকে। ঘোড়ার জন্য পাগল সাহেবটা। অস্ট্রেলিয়া হইতে ঘাস আনায়।

ত্থাম্পনিতে ঠুকুর ঠুকুর করিয়া আসিতেছেন টমসন সাহেবের মেয়ে ফেলিসিয়া টমসন—কালাবালুয়া কুঠি থেকে। তেরো মাইল দূরে কালাবালুয়া কুঠি। বুড়ো বাপ সঙ্গে আসেনি; না, বাপকে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে কে জানে। আয়নার মত চকচকে বার্নিশ করা ত্থাম্পনিতে মুখ দেখা যায়। বলদজোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে, 'বিগবেনে'র ধ্বনিতে। ত্থাম্পনিটি ঢুকিল বেঞ্জামিন সাহেবের বাংলায়। গির্জার কাজ সারিয়া আসিয়া এইখানেই সারাদিন থাকিবে। বিকালে ছোট বেঞ্জামিনের সহিত ক্লাবে যাইবে। স্যাবাথের দিনেও নাচিবে; যে যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। ডাইনী বুড়ীর মতো দেখিতে, মিসিজ জনস্টনের খোঁটার তোয়াক্কা রাখিলে দুনিয়ায় বাঁচা শক্ত···

রবিবার তিনটি গির্জাই লোকে লোকারণ্য; না, সাহেবদের 'লোক' বলিয়া হয়তো বা তাহাদের ছোট করা হইল। আজ সারাদিন রামবাগের সাহেবদের বাংলাগুলি অতিথিদের কল কাকলিতে সরগরম থাকিবে, আর বিকালে আণ্টা-বাংলার বাহিরের অশথ গাছের নিচে বসিবে রঙ-বেরঙের গাড়ি-ঘোড়া বলদের মেলা।

ছোট বেঞ্জামিন ক্লাবের সেক্রেটারি। 'প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবে'র সেক্রেটারি সোজা পদ নয়। যে সে হইতে পারে না। অন্তত চিঠিপত্র লিখিতে জানা চাই; 'ডাহর্জিলং' ( Darjeeling ) অথবা 'ডাইনাপো, খুর্জি' ( Dinapore, Kurji ) স্কুল একবার ঘুরিয়া আসা চাই; পুরনো নীলকর সাহেবের বংশের ছেলে হওয়া চাই; ক্লাবের দুই চার মাইলের মধ্যে বাড়ি হওয়া চাই। সাধে কি আর হাকিমরা ভয় করে, মেয়েরা তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করে, বুড়ী

মেয়েরা তাহাদের নিজের হাতের তৈয়ারি কেক খাওয়ায়, লাট সাহেব শিকারে আসিলে তাঁহার সহিত খানা খাইবার নিমন্ত্রণ হয়।

এই রবিবারের দিনটির অপেক্ষা করিয়াই বেঞ্জামিন শুক্রবার হইতে ক্লাবের বার রুম'টি নূতন করিয়া তৈয়ারি করাইবার কাজে হাত দিয়াছে। এতদিন অফিস ঘরেই 'বার রুমে'র কাজ চলিতেছিল। দুপুরে বাড়ির ভিড়ে আর বুড়ো বাবা মা'র কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় ফেলিসিয়া টমসনকে লইয়া একটু সুস্থির হইয়া দুই দণ্ড গল্প করিবার জো নাই। তাই একটু নিরালায় ক্লাবে আসা—ঘরটির নির্মাণ কার্য তদারক করিবার অছিলায়। তিনদিন হইতে কাজ চলিতেছে। ইটের দেওয়াল, কাদার গাঁথুনি। গুলটেন রাজমিস্ত্রী গাঁথে, বিরসা ওরাওঁ মিস্ত্রীকে ইট কাদার যোগান দেয়, বিরসার পুত্রবধূ মাটির ঢেলা বাঁশ দিয়া পিটাইয়া কুশের শিকড় আলাদা করে, কোদাল দিয়া গুঁড়া মাটির মন্দির তৈয়ারি করে; মন্দিরের চূড়ায় গর্ত করিয়া জল দিয়া কাদা গোলে। ছোট বেঞ্জামিন গরমের মধ্যে সারাদিন কেবল গেঞ্জির আণ্ডারওয়ার পরিয়া ইহাদের কাজের তদারক করে। নেটিভদের সম্মুখে আবার লজ্জা কী? গরমের দিনে ইহাও ভারি সুবিধা। দুপুরবেলায় ক্লাবে কোনো শিষ্টাচারের প্রয়োজন নাই। বারে বারে স্যাণ্ডউইচ খাও, বিয়ার টানো, মার্কারের সহিত বিলিয়ার্ড খেলো, বাথরুমের জানালা হইতে বিরসাকে তাড়া দাও।

বিরসা ওরাওঁ বেঞ্জামিনদের তিন পুরুষের 'আধিয়াদার'। তিন পুরুষ হইতে তাহারা বেঞ্জামিন পরিবারের 'তসিলদারের' নিকট হইতে দাদন হিসাবে ধান লয়, চার বিঘা 'বটাই' জমির তিন বিঘায় নীলের চাষ করে। ছোট বেঞ্জামিনের ঠাকুর্দা কালো ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেত দেখিতে আসিলে বিরসার ঠাকুর্দা সেলাম করিত। 'কিছুই মেহনত করো না। তোমার মেয়েকেও তো ক্ষেতে কাজ করতে দেখছি না' বলিয়া চোখের ইশারা করিয়া চাবুক ঘুরাইলে সে 'হুজুর মা-বাপ' বলিয়া আরও ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। 'আমি বাপও না, মাও না' বলিয়া ঘোড়া ছুটাইতে আরম্ভ করিলে, স্বস্তির ফেলিয়া বটুয়া খুলিয়া খইনি ডলিতে বসিত।

এইরূপই পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। রবিবার গির্জা হইতে ক্লাবে আসিয়া ছোট বেঞ্জামিন দেখে যে গুলটেন রাজমিস্ত্রী গেটের নিকট 'কর্ণিক' হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

গুলটেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেলাম করে।

'এখনও বসে যে? গরমের দিনে সকালের দিকে কাজ বেশি হয় তোমাদের অদ্ভুত অভ্যাস।'

'না হুজুর মা-বাপ। মজুর এখনও আসেনি তাই··'

'বিরসা আসেনি? এখনও আসেনি! সে রাস্কেল বোধ হয় ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছে।' বিরক্ত হইয়া সে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখে। 'ভ_াডী?'

তাহার পর ভাবে যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক। কিছুক্ষণ সুরকি বিছানো রাস্তায় মস্ মস্ করিয়া পায়চারি করে, শিস দেয়, ফেলিসিয়া টমসনের কথা ভাবে···গির্জায় টমসন পরিবারের 'পিউ'টিতে খানিক আগের দেখা ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি; ইচ্ছা করে পা দুখানিকে মুঠার মধ্যে লইয়া পিষিয়া ফেলিতে; আশ্চর্য! গির্জার বেদী অপেক্ষাও স্বর্গীয়! তাহার পর উপমার অশোভনতার কথা মনে পড়ে। দুই হাত 'ক্রস' করিয়া পরম-পিতার নিকট মনে মনে ক্ষমা চায়।···ফেলিসিয়া বোধহয় এতক্ষণ মা'র নিকট তাহার নতুন বাবুর্চির নিন্দা করিতেছে। শীতকালে লাটসাহেব যখন তাহার টেনিস খেলার প্রশংসা করিতেছিলেন,'—ঠিক ডোহার্টির মতো স্টাইল কোথা হইতে পাইলেন—,সেই সময় ফেলিসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া—।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। সূর্যের তেজ বাড়িতেছে। বেঞ্জামিনের গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। আবহাওয়া ও বিরক্তিকর স্থিতি দুই 'সুইসেন্স'র কথা মনে করিয়াই আবার বলিয়া উঠে, 'ভ_াডী'। আর তাহার বিরসার জন্য প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য নাই। রাগের জ্বালায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে ফটকের বাহির হইয়া পড়ে, বিরসার বাড়ির দিকে; কাছে পাইলে এখনই তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। মরগামায় বিরসার বাড়ির দিকে; মেঠো পথে কিছুদূর যাইতেই ধুরী গয়লার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ধুরী ঝুঁকিয়া সেলাম করে। ভালই হইল—আর এই কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে বেশিদূর যাইতে হইল না। ঝোঁকের মাথায় এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে।

'ধুরী, বিরসাকে দেখেছিস?'

'হুজুর সে ক্ষেতের দিকে গিয়েছে হালবলদ নিয়ে—'

'বদমাসটাকে সায়েস্তা করতে হবে। তাকে আণ্টা-বাংলায় আসতে বলবি, জলদি, এখনই। বলবি আমি ডেকেছি।'

পূর্বাপেক্ষা বড় বড় পা ফেলিয়া বেঞ্জামিন ক্লাবে ফিরিয়া আসে। আবার গুগ্গুল গাছটির নিচে অধৈর্য হইয়া তাহার প্রজা বিরসার ধৃষ্টতার কথা ভাবে; এত সাহস! একথা তাহারা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। নীলের 'বটাইদার' (বর্গাদার) 'মালিকের' জন্য কাজ করিতে গাফিলতি

দেখাইয়াছে, এমন কথা তাহারা কোনো দিন শোনে নাই। প্রত্যহই তো আর তাহাকে 'মালিকের' জন্ম কাজ করিতে বলা হইতেছে না। আজ অন্ম বটাইদারকে জমি দিয়া দিলে-কাল ইঁদুরের মতো না খাইয়া মরিবে, দু'দশদিন মালিকের জন্ম কাজ করিয়া দিতেই যত আপত্তি। এ অবাধ্যতা আমাকে অপমান করিবার জন্য। বিশেষ করিয়া ক্লাবের কাজে, পাবলিকের কাজে, এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অসহ্য! 'কালে কালে হইল কি!' বিরসার পুত্রবধূ যে কাদা-মাটির যোগান দিতেছিল, সেই বা আসিল না কেন? নিশ্চয়ই সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আসে নাই। ইহার বিহিত করিতেই হয়। ইহাদের মধ্যে একজন আসিলেও কাজ চালানো যাইত।

ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরের দোকান হইতে কেনা বুটের আঘাতে তরাইয়ের নরম মাটি খাবলা খাবলা উঠিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বুটের টো দিয়া সে এক-আধটি দূর্বার গুচ্ছ, একেবারে খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইতেছে; কিন্তু এ শিকড়ের কি আর শেষ আছে—হাড়বজ্জাত নেটিভগুলোর মতো। এখনও আসিল না! ধুরী গয়লা আবার তাহাকে খবর দিল কিনা কে জানে? যদি না দেয়, তাহা হইলে আজ বিকালে ঘোড়ার চাবুক দিয়া তাহার হাডমাস আলাদা করিতে হইবে। বার রুমটির চার হাত উঁচু দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। সকাল হইতে কাজ আরম্ভ করিলে হয়তো বিকাল পর্যন্ত গাঁথুনীর কাজ শেষ হইয়া যাইতে পারিত।

খবর পাইয়া বিরসা ক্ষেত হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কয়েক গজ পিছনে আসিতেছে তাহার পুত্রবধূ। গেটের উপর বসিয়া ছিল গুল্‌টেন রাজমিস্ত্রী। সে তাহাদের শঙ্কাবিহ্বল জিজ্ঞাসুদৃষ্টির উত্তরে, ভিতরের গুগ্‌গুল গাছটির দিকে আঙুল দিয়া ইশারা করে। না জানি কি হইবে ভাবিয়া তাহারই বুক ঢিপ ঢিপ করে। নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য, এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির গুরুত্ব হাল্কা করিবার চেষ্টা করে একটি রসিকতা করিয়া; 'বজ্রমন সাহেব রাগে পায়জামা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' সে নিজেই এই কাষ্ঠ-রসিকতার সময়োপযোগিতায় সন্দিহান; বিরসার ইহা শুনিবার মতো মনের অবস্থা থাকিবার কথা নয়। গুল্‌টেন আগত বিপদের কথা মনে করিয়া বিরসার পুত্রবধূকে বলে, 'বোটরার মা, তুই আর ভিতরে যাস না।' বোটরার মা তাহার কথায় কান না দিয়া গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। যাই কি না যাই করিয়া গুল্‌টেনও অবশেষে কৌতূহল চাপিতে পারে না। কর্ণিক, সুতা, মাপকাঠি লইয়া পিছনে পিছনে ঢোকে। সাহেব বাঘের মতো তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রত্যাশিত আতঙ্কে বিরসা থমকিয়া দাঁড়ায়—

হাতজোড় করিয়া। সাহেব কোনো কথা না বলিয়া বেগুনী বোগনভিলার একটি ফুলভরা ডাল হেঁচকা টানে ভাঙিয়া দেয়। ডালের গায়ে বেলের কাঁটার মতো বড় বড় কাঁটা। তাহার পর বিরসার উপর যাহা চলে, বোটরার মা আর নিজের চোখে তাহা দেখিতে পারে না হাউ মাউ করিয়া সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সাহেবকে অসম্বদ্ধ কথায় বুঝাইয়া যায় 'পাদরী সাহেব রবিবারে কাজ করতে বারণ করেছিলেন। তাই আমরা আসিনি। এমন জানলে কি পাদ্রীর কথা আমরা শুনি!' সে সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়।

'হঠো, হঠ্ যাও।'

'এই বছর এই প্রথম জল হল কাল রাতে। তাই শ্বশুর হাল নিয়ে বেরিয়েছিল।'

'ওকালতি করতে কে বলচে? বাগো। অভী যাও।'

তাহার পর হাতকে বিশ্রাম দিবার জন্য থামে।

'কোন পাদ্রী সাহেব বলেছে? কালা পাদ্রী সাহেব বুঝি? রেভারেণ্ড টুডু? সে আমি আগেই বুঝেচি। বডম্যাস কাঁহাকা, দাঁড়াও সোজা হয়ে। গুলটেন নিয়ে আর খানকয়েক খুট। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়া। গুলটেন দে ওর মাথায় ইট ক'খান চাপিয়ে। স্যাবাথ ডে-তে ক্ষেতে কাজ করলে দোষ হয় না। পাদ্রী সাহেব বলেছিল। পাদ্রী সাহেব! মোটে ছয়খান ইট;'

গুলটেন চমকিয়া উঠে।

'এই আওরৎ, আরও দুখান ইট নিয়ে আয়।'

বোটরার মা শ্বশুরের মুখের দিকে তাকায় না। তাকাইলেও প্রবহমান অশ্রুর ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইত না। ইট দুইখানি যখন তাহার শ্বশুর তাহার হাত হইতে নেয়, তখন দুইজনেরই হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিরসা ইট দুইখানিকে আগেকার ছয়খানি ইটের উপর সোজা করিয়া বসাইতে পারে নাই। সাহেব ইংরাজিতে অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে সেগুলি নিজ হাতে ঠিক করিয়া সাজাইয়া দেয়। তাহার পর ফুঁ দিয়া হাতের সুরকি উড়াইয়া রুমালে হাত মোছে। বোটরার মা আর গুলটেনকে বলে, 'যাও, আজ আর কাজ হবে না।' বোটরার মা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আঙুল দিয়া গেট দেখাইয়া দেয়।

'ঝাও। ঝলভী!'

এ আদেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তত্রাইয়ের লোকের নাই।

তাহার পর বেঞ্জামিন বাড়ি যাইবার সময় মুনিলাল মার্কারকে বলিয়া যায় যে, সে দুইটার সময় খাইয়া দাইয়া আসিবে। বিরসাকে দেখাইয়া বলে, 'এই কুকুরীর বাচ্চাটির উপর নজর রাখিও।'

গেট হইতে বাহির হইয়া পথে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়। ফেলিসিয়ার স্মৃতি রাগের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছিল। ফিনিক্সের মতো তাহার আমেজ আবার জাগিয়া উঠে। হঠাৎ দেখে জামগাছটার নিচে বিরসার পুত্রবধূ। শ্বশুরকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া তাহার বাড়ি ফিরিতে মন সরে নাই। গায়ের কাপড় সামলাইয়া বোটরার মা গাছের গুঁড়ির আড়ালে যাইতে চেষ্টা করে। বেঞ্জামিনও এমনভাবে চলিয়া যায় যে সে যেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বেঞ্জামিন বোঝে যে এখনই হয়তো বোটরার মা আবার ক্লাবের গেটে পৌঁছিবে। বেশ বাঁধুনি তাহার শরীরের। ঘর্মমসৃণ দেহে কালো মার্বেলের কাঠিন্য। ফেলিসিয়ার দেহে স্বাস্থ্যের এ প্রাচুর্য কোথায় ; কিন্তু ফেলিসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া কি হইবে। ফেলিসিয়া ফেলিসিয়া। আবলুস ভাল নয় তাহা কে বলিবে, কিন্তু আইভরি অন্য জিনিস ; অন্য শ্রেণীর জিনিস। ইহা রাত্রি ও দিনের মধ্যের তফাত, অন্তর ও বাহিরের মধ্যের পার্থক্য।···

বুধনগড়ের রাজাসাহেবের কুকুরের খুব শখ। সম্প্রতি বিলাত হইতে একটি চালান আসিয়াছিল। কয়দিন হইল গরমের জন্য তাহাদের দার্জিলিং পাঠানো হইয়াছে। কুকুরের দেখাশুনা করিবার জন্য রাজাসাহেব বিলাত হইতে লোক আনিয়াছেন। সেই টার্নার সাহেব আর রাজাসাহেব দার্জিলিং যাইতেছেন। এখান হইতে দার্জিলিং যাইবার পথে রাজাসাহেবের কয়েকটি নিজস্ব ডাকবাংলো আছে। সেখানে গাড়ির ঘোড়া বদল করা হয়। বুধনগড় হইতে এখানে আসিয়া প্রথম ঘোড়া বদল করা হইয়াছে। পথের দুধারে জঙ্গল বলিয়া রাজাসাহেব বলেন যে, দিনে দিনেই যাওয়া ভাল। সন্ধ্যার সময় ডিংরার কাছের কুঠিতে থাকা যাইবে। হঠাৎ সংগীতজ্ঞ মোসাহেব বদলেও ঝা আসিয়া খবর দেয় যে, 'জনি ওয়াকার' শহরে পাওয়া গেল না। রাজাসাহেব অন্য কোনো ব্রাণ্ড পছন্দ করেন না। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠে। তাহা হইলে রওনা হওয়া চলে না।

'বলদেও, যাও তুমি ভাগলপুর, এখনই। সেখনে থেকে নিয়ে এসো, তারপর রওনা হওয়া যাবে।'

টার্নারকে এ কথা জানানো হয়।

'এর অজস্র বোতল আমি ইউরোপীয়ান ক্লাবে দেখেছি। ডোণ্ট ওয়ারি র‍্যাজা সাহাব। চলুন, এখুনি রওনা হওয়া যাক। পথে ক্লাব থেকে দু-চার

বোতল নিয়ে নিলেই হবে।' রাজা সাহেব মুখে পান জর্দা গুঁজিয়া, চাকরকে কুলকুচা করিবার জল আনিতে বলেন। কুঠিতে আবার যাত্রার আয়োজনের সাড়া পড়িয়া যায়।

বোটরার মা শ্বশুরের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহেব চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে গেটের নিকটের কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসিয়া রহিয়াছে। গেটের পায়ের বোগনভিলার লতাটি ডিউরেণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া দেখা যাইতেছে। কি চণ্ডাল এই লতার কাঁটাভরা ডালগুলো। কিযে না দেখিতে ফুলগুলি! কি জন্য যে সাহেবরা এ গাছ পোঁতে বোঝা দায়। ওদের ধরনই বোঝা শক্ত। কি মারই সাহেব বিরসাকে মারিয়াছে। ভুট্টা পেটায় না। সাহেবরা এ ফুলের গাছ পোঁতে বোধ হয় বটাইদারদের মারিবার চাবুক তৈয়ারি করিবার জন্য। এ কথা তাহার মনে এতদিন উঠে নাই কেন, তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হয়।

ক্লাবের ঝাড়ুদার ঝুড়িতে করিয়া কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে আবর্জনার রাশি আনিয়া কিছু দূরের একটি গর্তে ফেলিতেছে। গর্তের ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। বোটরার মা প্রতিবারেই ঝাড়ুদারের নিকট হইতে শ্বশুরের সম্বন্ধে দুই একটি খবর লইবার কথা ভাবে। সাহসে আর কুলায় না। একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিল।

'এই আস্তে কথা বল। ঐ আগুনের কাছে বোস'—ঝাড়ুদারের কথায় সহানুভূতির আভাস পাইয়া বোটরার মা নিশ্চিন্ত হইয়া পাতাপোড়ানোর গর্তের ধারে বসে। প্রতিবার আবর্জনার ঝুড়ি লইয়া আসিয়া ঝাড়ুদার দুই চারিটি কথা বলিয়া যায়, একসঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলিবার সাহস নাই।

'ঐ মুনীলাল জানতে পারলে রক্ষা নেই। সাহেবকে বলে দেবে যে আমিই তোকে এখানে বসতে দিয়েছিলাম। ও শালা সাহেবের সঙ্গে খেলে কি না, তাই নিজেকে লাটসাহেব মনে করে। ওকে মুনিলাল বললে চটে যায়। এই 'দুসাধীনে'র বেটাকে আবার মার্কার বলতে হবে।'

একবার আসিয়া বলে, 'বিরসাকে বললাম যে, দে চারখান ইট নামিয়ে রেখে দি; মার্কার সাহেব বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল শনিবারের রাতে সাহেবদের খুব প্রসাদ পেয়েছে কিনা খেলার সময়। ওর ঘুম ভাঙলে ফের উঠিয়ে দেবো'খন। তা সে রাজী হল না। বললো, সাহেব সাজা দিয়েছে, তার নিমক খাই। ইমানের কাছে ঝুঠা হতে পারব না। সুরুজ মহারাজ দেখছেন, ঝুঠা হলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে না। নে যা ইচ্ছে কর। ধামের

তো নদী বইছে। চোখ দুটোও তো এত লাল হয়েছে যে, এক পোয়া ভা' খেলেও অমন হয় না।'

'আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করছিল নাকি। আমার কথা, বোটরার কথা?'

'না!'

'আমাকে একবার ভিতরে যেতে দেবে? মার্কার সাহেব ঘুমুচ্ছে।'

'সাধ দেখে আর বাঁচি না। আমার এই চাকরি করে বালবাচ্চাকে খাওয়াতে হবে কি না? তোকে এখানে বসতে দেখেও বারণ করিনি এই খবর জানতে পারলেই তো সাহেব আমাকে বরখাস্ত করবে।'

তাহার পর কৃত্রিম কঠোরতার মুখোস ফেলিয়া বলে, 'চল্ ভিতরে। কয়েক ঝুড়ি মাটির ঢেলা নিয়ে আসবি। আর আনবি টিনটা। এই বাইরে বসে মাটি ভাঙার কাজ কর। কাদা করে রাখ। দুপুরে সাহেব এসে খুশি হবে। ও দেখিস দুপুরে নিশ্চয়ই আবার গুলটেনকে ডেকে কাজে লাগাবে, তোরও এখানে থাকার অছিলা থাকবে। আমাদেরও ভয়ের কিছু থাকবে না।'

বোটরার মা কয়েকবার ভিতরে গিয়া মাটির চাঙড় ঝুড়িতে করিয়া লইয়া আসে। কাজের অছিলায় বারে বারে যায়, একবার টিন আনিতে, একবার মাটি ভাঙিবার জন্য বাঁশের ডাণ্ডা আনিতে। বহু দূরে দেখে বিরসা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছন দিক দেখা যায়। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সেও সেইজন্য ওই দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দিকে ফিরিয়া থাকিলে হয়তো ইশারায় কিছু কথা বলা যাইত। ইটের বোঝার ভারে, সাদাচুলে ভরা বিরসার মাথা মনে হইতেছে কাঁধের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

বোটরার মা গেটের বাহিরে আসিয়া মাটির ঢেলা ভাঙিতে বসে। বোটরাটাই বা এতক্ষণ কি করিতেছে কে জানে। সে বুড়োর এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হইবে। সে তাহার বাবাকে দেখে নাই। বোটরা যেবার হয়, সেইবারই তাহার বাবা সেই যে বেলী সাহেবের আসামের চা-বাগানে চলিয়া যায় আর ফেরে নাই। লোকে বলে বোখারে মরিয়া গিয়াছে, না হয় সে দেশের মেয়েরা যাদু করিয়া তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। শ্বশুর তাহাকে বলিয়াছিল—ও হারামজাদার কথা ভাবিস না। তারপর হইতে সে তাহার মৃতদার শ্বশুরের সংসার করিয়া আসিতেছে। কত স্থান হইতে কত খৃষ্টান ওরাওঁ ছেলে, তাহার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছে। নীলগঞ্জ হইতে তাহার বাপের বাড়ির লোকেরা এই

বিষয় লইয়া কত আনাগোনা করিয়াছে। কিন্তু বুড়োর ও বোটরার কথা মনে করিয়া সে তাহাদের সমাজের রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস করিয়াছিল।—নিজের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে। বুড়ো আর দশ বছর বাঁচিলেই ততদিনে বোটরা হাল ধরিতে শিখিয়া যাইবে। ভারি বুদ্ধি ছেলেটার। এখন থেকে রোজগারের দিকে ঝোঁক। এখনও বুঝি লাল গির্জা হইতে ফেরে নাই। প্রতি রবিবার সকালে সেখানে বেলী সাহেবের ঘোড়া পাহারা দেয়। বেলী সাহেব প্রতি সপ্তাহে তাহাকে এই জন্য চারটি করিয়া পয়সা দেয়। সে এই দিয়া খুকশীবাগের হাটের দিন কত খাবার জিনিস কেনে। মা'র আর ঠাকুর্দার জন্য কিন্তু আলাদা করিয়া রাখা চাই। বেলী সাহেব যদি কয়েক বছর পরে বোটরাকে নিজের নীলকুঠিতে কাজ দেয়। ···বগ্গমন সাহেব যাইতে দিলে তবে তো।—

ঐ বোটরা আসিতেছে। কি করিয়া খবর পাইল। ধুরী কিম্বা গুল্‌টেন বলিয়াছে বোধ হয়। গাঁয়ে কি কোনো খবর চাপা থেকে—খবর হাওয়ায় ওড়ে। আমরা এখানে আসিবার আগেই দেখি সকলে জানে যে, সাহেব আজ চটিয়াছে।

বোটরা আসিয়া বিরসার কথা জিজ্ঞাসা করে।

'ভিতরে কাজ করছে।'

'তুমি বাইরে কাজ করছ কেন ?'

'চুপ করে থাক্। সব খোঁজে দরকার এতটুকু ছেলের।'

বোটরা চুপ হইয়া যায়। গর্ত হইতে যেখানে ধোঁয়া উঠিতেছে, সেখানে গিয়া বসে। একটি সুন্দর কাঁটাওয়ালা লতার ডাল আবর্জনার উপর রহিয়াছে। তাহাতে এখনও আগুন লাগে নাই। অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া উহাকে টানিয়া বাহির করে।

মা দেখিয়া বলে—'ওটা আবার নিয়েছিস কেন ? ফেলে দে আগুনে।'

'চাবুক করব এ দিয়ে !'

'কাটাওয়ালা চাবুক করে নাকি ?'

'ঘোড়া তো আর মারব না এ দিয়ে।'

কে এই ছেলের সহিত বসিয়া তর্ক করে। ভাগ্য ভাল যে এখনও খাওয়ার কথা মনে পড়ে নাই। তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল। সবুজ রঙের 'বেলা বাড়ার পাখিগুলি' এক ঘেয়ে হুক হুক শব্দ করিয়া চলিয়াছে। নিশ্চয়ই বেলা অনেক হইয়াছে। বুড়োর অবস্থা ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিয়া যায়।

ক্লাবের সম্মুখে রাজা সাহেবের প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়িটি আসিয়া দাঁড়ায়।

বোটরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে; কি তেজী ঘোড়া! বেলী সাহেবের ঘোড়ার চাইতেও ভাল।

অদ্ভুত মুখ কালো কুকুরটার; বাঁদরের মতো নাক থ্যাবড়া। কেমন সুন্দর লাল পোশাক—কোচম্যান, সহিসের। দেখিলে ভয় করে। সে যদি ঐ কোচম্যানের মতো জোরে, খুব জোরে অনেক দূরে ঘোড়া চালাইতে পারিত। একেবারে উড়িয়া চলিয়াছে ঘোড়া কেবল চাবুকের শব্দে, চাবুক মারিবার দরকার হইবে না···। কিন্তু সাহেব যদি রাগ করে—

রাজাসাহেব গাড়িতেই বসিয়া রহিলেন। ক্লাবের ভিতর যাওয়া বারণ না হইলেও হয়তো এইরূপই বসিয়া থাকিতেন। টার্নার সাহেব গাড়ি হইতে নামে। বোটরার মা এক মনে কাজ করিতেছে; কোন সাহেব কে জানে। গুঁড়া মাটির মন্দিরের চূড়ায় হাত দিয়া গর্ত করিয়া টিন হইতে জল ঢালিয়া দেয়। টার্নার সাহেব দেখিতে দেখিতে যায়। মাটির ঢিবির উপরটা জল ঢালিবার পর আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের মতো লাগিতেছে। funny! বসুন রাজাসাহেব, আমি এক মিনিটের মধ্যে আপনার জিনিস নিয়ে এলাম বলে; কাম অন জিমি। সাহেব শিস দিতে দিতে কুকুরটিকে লইয়া ক্লাবের গেটের ভিতরে ঢুকেন।

রাজাসাহেব কাশীর পান-জর্দা মুখে ফেলিয়া আবার নড়িয়া চড়িয়া বসেন। রাজ্যের ভাবনা চিন্তা তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—বলদেও আবার সাহেবকে দাম দিতে ভুলিয়া যায় নাই তো—

হুড়মুড় করিয়া কি যেন পড়ার শব্দ হয়।

টার্নার সাহেব আর কেরানীবাবু ক্লাবের অফিসঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে। একজন লোক মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে; একরাশ ইটের বোঝা ইতস্তত ছড়ানো। মুনীলাল মার্কার চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দৌড়িয়া আসে। ঝাড়ুদার আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করে—'বিরসা, এই বিরসা!' বিরসা সাড়া দেয় না। 'আচ্ছা লোক তো!' অচৈতন্য বিরসার নাক দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া একখানি ইটের নিচে জমিতেছে। ইটখানির গায়ে রক্ত চাপ বাঁধিয়া কালো হইয়া উঠিল।

টার্নার, সাহেব কেরানীবাবু, মার্কার মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বিরসাকে সারি সারি ইজি-চেয়ার পাতা বারন্দায় তোলে। কালেক্টর ভার্নেডি সাহেব নিশ্চয়ই সদরে নাই—থাকিলে এতক্ষণ ক্লাবে আসিত, বিয়ার টানিবার জন্য। টার্নার সাহেব ঝাড়ুদারকে পাঠায়—সিভিল সার্জন ও ছোট বেঞ্জামিনকে ডাকিতে। মার্কারকে চোখে মুখে জল দিতে বলে। তাহার পর ক্লাবে নগদ

দাম দিয়া কয়েকটি বোতল লইয়া কেরানীবাবুকে গাড়িতে পৌছাইয়া দিতে হুকুম করে।

'কাম অন জিমি!'

বিরসার আর জ্ঞান হয় নাই।

বেভারেও টুডুব অনুরোধে বুড়ী বেঞ্জামিন বিরসার কবরের উপরের প্রস্তরফলকের খরচ দেন। যত দোষই থাকুক না কেন, আফটার অল বিরসা ছিল ক্রিশ্চিয়ান। তাহার নাতি বোটরার হাতে মেমসাহেব একটি টাকা গুঁজিয়া দেন মিঠাই খাইবার জন্য। কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বোটরার মা কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

বুড়ী মেম তাহাদের কুঠির আউট হাউসে বোটরা আর বোটরার মা'র থাকিবার জায়গা করিয়া দেয়। সেখানে সারি সারি ঘর ধোপা, আর্দালী, বাবুর্চি, সহিস, কোচম্যানের জন্য। তারই মধ্যের একটি ঘর বোটরার মা পায়। কেই বা তাহাদের জমি দেখিবে; তাই সাহেব তাহাদের জমি তুল্লা মাঝিকে দিয়া দেয়।

মানুষ বদলায়। ফেলিসিয়া টমসন পাথর নয়। তাই বদলাইয়াছে। টার্নার সাহেবের খাস বিলেতে বাড়ি। তাহার সহিত বেঞ্জামিনের তুলনা! কোথায় ব্রিস্টল শহর, আর কোথায় মারগামা কুঠি।

বোটরার মা ছিল পাথর। সেও বদলাইয়াছে। সময়ে কিনা হয়। বুড়ো বেঞ্জামিন মারা যাইবার পর ছোট বেঞ্জামিন বোটরাকে বলে 'নৌকরী করোগে, রোজগার?'

বোটরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। সাহেব বলে—'চালাক ছোকরা।' ক্লাবে টেনিস বল কুড়াইবার ও ছোটখাটো কাজকর্ম করিবার চাকরি সে পাইয়া যায়। সেখানেও থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা লইয়া ক্লাবের সহকর্মীদের ঠাট্টার অর্থ সে বুঝিতে পারে না। কেবল এটুকু বোঝে যে, সাহেব কোনো মতলবে তাহাকে কুঠির ঘর হইতে সরাইয়া এখানে স্থান দিয়াছে, ওহাই বিদ্রূপের ইঙ্গিত।

এরূপ কত নীরব আর্তির বিচ্ছিন্ন কাহিনী, কত জলুসের নাগরদোলার আবর্ত মিলাইয়া ইহার পরের আণ্টা-বাংলার ইতিহাস। তরাইয়ের ভিজামাটির কালা আদমীর এ সবই সহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রতিবাদ জানাইল কালো কয়লা—তাও এখানের নয়, জার্মানীর। তাহার পর কোথা দিয়া কি হইয়া

গেল। এই প্রতিবাদের সংঘাতে নীল কাচের স্তর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে অজ্ঞাত-জগতের একখণ্ড,—উদার উন্মুক্ত আলোকে।

দুষ্টক্ষত শুখাইলে কি আর মাছি সেখানে থাকে? ঘোড়াপাগল বেলী সাহেব কুঠি বেচিয়া অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যায়। তামাকখোর লিউইস সাহেব যায় কমায়ুনে—ফলের বাগান করিতে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগে শ্রীরামপুরের যে পামার্স ব্যাঙ্কের নোট চলিত, তাহাদের বংশের টেডি পামার্স সরসৌনীবিজনিয়ার কুঠি বিক্রয় করে। তাহার পর যে গয়লার মেয়েকে ক্রীশ্চান করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, তাহাকে লইয়া কলকাতায় চলিয়া যায়। আরও কে কোথায় চলিয়া যায়, কে তাহার হিসাব রাখে। তাহাদেরই হিসাব রাখা যায়, চলিয়া যাইবার পূর্বে যাঁহারা ঘটা করিয়া টিকিট মারিয়া কুঠির জিনিসপত্র, ছবি নিলাম করিয়া যান।

গীর্জাগুলির সম্পত্তি বাড়িয়া ওঠে। জেলার উকিল মোক্তারের গৃহে সাহেবদের কুঠি হইতে কেনা, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবর্জনা জমিয়া উঠে। আণ্টা-বাংলা অনাবশ্যক ফার্নিচারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

এই অর্থহীন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বোটরা বড় হইয়া উঠে। প্রত্যহ সকালে ফাদার টুডুর কাছে যায়। পাদরী সাহেবের স্ত্রী তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন—'বোটরা তোর মা'র কাছে যাস না?'

'সাহেবের কুঠিতে তো আণ্টা-বাংলার কাজে হরহামেশা যেতে হয়।'

পাদরী সাহেব চোখ টিপিয়া স্ত্রীকে ইশারা করেন—এ প্রসঙ্গ থামাইয়া দিতে।

বলেন—'আজ যে মাসের হল তিন তারিখ। তোমার ঠাকুরদার মরার তারিখ আঠারই না? ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আর মাত্র পনরদিন বাকি। সেদিন সকালে কিছু খেয়ো না। পবিত্র মনে বিরসার কবরের উপর ফুল দিতে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে।'

বোটরা বোঝে যে, ফাদার তাহার মা'র প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন, তা-ও সে জানে। রাজাসুদ্ধ সবাই জানে, আর সে জানিবে না? তবে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে, আর কেহ তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। পাদরীগিন্নীর এ বিষয়ে এখনও এত কৌতূহলে সে সংকুচিত হইয়া যায়। মা'র সহিত দেখা তাহার আর হয় না বলিলেই হয়। দুই একদিন দেখা হইলে তাহার মাথায় তেল এবং পরনে রঙিন শাড়ি দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, সে বেশ সুখেই আছে।

নীল চশমা খোলার পরও চোখে অনেকক্ষণ রঙের রেশ থাকে। মোবাজি,

বেটিস, জনস্টন কীডের দল গ্রামের কুঠি ছাড়িয়া সদরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু চোখে তাহাদের তখনও পুরাতনেরই আমেজ। নীলের চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমি তো যায় নাই। রাতারাতি তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য। টমটমে চড়া মোবার্লি সাহেব নিজেদের পরিবারকে গড়মোগলাহার কুমার সাহেবের পরিবারের সমান মনে করে। বুধনগড়ের রাজাসাহেবকে নেপাল সরকারের মোরঙ্গের রিজার্ভ ফরেস্টে প্রতি বৎসর শিকারের অনুমতি দেওয়া আছে। বেটিস সাহেবেরও এ অধিকার চাই। মোরঙ্গ জেলার বড়াহাকিমের নিকট হইতে তাঁহার দরখাস্তের জবাব আসে না। রামবাগের রাস্তার সারি সারি নূতন বাংলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠে; আর নূতন ধনীর ঔদ্ধত্য লইয়া বাড়িয়া উঠে। চিরনবীন আণ্টা-বাংলা ক্লাবে জমিয়া উঠে অহোরাত্র উৎসব। সময় নাই, অসময় নাই, অষ্টপ্রহর ভিড় লাগিয়াই আছে। নীলের কাজ বন্ধ, কিন্তু কাহারও এক মিনিট নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই! ক্লাবের মিনাবাজারে স্টল খুলিবার ব্যবস্থা, বলনাচের পোশাক তৈয়ারি, নাচের মহলা, চাকাওয়ালা জুতা পরিয়া বায়ুগতিতে ছুটিবার অভ্যাস, কাজের কি অন্ত আছে? আণ্টা-বাংলার পিছনের মাঠের মধ্যে উঁচু করিয়া মাটির ঢিবি প্রস্তুত হইয়াছে; এই চাঁদমারীতে বন্দুকের নিশানায় হাত মক্স করা হয়। তালের ডেঙ্গোর একদিক সরু করিয়া বোটরা মাঠের মধ্যে হাতুড়ি দিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া কবরের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, নিজের ট্রাকে করিয়া আনা ইটের পথে, সে আগাইয়া চলিবে—'বোথারে'র রাজ্যে, বেলী সাহেবের চা বাগানের রাজ্যে, যাদুকরীদের স্বপ্নরাজ্যে। বর্ষায় পোড়া ঘাসগুলির গোড়া হইতে আবার শ্যামল সতেজ ঘাস বাহির হইবে। কিন্তু সে তখন কোথায়! আজ তো সে নেশা করে নাই। তবে এত বাজে কথা কেন মনে আসিতেছে। তাহার সর্বশরীর থর থর কাঁপিতেছে। সব পেশী ও শিরা দব্‌দব্‌ করিতেছে। কাপ্তেন পুলের রেলিং মনে হইতেছে, পলায়মান সাপের তীব্র বিসর্পিল গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাকুড়গাছের পাতা অজস্র সাপের জিভের ন্যায় লিক্‌লিক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। পিচগলানোর চুল্লীটিও সজীব হইয়া চোখের সম্মুখে নাচিতেছে। ঘোড়ায় চড়া বেলী সাহেব, চশমাপরা ফাদার টুডু, ঠাকুর্দা বিরসা, ছোট বেঞ্জামিন, মার্কার সাহেব, কেরানীবাবু, আণ্টা-বাংলার ভাঙা দেওয়াল, বোগনভিলির গাছ, অজস্র স্মৃতির প্রেতাত্মা তাহার ষ্টিয়ারিং হুইলের ভিতর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যার মতো চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জোনাকির অস্থির দীপালী, স্বচ্ছনীল জ্যোৎস্নার রাজ্য পিছনে ফেলিয়া সে চলিয়াছে। পথের লাল-কালো, রৌদ্রের ঝলক, পাকুড়-

গাছের সবুজ, অসংখ্য জোনাকির ঝিকিমিকি, ঘুরপাক খাইয়া কেমন যেন সব জট পাকাইয়া যায়। ষ্টিয়ারিং হুইলের উপর তাহার মাথা ঢলিয়া পড়ে। ক্লীনার চিৎকার করে 'সমহালকে ভাইয়া, মদ না খেয়ে ঢুলুনি আসছে নাকি? এই এই ঠিক করে ধর।' আট-টনি রোলার, মড়মড় করিয়া ইটের বর্ডার চূর্ণ করিয়া, সজোরে পথের ধারে পাকুড়গাছটিতে ধাক্কা দেয়। বোটরার স্পন্দনহীন দেহ ছিটকাইয়া পথের উপর পড়ে।

পশ্চিমা হাওয়ায় আণ্টা-বাংলার ইটের গুঁড়া উড়িয়া দিগন্তে মিশিয়া যায়। সঙ্গে উড়াইয়া লইয়া যায় ইগুয়ানোডনের যুগের মতো এক যুগের স্মৃতির অবশেষ। রাখিয়া যায় তরাইয়ের নূতন জীবনের জয়যাত্রার রাজপথ—মসৃণ কালো দেহে; নবপ্রসূতের রক্তলেখা। গত যুগের সাক্ষী পাকুড়গাছটির কাণ্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে, নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মতো।

পীরুমল কণ্ট্রাক্টর গোনে 'এক, দো, তিন, চার, পান, ছে, সাত, আট।'—আটখানি ইট বদলাইয়া নূতন করিয়া গাঁথিতে হইবে।

## ষড়যন্ত্র মামলার রায়

সরকার বাহাদুর

বনাম—

(১) অরুণকুমার দে
(২) ভুনেশ্বর প্রসাদ
(৩) কর্তার সিং
অভিযুক্ত (৪) শেখ ইদ্রিস
ব্যক্তিগণ (৫) ক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী
(৬) কপিলেশ্বর মাথুর
(৭) মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের ধারা, সরকার বাহাদুরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের ভিতর অসন্তোষ প্রচারের ধারা, সশস্ত্র ও হিংসাপূর্ণ উপায়ে বর্তমান সরকারের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টার ধারা, প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনের শান্তিভঙ্গের প্রচেষ্টার ধারা এবং ডাকাতির ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে, অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এই রোমাঞ্চকর মোকদ্দমা ইতিমধ্যেই আন্তর্প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রমামলা নামে

প্রেস ও পাবলিকের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সারা দেশ ইহার রায় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। ফাটকা বাজারে ভদ্র জুয়াড়ীরা মামলার ফলাফলের উপর বাজি রাখিয়াছে, এরূপ খবরও 'দৈনিক দেশবার্তা'র সম্পাদকের ( সরকারী সাক্ষী নং ৪৭ ) জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ ছেষট্টি কার্যদিবস এই মোকদ্দমা চলিয়াছে। একশ তেরোজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের কৌঁসিলিগণই যোগ্যতা ও পদোচিত নিষ্ঠার সহিত কোর্টকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের জন্যই এই মামলা এত সত্বর শেষ করা সম্ভব হইয়াছে।

কোর্টের নথীতে প্রাপ্ত উপকরণ হইতে অবান্তর প্রসঙ্গাদি বাদ দিলে সরকারের কেস সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়।—

অভিযুক্তরা সকলেই 'অগ্রণী রক্তবিপ্লব দল' নামক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দলের উদ্দেশ্য সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করা। এই দুর্বৃত্তদের বর্তমান কার্যস্থচী, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শান্তিকামী নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও ঘৃণার ভাব উদ্দীপ্ত করা, কপর্দকহীন ভিক্ষুকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করা, অপরিণতবয়স্ক সরলমতি বালকবালিকাদিগকেও রোমাঞ্চকর পুস্তিকাদি পড়িতে দিয়া কুপথে লইয়া যাওয়া। এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নারীর সম্মান রাখিতে জানে না, আমাদের নিজস্ব প্রতিভা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সকলপ্রকার নৈতিক মানের মূলোচ্ছেদ করিতে চায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ অফিসারের ( সরকারী সাক্ষী নং ১৩ ) বহুল তথ্যপূর্ণ সাক্ষ্য এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় 'টাউন হল'-এ সশস্ত্র বিপ্লব করিয়া, গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। পরে আন্দাজ সাড়ে ছয়টার সময় সম্মুখস্থ পার্কে ষড়যন্ত্র কার্যান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বিপদ কুটচক্রান্তে যোগদান করে।

ফার্স্ট-ইনফরমেশন-রিপোর্ট দায়ের করিয়াছিলেন মৌলবী নবী বক্স, জেলা-খাসমহল-অফিসার ( সরকারী সাক্ষী নং ১ )। তাঁহার সাক্ষ্যে প্রকাশ যে গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মেদবাহুল্য রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ডাক্তার তাঁহার স্ত্রীকে উন্মুক্ত বায়ুসেবন করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারের পর তিনি ঐ পর্দানশীল ভদ্রমহিলাকে পার্কে আনিয়া ছিলেন। তাঁহারা পার্কে ঢুকিতেই, কয়েকজন লোক পার্কের গেট হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের টাউন হলে প্রবেশ করে।

টাউন হলের দরজাগুলি বন্ধ ছিল। দরজা খুলিয়া তাহারা ভিতরে ঢোকে। লোকগুলি অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশই বা করিল কেন, আর ভিতর হইতে দরজা বন্ধই বা করিয়া দিল কেন, তাহা এই দম্পতিকে বিশেষ সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। স্বতঃই তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ইহারা কোনো গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে না তো? তাহার উপর আবার শীঘ্রই একটি তছনছ কাণ্ড ঘটিবে, এইরূপ আভাস এতদ্দিনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ স্পেশাল-ব্রাঞ্চ-বিভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ গোপনীয় ছাপ দেওয়া চিঠিতে, জেলার সব অফিসারদের চোখ ও কান খুলিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে লোকগুলি টাউন হলে ঢুকিয়াছিল. পথের আবছা আলোতে দূর হইতে তাহাদিগকে স্কুল-কলেজের ছাত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। মুহূর্তমধ্যে তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে ইহা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান মহবুবের জন্য তাহার মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন ;—সে আবার ঐ দলের মধ্যে নাই তো? কিছুদিন হইতে তাহারও রকম-সকম ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল না। ইনকিলাব, বিপ্লব, সংঘর্ষ, লড়াই প্রভৃতি কথায় ভরা কতকগুলি চোতা কাগজ-পত্রিকাদি তাহার পড়ার টেবিলের উপর কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছিল। মহবুবের মাতার আগ্রহাতিশয্যে সাক্ষী নবী বক্সকে তখনই পুত্রের খোঁজে টাউন হলে যাইতে হয়। একদল গুপ্তচক্রান্তকারীদের মধ্যে যাইতে তাঁহার বেশ ভয় ভয় করিতেছিল, কিন্তু পত্নীর সম্মুখে তিনি তাঁহার এই মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা টিপিয়া টিপিয়া টাউন হলের বারান্দায় উঠেন। সেদিন কনকনে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল। পার্কের দিকে মহবুবের মাতা ছাড়া জনপ্রাণীও আছে বলিয়া মনে হইতেছিল না। নবী বক্সের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল,—শীতে নয় ; বিপদে পড়িয়া চিৎকার করিলেও কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না এই ভাবিয়া। সাবধানের মার নাই : তিনি মাথা ও কান ঢাকিয়া মাফলারটি গালপাট্টার মতো করিয়া জড়াইলেন। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরের ব্যাপারটি কি তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না ; একজন প্রাণের আবেগে ওজস্বিনী ভাষায় কি সব যেন বলিতেছে ; বোধ হয় দলের পাণ্ডা হইবে। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিলেন। সব পরিষ্কার শোনা যায় না। তবু যেটুকু শোনা গেল…

'এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্ত-শোষকের দল তিলে

তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই রক্তবীজের ঝাড় কবে, কি করে বিতাড়িত হবে! আপনারা বোধ হয় জানেন যে পৃথিবীর কতকাংশ থেকে এদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে সেখানকার লোকের চেষ্টায়। তারা এই ঘৃণ্য পরভুকদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কোনো বাধা তাদের সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে টিঁকতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশে কি তা সম্ভব হবে? কেন হবে না! 'পারিব না' এ কথাটি কেবল কাপুরুষদের অভিধানেই পাওয়া যায়। অপরেও যা পেরেছে, আমরাও তা পারব না কেন। এ কাজের জন্য চাই ত্যাগ, চাই সংগঠন, চাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, চাই প্রচার, চাই অর্থ,—আর চাই সমাজের মণি, নির্ভীক অক্লান্তকর্মী তরুণের দল, যারা মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে। এ সংঘর্ষে অহিংসার স্থান নেই। চিরবৈরী রক্ত-শোষকদের রুধিরে আপনার হাত রক্তরঞ্জিত হয়ে যাক; প্রধূমিত পঙ্ককের ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠুক; তাতে পশ্চাদপদ হলে চলবে না। দেশমাতৃকা এই রক্তপাতে, বহ্ন্যুৎসবে সন্তুষ্টই হবেন। আপনারা বোধ হয় জানেন যে রোমের ক্যাপিটলের ভিত্তিপ্রস্তর নরবলির রক্ত দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল সেটাকে বেশি মজবুত করবার জন্য। আমাদের রাষ্ট্রীয় ইমারতের ভিত্তিও প্রাণীহিংসার উপরই স্থাপিত করতে হবে। চতুর্দিকের এই অনাহারক্লিষ্ট পাণ্ডুর শীর্ণ নরকঙ্কালগুলি কি আপনাদের কারও মনে সাড়া জাগায় না? আপনারাও তো ভুক্তভোগী, তবু কি আপনারা এরূপ উদাসীন থাকবেন? দরখাস্ত, কাকুতি-মিনতি, খোশামোদ আমরা বহুকাল করেছি। ওতে কিছু ফল হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন 'দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া'। সবল, সতেজ, বলদৃপ্ত কণ্ঠে বলতে হবে—'আমরা আসমুদ্র-হিমাচল প্রতি গ্রামে গ্রামে সংগঠন করব। আমাদের সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে যেই 'সূর্য গেল অস্তাচলে' অমনি আরম্ভ হল এদের রাজত্ব। কোথায় সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি, আর কোথায় এই পরভুকদের রণ-ঐক্যতান বাদন! উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!...'

সাক্ষী নবী বক্স ভাবিলেন, এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদের মহবুব কি আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিবে? কি যে দিনকাল পড়িয়াছে! ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের যুগের ছেলেদের নেশাভাঙ করিয়া বখাটে হইয়া যাওয়া অনেক ভাল ছিল। তিনি হলের দরজা সামান্য ফাঁক করিতেই, একটি উজ্জ্বল সাদা আলোর ঝলক, ঘরের জমাট অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া গেল। এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হইয়া গেল;—ইহারা কি জানিতে

পারিয়াছে যে কোনো অনাহূত, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাহাদের গুপ্ত বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহাদের কথাবার্তা আড়ি-পাতিয়া শুনিতেছে? —এই বুঝি তাঁহারই দিকে সার্চলাইটের মতো আলোটি জেলে—তারপর স্টেনগানের গুটিকয়েক কট্‌কট্‌ শব্দ মাত্রর অপেক্ষা!···

মহবুবের চিন্তা মাথায় চড়িল। খোদাতাল্লার নাম লইয়া পলাইবার সময় তাঁহার মনে হইল যে হাঁটু দুইটি অবশ হইয়া গিয়াছে, পা দুমড়াইয়া আসিতেছে। কিছুদূরে আসিয়া তাঁহার মহবুবের মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁহার কথা সাক্ষী এতক্ষণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পার্কে ফিরিয়া গিয়া দেখেন যে তিনি অঝোরে কাঁদিতেছেন। ভয়ের কোনো কারণ নাই বলিয়া তাঁকে সান্ত্বনা দিবার সাহস পর্যন্ত তখন সাক্ষীর ছিল না। তাঁহারা বাড়ি পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরই মহবুবকে বাড়িতে ঢুকিতে দেখিয়া নবী বক্‌স নিশ্চিন্ত হন। জিজ্ঞাসা করায় মহবুব বলে যে সে একজন বন্ধুকে তুলিয়া দিতে স্টেশনে গিয়াছিল। এতক্ষণে সাক্ষী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। তখন হঠাৎ সরকারী অফিসার হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে পড়িয়া যায়। গাড়ি বাহির করিয়া তখনই তিনি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ছোটেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এস. ডি. ও. সাহেব ও নবী বক্‌স কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সঙ্গে করিয়া দুইটি পুলিশভ্যানে টাউন হলের নিকট গমন করেন। টাউনহলটি পুলিশবাহিনী ঘেরাও করে। পুলিশেরা বন্দুক ও অফিসার কয়জন রিভলভার লইয়া, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক হলের ভিতর প্রবেশ করেন। প্রতিমুহূর্তে তাঁহারা আততায়ীদের আক্রমণের আশঙ্কা করিতে ছিলেন। একটা কিসের যেন শব্দ হয়!··· 'যে কেহ থাক, নড়াচড়া না করিয়া হাত উঁচু কর, নতুবা গুলি করা হইবে',—এই কথা বলিয়া পুলিশসাহেব হলের ভিতর টর্চ ফেলেন। একটি শীর্ণ শীতার্ত কুকুর সাক্ষী নবী বক্‌সের হৃৎকম্প বর্ধিত করিয়া, তাঁহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। এই কুকুরটি ব্যতীত ঘরে আর কেহ ছিল কিনা। পুলিশসাহেব তখন নবী বক্‌সের দিকে হাতের আলো কেন্দ্রিত করিলেন। নবী বক্‌স ভয়ে ঘামিতে আরম্ভ করিতেছেন। সাহেব আলো ফেলিয়া দেখিতেছিলেন যে খবর দিবার সময় খাসমহল-অফিসার অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সাহেবের দোষ নাই। খাসমহল-অফিসারের নিজেরই ক্ষণিকের জন্য নিজের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইল।

সকলে টাউন হলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, একজন পুলিশ খবর দিল যে পার্কের ভিতর ষড়যন্ত্রকারীর দল তখনও বসিয়া সলা-পরামর্শ

করিতেছে। নবী বক্স এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন;—আর পুলিশসাহেবের তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কিংবা কল্পনাপ্রবণ বলিয়া ভাবিবার অধিকার নাই।—

সকলে মিলিয়া পার্কের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্কের পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে যে পাবলিকের বসিবার বেঞ্চগুলি আছে, ঐদিক হইতেই মানুষের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। পিছন হইতে নিঃশব্দে নিকটে গিয়া ইহারা তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গলার স্বরে বোঝা গেল যে তাহারা বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। টাউনহলের সেই জ্বালাময়ী ভাষণকে একটি বিশেষক্ষেত্রে কি করিয়া কার্যকরী করিতে হইবে তাহারই বিশদ আলোচনা চলিতেছে। শীতের রাত্রের অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ পাইয়া তাহারা কূট চক্রান্তে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে। কানে আসিল—'এজেন্টটা কি আমাদের একেবারে ভেড়া ভাবে নাকি? নিজে করিস ভুল, আর আমাদের ভয় দেখাস 'ফায়ার' করবি বলে। I don't care if I am fired। ও বেটার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কালকে ক্যাশ মিলানোর পর ও যখন গাড়িতে চড়তে যাবে সেই সময় বুঝলে? আর সেক্রেটারিকে ব্যাপারটা আজ জানিয়ে রেখেছি। এসব ঐ রাস্কেল স্পাইটার কাজ।'

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বোঝেন যে একজন সরকারী agent provocateur-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দেরি না করিয়া তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেন। অরুণকুমার দে, ভুবনেশ্বর প্রসাদ, কর্তার সিং ও শেখ ইদ্রিসকে এই স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ ইদ্রিস পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। অরুণকুমার দে-র পকেটে একটি কাগজমোড়া গোলাকার বোমার মতো জিনিস পাওয়া যায়।

ইহাদের পুলিশভ্যানে পৌঁছাইয়া, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের দল পুষ্করিণীর অপর পারের দিকে অগ্রসর হয়েন। সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর (আসামী নং ৫ ও ৮) পুষ্করিণীর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে একখানি জাল টেলিগ্রাম পাঠাইতে পারিলে হাতের কাজটি অতি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। সরকারী পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, উপরোক্ত আসামী দুইজন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছিল যে মাড়োয়ারীর বাচ্চা পাঁচ লক্ষ টাকার শোক সহ্য করিতে পারিবে না বোধ হয়। গদীর ম্যানেজারকে সাজসে জানিবার সম্বন্ধে যে সময় তাহারা সলাশরামর্শ করিতেছিল, সেই সময় তাহাদের

গ্রেপ্তার করা হয়। একদল পুলিশ ইহাদেরও পুলিশভ্যানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

তাহার পর পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিক হইতে লোকজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পার্টি সেইদিকে অগ্রসর হয়। সেখানকার ষড়যন্ত্র-কারীরা বোধ হয় দূর হইতেই ইহাদের দেখিয়া ফেলিয়াছিল। নবী বক্সের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে চক্রান্তকারীদের মধ্যে একজন লোক আবৃত্তির মতো স্বরে—'যায় যাবে যাক্ প্রাণ' বলিয়া ঘাটের চাতালের উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিল। তাহার তিন চারজন সঙ্গী দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আগের আসামীদ্বয়কে ভ্যানে পৌঁছাইয়া দিয়া পুলিশেরা তখনও ফেরে নাই। তাই পুলিশসাহেবের দল, ঐ তিন চারজন পলায়মান চক্রান্তকারীদের তখন অনুসরণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। জলের ভিতরের ঐ বিপজ্জনক বিপ্লবীটিকে কি করিয়া ধরা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না জানা নাই। তবে সে এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়ই। কেহই এই অন্ধকারে এই মারাত্মক আসামীটিকে ধরিবার জন্য জলে নামিতে রাজী নয়। হঠাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মাথায় এক বুদ্ধির ঢেউ খেলিয়া যায়। তিনি পুষ্করিণীর চারিদিকে সকলকে ছড়াইয়া পড়িতে বলেন। শীতের মধ্যে লোকটি কয় ঘণ্টা আর জলে থাকিতে পারিবে? লোকটিও বোধ হয় গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আর একটুও দেরি করিল না। 'তোর গায়ের কাপড়খানই এখন পরতে হবে রে দেখছি, ঘ্যাণ্টা' এই বলিতে বলিতে সে সেই ঘাটের সিঁড়ির উপরই ওঠে। তখন সে পুলিশ দেখিয়া সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় বিস্মিত হইবার ভান দেখায়। পুলিশ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকটিই অভিযুক্ত নং ৭, মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদা।

নবী বক্সের আসামীদের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে উপরোক্ত সাক্ষ্য, পুলিশ সাহেব (সরকারী সাক্ষ্য নং ৬৮) এবং পুলিশ সাবইন্সপেক্টর (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯)-এর জবানবন্দী দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।

ইহাই সংক্ষেপে সরকার পক্ষের কেস।

আসামীরা বলে যে তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আসামী পক্ষের কৌঁসিলি প্রথমেই আপত্তি জানান যে, বিভিন্ন আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে; এগুলির একত্রে বিচার আইনসংগত নয় এবং ইহা অভিযুক্তদের ন্যায়বিচার পাইবার পক্ষে হানিকারক হইবে। আমার মতে এ আপত্তির কোনো সারবত্তা নাই। যে মূল তথাকথিত ষড়যন্ত্র, টাউন হলে

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই এই মামলার ভিত্তি। বলা হইতেছে যে পার্কের ছোট ছোট উপদলীয় খণ্ডচক্রান্তগুলি উহারই কার্যকরী অঙ্গমাত্র।

এইবার এক এক করিয়া অভিযুক্তদের কেস লওয়া যাউক।

একই আইনজীবী, অরুণকুমার দে, ভুনেশ্বর প্রসাদ ও কর্তার সিং এই তিনজন অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। অরুণকুমার দে-র বাড়ি চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে। ভুনেশ্বর প্রসাদের দেশ সাহাবাদ জেলায় এবং কর্তার সিং সিয়ালকোটের লোক। ইহারা তিনজনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের কেরানী। কর্তার সিং অল্প কিছুদিন মাত্র এখানে আসিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় সে ব্যাঙ্কের সিয়ালকোট শাখাতে কাজ করিত।

আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী প্রভাস পালের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানীয় ব্যাঙ্কের কেরানীদের একটি ইউনিয়ন আছে। তিনি উহার সেক্রেটারি। গত বৎসর পূর্বভারতের ব্যাঙ্কগুলির কেরানীরা ধর্মঘট করিয়াছিল। সেই হইতে এখানকার ব্যাঙ্কের 'এজেণ্টে'র সহিত কেরানীদের ঠিক বনিবনা হইতেছে না। ব্যাঙ্কের স্থানীয় বড সাহেবকে 'এজেন্ট' বলে। কেরানীদের মধ্যে একজন, যে পূর্বোক্ত ধর্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাকে অন্য কেরানীরা 'স্পাই' বলে। এই 'স্পাই'টি যে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 'এজেণ্টে'র বাড়িতে যায় এবং অন্য কেরানীদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংবাদ তাঁহাকে দেয়, তাহার প্রমাণ সেক্রেটারির কাছে আছে। 'এজেন্ট' সাহেব ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে কিছু বলিতে সাহস করেন না, কিন্তু অন্য কেরানীদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন। সময়ে অসময়ে 'ফায়ার' করিব অর্থাৎ চাকরি খাইব বলিয়া ভয় দেখান। এখানে ব্যাঙ্কই সরকারী ট্রেজারির কাজ করে। কালেক্টরের অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহে ছাপা-ফর্মে, ফসল ও চাসের অবস্থা, বারিপাত, গো-মড়ক প্রভৃতি নানা তথ্যপূর্ণ একটি রিপোর্ট পাঠায়। 'এজেন্ট' সাহেব স্বহস্তে এই পাক্ষিক রিপোর্ট লেখেন।

সাক্ষী প্রভাস পাল আরও বলে যে গভর্ণমেণ্টের ফর্মগুলির একপিঠ সাদা থাকে। কেরানীরা নিয়মিত বাজে কাগজে চিঠি-পত্রাদির খসড়া লিখিয়া, এজেণ্টের ঘরে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিলে তবে উহা ভাল কাগজে টাইপ করা হয়। উক্ত ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একটি বহু পুরাতন কালেক্টরের অফিসের রিপোর্টটা উল্টা পিঠে, একখানি জরুরী চিঠির নকল লিখিয়া, কর্তার সিং 'এজেণ্টের' কামরায় পাঠাইয়াছিল। 'এজেন্ট' ফসল ও চাষবাসের রিপোর্ট দেখিয়াই হেড অফিসে

পাঠানোর জন্য পাক্ষিক রিপোর্ট লিখিতে বসিয়া যান। তাড়াতাড়িতে তিনি কালেক্টর অফিসের রিপোর্টের তারিখটি লক্ষ্য করেন নাই। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া 'এজেন্ট' সাহেব তাঁহার পাক্ষিক রিপোর্টটি তৈয়ারি করেন। দিনান্তে রিপোর্টটি কর্তার সিং-এর হাতে ফিরিয়া আসিলে, কে হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে পারে না। সে সাতিশয় নম্রতার সহিত, 'এজেন্ট' সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার ভুলটি দেখাইয়া দেয়। ইহার জন্য কোথায় 'এজেন্ট' সাহেব কর্তার সিং-এর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন তা নয় তিনি এইসব অকর্মণ্য উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীদের চাকরি হইতে 'ফায়ার' করিবার ভয় দেখান। এই দুর্ব্যবহারে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। একপিঠে অন্য চিঠি লেখা কালেক্টরের অফিসের উল্লিখিত রিপোর্ট, এবং উহারই আধারে এজেন্ট দ্বারা লিখিত ভুল পাক্ষিক রিপোর্টটি, এই সাক্ষী দাখিল করিয়াছেন। ঐ কাগজগুলি সময়ে এজেন্টের বিরুদ্ধে কখনও কাজে লাগিতে পারে বলিয়া, ইউনিয়নের সুযোগ্য সেক্রেটারি, ওগুলিকে বাজে কাগজের ঝুড়ি হইতে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রভাস পালের সাক্ষের আলোকে, ফার্স্ট-ইনফরমেশন রিপোর্টে উল্লিখিত প্রথম তিনজন আসামীর মধ্যের কথাবার্তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই আসামীদের কৌঁসিলির জেরার উত্তরে, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করেন যে, আসামী অরুণ দে-র পকেট হইতে যে সন্দেহজনক গোলাকার পদার্থ টি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা গভর্ণমেণ্টের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরীক্ষার রিপোর্টটি বোধ হয় ভুলক্রমে নথীতে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন যে ঐ গোলাকার পদার্থ টির উপকরণ বিজ্ঞানের পরিচিত কোনো বিস্ফোরক নয়। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেরায় আরও স্বীকার করেন যে ঐ দ্রব্যটি সরকারী কেমিক্যাল এনালিস্টের নিকটও রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তাঁহার পরীক্ষার রিপোর্টটিও বোধ হয় ভুলক্রমে কোর্টে দাখিল করা হয় নাই। তাঁহার রিপোর্টে কি লেখা ছিল তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। ঐ কাগজখানি এত তাড়াতাড়িতে পুলিশ অফিসে খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত।

বহুক্ষণ জেরার পর আসামীপক্ষের উকিল তাঁহাকে মনে করাইয়া দিল পুলিশ সাহেবের আবছা আবছা মনে পড়ে যে ঐ রিপোর্টে লিখিত ছিল, গোলাকার বস্তুটিতে কাপড়কাচা সাবানের উপকরণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় নাই। উহাতে আরও লিখিত ছিল যে বস্তুটি বহুকালের প্রাচীন হওয়ায়

উহার রং কালচে হইয়া গিয়াছে। কেরানীরা অফিস হইতে ফিরিবার পথে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া যায় কিনা সে খবর সাক্ষী জানেন না। কাপড়কাচা সাবান কোনো কেরানী পরিবারের আবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে পড়ে কিনা তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

এইবার আসামী নং ৪ শেখ ইদ্রিসের কেস লওয়া যাউক। পার্কে ঐ সময় প্রথম তিনজন আসামীর নিকটবর্তী বেঞ্চে বসিয়া থাকা এবং পলাইবার চেষ্টা করা ছাড়া, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আর কোনো প্রমাণ নাই। তাহার উকিল স্বীকার করেন যে ইদ্রিসের আদি বাড়ি ফায়জাবাদে; সে একজন পেশাদার পকেটমার এবং ইতঃপূর্বে পকেট মারিবার অপরাধে তাহার পাঁচবার সাজা হইয়াছে। আমাদের এতকালের জজিয়তীর জীবনে আসামীপক্ষের উকিলের এইরূপ ডিফেন্স লওয়া, সত্যই এক নূতন অভিজ্ঞতা। গ্রেপ্তারের সময় তাহার পকেট হইতে একটি ক্ষুরের ব্লেড পাওয়া যায়, যাহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছে। তাহার উকিল বলেন যে গত হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার পর হইতে গাঁটকাটার পেশা আর খুব অর্থকরী নাই। নিজের ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পকেট মারিবার পূর্বে ইদ্রিসকে আজকাল তিনবার ভাবিয়া লইতে হয়। এই ব্যবসায়িক মন্দার সহিত ইদ্রিস বীরের মতো লড়িতেছে। বিনা পুঁজিতে অর্থোপার্জনের সে নানা প্রকার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে এবং এইগুলি দিয়াই সে তাহার খানদানী পেশার সংকুচিত আয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

ঘটনার তারিখে সে বিকাল তিনটা হইতেই রেলস্টেশনে 'চন্দৌসী মেল'-এর একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টের বাঙ্কের উপর শুইয়াছিল। মেল ট্রেনটি এখান হইতে বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়ে। ঐ ট্রেনটিতে অসম্ভব ভিড় হয়। ইদ্রিস প্রত্যহই আগে হইতে বাঙ্কের উপর শুইয়া থাকে। কোনো প্যাসেঞ্জারের নিকট হইতে দুই এক টাকা যাহা পাওয়া যায় লইয়া, তাহাকে ঐ বাঙ্কের উপর শুইবার স্থান করিয়া দেওয়া, ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। উপরোক্ত 'অকুর' দিবস তাহার পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ছিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐদিন তাহাকে একটি শক্ত পাল্লায় পড়িতে হইয়াছিল। মুসলমানী টুপি পরিহিত একটি যুবক, আর একটি যুবককে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বাঙ্কের স্থান এতক্ষণ আগলাইয়া রাখিবার পরিশ্রম বাবদ একটি টাকা প্রথমোক্ত যুবকটির নিকট চাহিবামাত্র সে কামরার ভিতর ভীষণ হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেয়। শীর্ণকায় ইদ্রিসকে বেশ কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম প্রহার দিবার পর সে তাহাকে টানিয়া

প্ল্যাটফর্মের উপর নামায়। তাহার পর যুবকটি ইদ্রিসকে রেলওয়ে পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিয়া যায়। স্টেশনের পুলিশ কনস্টেবলদের সহিত ইদ্রিসের বহুকালের পরিচয়। বাক্সের দরুন একটাকা প্রাপ্যের মধ্যে, দুই আনা করিয়া রেল পুলিসকে ইদ্রিস নিয়মিত দিত। কাজেই যুবকটি চলিয়া যাইবার পরই পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। সে মনের দুঃখে আন্দাজ ছয় ঘটিকার সময় পার্কের বেঞ্চিতে আসিয়া বসে।

আপাতদৃষ্টিতে ইদ্রিসের এই 'মোরগ ও ষণ্ডের কাহিনী' অবিশ্বাস্য মনে হইলেও ইহার সমর্থনে আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে। আসামী পক্ষের দুই নম্বর সাক্ষী শেখ মহবুব, সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী নবী বক্সের পুত্র। যেদিন তাহার পিতাকে জেরা করা হইতেছিল, সেদিন শেখ মহবুব কলেজ কামাই করিয়া কোর্টে আসিয়াছিল, উকিলরা কি করিয়া তাহার পিতাকে নাজেহাল করে তাহা দেখিবার জন্য। সেই সময় হঠাৎ আসামী ইদ্রিস চিৎকার করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইদ্রিসের উকিল তাহাকে থামাইয়া আমাদের নিকট নিবেদন করেন যে, তাঁহার মক্কেল মৌলভী নবী বক্সের ছেলেকে দেখাইয়া বলিতেছে যে ঐ বাবুসাহেবই সেদিন স্টেশনে তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন আমি উক্ত আইনজীবীকে মহবুবকে সমন করিবার জন্য লিখিত দরখাস্ত দিতে বলি। পরে মহবুবের সাক্ষে ইদ্রিসের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। মহবুব ঘটনার তারিখে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়, ঐ লুঙ্গি পরিহিত আসামীটির ন্যায় এক ব্যক্তিকে বাক্স হইতে নামাইয়া সামান্য কয়েকটি চপেটাঘাত করিয়াছিল। সাক্ষী আরও বলে যে সে তাহার এক বন্ধুকে চন্দৌসী মেল এ তুলিয়া দিতে গিয়াছিল।

এই সাক্ষীর ইদ্রিসের সহিত কোনো পূর্বসম্বন্ধ নাই। আসামী ইদ্রিসের সহিত তাহার স্বার্থ কোনো প্রকারে জড়িত, এরূপ ইঙ্গিতও সরকারী পক্ষ হইতে করা হয় নাই। আমরা এই সত্যভাষী ও 'উজ্জ্বল' যুবকের সাক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

এইবার ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুর এই দুজনের কেস লওয়া যাইতেছে।

এই দুইজন আসামীই এই শহরে ডাক্তারি করেন। পূর্বে বিবৃত প্রমাণ আসামী ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে। তাঁহার বাড়ি সার্চ করিবার সময় 'অগ্রণী রক্তবিপ্লব দল'-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র 'রক্তাম্বর' বাহান্ন কপি পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গত বৎসর, কিংবা তাহার আগের বৎসর, তাঁহার পাড়ার কোনো যুবক, কি যেন বলিয়া

কয়েকটি টাকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই তাঁহার নিকট এই কাগজখানি প্রতি সপ্তাহে আসিতে আরম্ভ করে। তাহার পর কবে যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আসামীর উকিলের জেরায় সার্চ ও তদন্তকারী পুলিশ দারোগা (সরকারী সাক্ষী নং ৬৯) স্বীকার করেন যে সার্চের সময় প্রাপ্ত 'রক্তাম্বর'-এর কপিগুলির উপরের মোড়কগুলি তখনও একখানিও খোলা হয় নাই। পুলিশের হাতে আসিবার পর পোস্টাব প্যাকেটগুলি সুযোগ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের তত্ত্বাবধানে খোলা হয়, তাহার ভিতর কি সব লেখা আছে তাহা দেখিবার জন্য। সাক্ষী নং ৬৯ আরও বলেন যে কাগজখানি এখনও বে-আইনী করা হয় নাই।

এই পোস্টাল মোড়ক না খুলিবার সম্বন্ধে সরকারী উকিলের যুক্তি বেশ মনে রাখিবার মতো। তিনি সন্দেহ করেন যে ঐ সাপ্তাহিকগুলি পাঠ করিবার পর, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী, যেরূপ সন্তর্পণে কাগজখানিকে মোড়কের বাহির করিয়া লওয়া হইত, সেই সাবধানতার সহিতই পুনরায় উহার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতেন। সত্য হইলে, ইহা আসামীর পক্ষে কম দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

আসামী ক্ষিতীশ নন্দী ও কপিলেশ্বর মাথুরের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঘটনার তারিখে সন্ধ্যা আন্দাজ ছয়টার সময়, তাঁহারা শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসামী কপিলেশ্বর মাথুর, উপরোক্ত শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীর পরিবারের চিকিৎসক। দুইদিন হইতে বহু ঔষধপথ্যাদি সত্ত্বেও তাহার হিক্কা বন্ধ হইতেছিল না। ডাক্তার কপিলেশ্বর মাথুর তাঁহার রুগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সিনিয়র ডাক্তার ক্ষিতীশ নন্দীকে 'কল' দেন। শ্রীপুণমচন্দের গৃহ হইতে ফিরিবার সময়, আসামী ক্ষিতীশ নন্দী তাঁহার সান্ধ্য ভ্রমণ সারিয়া লইবার জন্য, নিজের গাড়িখানি খালিই বাড়ি পাঠাইয়া দেন এবং দুই ডাক্তার পদব্রজে পার্কে আসেন। এখানে তাঁহারা রুগীকে হঠাৎ একটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিয়া তাঁহার হিক্কা বন্ধ করিবার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। এইজন্য শ্রীপুণমচন্দজীকে পাঁচ লাখ টাকা ব্যবসায়িক ক্ষতির সংবাদ দিয়া একখানি জাল টেলিগ্রাম দিবার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

এই সম্পর্কে আসামী পক্ষের সাত নম্বর সাক্ষী পুণমচন্দ মাড়োয়ারীর সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। এই সাক্ষ্যের সমর্থনে পুণমচন্দের ব্যবহৃত ঔষধের প্রেসক্রিপশন-গুলির নকল ওরিয়েন্টাল-মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে (এক্জিবিট ঘ ১ হইতে ঘ ৭ পর্যন্ত)।

ডাক্তার ঘোড়পাড়ে আসামী পক্ষের ছয় নম্বর সাক্ষী। ইনি বোম্বাই শহরের হিক্কারোগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন এ কথা সরকারী উকিলও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে ইনি বলেন যে, তাঁহার ডাক্তারী আয়ের উপর এই বৎসর চোদ্দ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধার্য হইয়াছে। এই সাক্ষীর কোনো কথা অবিশ্বাস করিবার প্রশ্ন উঠে না। এই সাক্ষীর মতে, কঠিন হিক্কা কেসগুলিতে যখন ঔষধপথ্যে কোনো উপকার পরিলক্ষিত হয় না, তখন কড়া গোছের মানসিক আঘাতই একমাত্র ফলপ্রসূ চিকিৎসা। সরকার পক্ষ হইতে ইঁহাকে লম্বা জেরা করা হইয়াছে। জেরায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে বার্ধক্যে লোকের মন শিশুর মতো দুর্বল হইয়া যায়। সত্তর বৎসর বয়সকে এদেশে বার্ধক্য নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। একটি ছোট ছেলের হেঁচকি বন্ধ করিতে হইলে, সে চুরি করিয়া খাইয়াছে কিনা এই প্রশ্নাঘাতই যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞের এই কথাগুলির ভিত্তিতেই সরকারী উকিল আমাদের সম্মুখে বহস করিয়াছেন যে শ্রীপুণমচন্দ মাড়োয়ারীর ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির সংবাদ সহ্য করা অসম্ভব। রুগী মারিয়া রোগ সারাইবার কথা নিশ্চয়ই আসামী ডাক্তারদ্বয় ভাবিতেছিলেন না। সেইজন্য সরকারী উকিলের মতে, আসামীপক্ষের বিবৃতি অবিশ্বাস্য।

আমরা অবশ্য এ বিষয়ে সরকারী উকিলের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত মত এই যে হিক্কার তীব্রতার উপরও, আবশ্যক মানসিক আঘাতের তীব্রতা নির্ভর করিবে। আর পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতির আঘাতকে সরকারী উকিল মহাশয় যতটা বড় করিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীপুণমচন্দজীর মতো ব্যবসায়ীর পক্ষে উহা সত্যসত্যই ততটা বড় কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

এইবার আমরা আসামী মিহিরবরণ রায় ওরফে ভোঁদার কেস লইতেছি। সে প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র।

আসামী পক্ষের সাক্ষী নং ১২ তড়িৎ মুখার্জীর সাক্ষ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে বলে যে তাহার ডাকনাম ঘ্যাণ্টা। ঘটনার তারিখে তাহারা পার্কের পুকুরধারে বসিয়াছিল। সে, টঁ্যাপা, ভোঁদা, আর বিশে এই কয়জন বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহারা সকলেই স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র। আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা একটু গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের ছেলে। ভোঁদার বিশ্বাস যে সে থিয়েটার ও আবৃত্তি ভাল করিতে পারে। সে অল্পতেই চটিয়া যায় বলিয়া তাহার বন্ধুরা তাহার পিছনে লাগিতে

ভালবাসে। উক্ত ঘটনার দিন সাক্ষীরা তাহাকে এই বলিয়া খেপাইতেছিল যে সে এই শীতের রাত্রে কিছুতেই স্নান করিতে পারিবে না। দুই একবার উস্কানি দিবার পরই ভোঁদা তাহাদের বাজি রাখিতে বলে। দুই আনার চানাচুর বাজি রাখা হয়। সাক্ষীরা মতলব আঁটিয়াছিল যে ভোঁদা জলে নামিলেই তাহারা তাহার জামা লইয়া পলাইবে, সে যাহাতে স্নান সারিয়া ডাঙায় উঠিবার পর আর কাহাকেও দেখিতে না পায়। সাক্ষী বলে যে, আসামী মিহিরবরণ অতঃপর জামাটি খুলিয়া ঘাটের চাতালের উপর রাখে এবং আবৃত্তির স্বরে বলে, 'নিশ্চয়ই করিব স্নান।' তাহার পর মিনিটখানেক মনে মনে ভাবিয়া ইহার সহিত আর একটি লাইন মিলাইয়া আবৃত্তি করে— 'যায় যাবে যাক প্রাণ।' এই বলিয়া আসামী মিহিরবরণ ওরফে ভোঁদা জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সরকারী উকিলের জেরার উত্তরে সাক্ষী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে যে আসামী মিহিরবরণ রায় তাহাদের ক্লাসের ছেলেদের নেতা। গতবার অঙ্কের প্রশ্ন কঠিন আসিলে, পরীক্ষার পর, তাহারই নেতৃত্বে ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে এক এক করিয়া গিয়া অঙ্কের শিক্ষককে মোগলাই কায়দায় কুর্নিশ করিয়া আসে।

এইবার আমরা এই মামলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাক্ষী, রেবতী সেনের সাক্ষ্যের বিষয় আলোচনা করিব। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে এই সাক্ষীকে সরকারী পক্ষ বা আসামী পক্ষ কেহই সমন করেন নাই। সরকারী উকিলের নির্দয় জেরার ফলে, সাক্ষী তড়িৎ মুখার্জী ওরফে ঘ্যান্টার চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া গিয়াছে, তখন তিনি হঠাৎ ধমক দিবার মতো করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে সে রাত্রিতে পড়িতে বসে কি-না? তবে সে অত রাত্রে পার্কে বসিয়া ছিল কি করিয়া? সন্ধ্যার সময় বাড়িতে না ফিরিলে তাহার মা বাবা বকেন কি না? প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতেই সাক্ষী জবাব দেয় যে, সে সেদিন মাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে রেবতীবাবুর ছবি দেখিতে যাইতেছে।

তখন আমরা এই রেবতীবাবুকে কোর্টের সাক্ষীরূপে ডাকি।

কোর্ট-সাক্ষী রেবতী সেন নিজের সাক্ষ্যে বলেন যে তাঁহার আদি নিবাস বরিশালে। তাঁহার বয়স চুয়ান্ন বৎসর। তিনি জেলার স্যানিটারি বিভাগে কাজ করেন। সেকালে ফোর্থক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাহার পর 'স্বদেশী'র হুজুগে মাতিয়া মুকুন্দদাসের যাত্রার দলে ঢোকেন। তাহার পর বাখরগঞ্জ জেলার কয়েক বৎসর নেতাদের মিটিং-এ চেয়ার সতরঞ্চি সামিয়ানা

ইত্যাদির ব্যবস্থার গুরুভার নিজের উপর লইয়া, বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কালাতিপাত করেন। সেই সময়ে তাঁহার মেশোমশাই তাঁহাকে এখানে আনিয়া এই চাকরি করিয়া দেন। বেতন বর্তমানে ডিয়ারনেস এলাওয়েন্স সমেত বিরাশি টাকা। তাঁহার ডিউটি স্বাস্থ্যবিদ্যা ও রোগের প্রতিষেধক ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রচারের কার্য করা। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় পানীয় জলের কুয়ায় ওষুধ দেওয়া, ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন, প্যালুড্রিন ট্যাবলেট বিলি করাও তাঁহার কাজ। প্রতিমাসে তাঁহাকে চারিটি প্রচার বক্তৃতা দিবার ডায়েরি উর্ধ্বতম অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস তিনি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন। সরকারী উকিল এই সম্বন্ধে তাঁহাকে জেরা করিলে, তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তিনি ছোট কাজ করেন বলিয়া তাহাকে সরকারী উকিল ব্যঙ্গ করিতে সাহস করিতেছেন, অথচ এক মিটিং-এ কমিশনার সাহেব একটি লিখিত বক্তৃতা বারংবার জলপান করিতে করিতে পাঠ করিলেও, তিনি সরকারী উকিল মহাশয়কে নিরবচ্ছিন্ন করতালি দিতে দেখিয়াছেন। জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেন যে স্যানিটারি বিভাগের কাজ চালানোর জন্য তাঁহার নিম্নলিখিত ছয়টি বক্তৃতা মুখস্থ আছে:— কি করিয়া কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়ে, বসন্তের টিকা; ম্যালেরিয়ার মশা; আদর্শ পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী; খাদ্য ও পানীয়; রুগীর পথ্য ও শুশ্রূষা। এই ছয়টি বিষয়ের উপর ম্যাজিক-লণ্ঠন স্লাইডও আছে। একটি প্রাথমিক বক্তৃতার পর ম্যাজিক-লণ্ঠনে সেই বিষয়ের ছবিগুলি দেখান হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আজকালকার টকির যুগে, আর তাঁহার ম্যাজিক-লণ্ঠন মিটিংগুলিতে সেকালের মতো লোক হয় না। চাকরি বাঁচাইবার জন্য অনেক সময়ই খোসামোদ করিয়া শ্রোতা জুটাইতে হয়। তিনি তাঁহার কাজের ডায়েরি কোর্টে দাখিল করিয়া বলেন যে, গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় স্থানীয় টাউন হলে তিনি ম্যালেরিয়ার মশার উপর বক্তৃতা দেন। তিনি আরও বলেন যে, বাড়ি বাড়ি গিয়া, তিনি পাড়ার ছেলেদের ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে আসিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছিলেন। আজকালকার ছেলেরাও আবার এইরূপ বদ হইয়া উঠিয়াছে যে বাড়িতে তাহাদের পিতামাতাকে বলিয়া যদিই বা তাহাদের রাত্রে ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে আসিবার অনুমতি করাইয়া দিই, তথাপি তাহারা মিটিং-এ উপস্থিত হয় না। অথচ ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখিতে যাইতেছি বলিয়া বাড়ি হইতে কিন্তু বাহির হয় ঠিকই। উহাদেরই বা দোষ কি? একই বক্তৃতা কতবার শুনিবে, একই ছবি আর কতবার দেখিবে?

এই বাকপটু সাক্ষীটিকে তখন আমরা ম্যালেরিয়ার মশা'র উপর বক্তৃতাটি আমাদের শুনাইতে বলি। প্রথমে সাক্ষী মৃদু আপত্তি জানান। বলেন যে ম্যাজিক-লণ্ঠন স্লাইড সঙ্গে না থাকিলে তিনি ভাল বক্তৃতা দিবার মানসিক প্রেরণা পান না। তৎপরে আমাদের আগ্রহাতিশয্যে, গভীর অনুভূতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যঞ্জনার সহিত বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

…'এদের জাতকে নির্মূল করে দিতে হবে। এই রক্তশোষকের দল তিলে তিলে আমাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে।' ইত্যাদি…

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটানা বক্তৃতা চলে। সাক্ষী মৌলভী নবী বকস্ যে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের বক্তৃতা টাউন হলে শুনিয়াছিলেন, হুবহু সেই বক্তৃতাটি।

'এই দেখুন এনোফেলিস মশার ছবি বলিয়া সাক্ষী রেবতী সেন নিজের বক্তৃতাটি শেষ করেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পর ঐ বাক্‌সংযমহীন সাক্ষীটি সরকারী উকিলকে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—'কি আমার বক্তৃতা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন কেন? ঢকঢক করে জল খাইনি বলে ভাল লাগল না বুঝি?'

তাঁহার পুরাতন রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস, এবং কোর্টের মধ্যের দুর্বিনীত আচরণ সত্ত্বেও আমারা রেবতী সেনের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে ইতস্তত করিতেছি না।

ইহার পর ষড়যন্ত্রের কাহিনী আর দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য আমি আসামীদিগকে বেকসুর খালাস দিবার হুকুম দিতেছি।

স্বাক্ষর…

বিচারক

তাং ২৫. ৮…

# চকাচকী

এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।

ধামদাহা-হাটের 'চকাচকী'। চকাচকী নামটি আমারই দেওয়া—যদিও সে নাম পরে জেলাসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে। অদ্ভুত অবস্থায়, তাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে তখন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক কাজের সূত্রে। মুসাফিরলালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধামদাহা-হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে। তখন সেখানে ঘোড়ার দড়ি নিয়ে, হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, পুরোদমে টাগ-অব-ওয়র খেলা চলছে। দড়ির একদিকে দুবেজী, অন্যদিকে দুবেনী আর অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান!—বলেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিতপাত। তবু হাসি থামে না।

দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে।—'জানোয়ারেরা সুদ্ধ তোর দিকে, তোর সঙ্গে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।'··

'দাঁড়াও না! তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!'

এর জের আরও চলত কিনা জানি না। আমরা গিয়ে পড়ায় তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল। ছারপোকাভরা দড়ির খাটিয়াটি, আমাদের জন্য বার করতে ছোটে তারা দুজনে।···

দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কী সুন্দর দেবীপ্রতিমার মতো চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ।···আর কী আপন-করে নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপচে-পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে।

তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।

বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালের পছন্দ হয়নি নামটি। কুটিলতায় ভরা তার লাল চোখটি একটু টিপে, ঠোঁটের কোণে একটা ইঙ্গিতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, 'চকাচকী না বলে, চড়ুই-চড়ুইনী বলুন এদের। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির, এখনও কী ছমক! ছেঁদো কথার কী বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে! ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুইপাখির

মতো! এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই ডুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, ডুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু ডুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে ডুবেনী…'

মুসাফিরলালকে থামিয়ে দিই। জানি তো তাকে। ডুবেনীর সম্বন্ধে ও সুরে কথা বলা আমার খারাপ লাগছিল। সব জিনিসে সে খারাপের গন্ধ পায়!…

এর পর কতবার যে তাদের বাড়িতে গিয়েছি তার ঠিক নেই। না গিয়ে কি নিস্তার ছিল? ওদিকে গিয়েও তাদের বাড়িতে যাইনি জানতে পারলে চকাচকী দুঃখিত হত। শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের প্রত্যেক রাজনীতিক কর্মীর বেলায়ই ঐ এক নিয়ম। দল-নিরপেক্ষভাবে। তার কুঁড়েতে যা জুটবে, চারটি না খেলে রক্ষা নেই। না-খাওয়ার রকক-সকম দেখলে, অতিথির কাপড়-গামছার ঝুলিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে ডুবেনী রাখবে রান্নাঘরে। যদি কোনোদিন বলেছি, 'অমুক গ্রাম থেকে এখনই খেয়ে আসছি—আজ আর খাব না', অমনি ডুবেজী অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু ডুবেনী চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। বেতো টাটু ঘোড়াটার পিঠ থেকে চটের বোরাটা সে নেয় বাঁ হাতে; আর ডান হাত দিয়ে আমাকে ধরে টানতে টানতে উঠোনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হুকুম করে, 'বোসো এই বোরাটার উপর। বসে বসে দেখো, আমি কেমন করে রুটি সেঁকি।' তারপর ডুবেজীকে লক্ষ করে বলে, 'মরদ দেখো! মান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর ডুবেনী, যে তোমার মানের কদর দেবে!'

কতক্ষণ আর কথা না বলে থাকে ডুবেজী। রাঁধবার সময় মেলা বকিস না, বুঝলি! মুখের থুতু ছিটকে অতিথের রুটির উপর পড়বে।'

'থামো থামো! অত আর থুতু ছিটকোয় না! এ কি তোমাদের মতো খয়নিগোঁজা মুখ, যে কথা বললে থুতুর ভয়ে বাঘ পালাবে। বুঝলে বাবুজী, আমি এক-এক সময় বুড়োকে বলি যে, আমার সম্মুখে বসে বাজে বকবক না করে যদি সে হাটের মালিকের তরকারি-ক্ষেতে বসে আকাশের সঙ্গে কথা বলে তাহলে শাকসবজির পোকামাকড় দু-চারটে মরে তামাক-গোলা থুতুতে। তা কি শুনবে। যত গল্প ওর আমারই কাছে।'—

নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য?

জবাব দিয়েছিল—'আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কী করে?'

এমন সরল নিষ্পাপ দম্পতিও পাপের ভয়ে আকুল! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয়! শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন চকাচকী জেলে যাবার হুযুগ তুলল। তখন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে যাবার হিড়িক উঠেছে দেশে। ঠাট্টা করে তাদের বলি, 'ভেবেছ যে জেলে গিয়েও তোমরা একসঙ্গে থাকবে? সে গুড়ে বালি। ঢুবেনীকে যে পাঠিয়ে দেবে মতিহারীর মেয়েদের জেলে!'

'রামজীর মনে যা আছে, তা তো হবেই।'—একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল ঢুবেজী।

রামজীর মনে কী ছিল তিনিই জানেন; হিসাব গুলিয়ে দিল থানার দারোগা। ঢুবেনীকে যথাসময়ে পুলিশ জেলে ধরে নিয়ে গেল; কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ো বলে ঢুবেকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করলেন দারোগাসাহেব। সে পরিচিত প্রত্যেকের দুয়োরে গিয়ে মাথা কোটে, দারোগাসাহেবের কাছে একটু তদ্বির করে, তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্য।

কিছুতেই কিছু হল না।

দিনকয়েক পর দেখা গেল ঢুবেনা গভর্ণমেণ্টের কাছে মাফ চেয়ে মুচলেকা লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে একেবারে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল। চড়ুইনীর বেহায়াপনায় সবচেয়ে মর্মাহত হল কানা মুসাফিরলাল। তার বিশ্বাস ঢুবেনী ঢুবেজীকে ছেড়ে না থাকতে পেরেই বেরিয়ে এসেছে।—এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও?

ঢুবেনী কারও ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটি কথারও জবাব দেয়নি। শুধু তার দৈনিক রামজীর পূজো আগের চেয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর ঢুবেজী ছেড়ে ছিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা।

আমার সঙ্গে ঢুবেজীর অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশি। 'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি'—বাঙালী কবির এই পদটির মানে তাকে বুঝিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'ঢুবেনীরও কি তাই?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করে—'রামজীরও কি সীতাজীর জন্য এমনি হত নাকি?'

'সে কথা তো বলতে পারি না; তবে শ্রীকৃষ্ণের হত রাধিকার জন্য।'

'আরে কিষুণজী-ভগবানও যা, রামজীও তাই।'

আমি নাছোড়বান্দা। আবারও জিজ্ঞাসা করলাম—জেলে এটোকাঁটার বাছবিচার নেই বলেই কি ঢুবেনী থাকতে পারল না সেখানে?'

এত অপ্রতিভ ঢুবেজীকে এর আগে কখনও হতে দেখিনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাচুমাচু মুখে উত্তর দেয়—'আপনার কাছে বলেই বলছি আসল কথাটা। জেলে গেলে পাপ-মোচন হয় রামজীর চোখে। সেই জন্যই আমাদের জেলে যাবার এত আকাঙ্ক্ষা। ঢুবেনী বলে যে, জেলে গিয়ে পাপ খণ্ডন করতে হত আমাদের দুজনকেই; কিন্তু তোমার কপালে যে রামজী তা লেখেননি। আমাদের দুজনের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপ-মোচনের চেষ্টায় কী হবে? তাই ঢুবেনী মাপ চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

ঢুবেজীর চোখ ছলছল করছে! হতাশার ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।—রামচন্দ্রজী যে কিছুতেই তাদের দোষ ক্ষমা করবেন না।—

তাদের মনের এক অজ্ঞাত দুয়ার খুলে গেল আমার কাছে। পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই অথচ রামচন্দ্রজীকে খুশী করে পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল। —আবার পাপমোচনের অনুষ্ঠানটি হওয়া চাই দুজনের এক সঙ্গে; একার চেষ্টা নিষ্ফল হবে! অদ্ভুত! আমাদের জটিল মন দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না তাদের সরল মনের যুক্তির ধারা। তবে তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

ঢুবেজীর মনমরা ভাব দিন দিনই বেড়ে চলে এর পর থেকে। বয়সের জন্য শরীর ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছিল আগে থেকেই। এখন যেন আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হতে লাগল। রোজগারের কাজে কোনোদিনই বিশেষ মন ছিল না। তার পেটচালানোর জন্য যেটুকুনি ছাড়া। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গ্রামের চাষাদের কাছ থেকে ভ্যারেণ্ডার বিচি, ছোলা, তামাক, সরষে কিনে এনে হাটের গোলাদারের কাছে বিক্রি করা, এই ছিল তার এতকাল পেশা। এখন সে বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দেয়। গোলাদারকে বলে দিল যে, এই বয়সে ঘোড়ায় চড়ে বেরুনো আমার সামর্থ্যে কুলোয় না। গোলাদার জিজ্ঞাসা করে—'তবে খাবে কী?'

ঢুবেজী উত্তর দেয় না। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশকিল হল ঢুবেনীরই। দুটি পেটের অন্ন যোগানো সোজা নয়। সে দূর গ্রাম থেকে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আসে, আমাদের কাছে দু-চারটে টাকার জন্য। আমরা সাধ্যমতো দিই। যখন নিজেদের সাধ্যে কুলোয় না, তখন

চকাচকীর জন্য অন্য লোকের কাছেও হাত পাতি। আমাদের জন্য তারা অনেক করেছে এক সময়ে, তাদের অসময়ে একটুও করব না ?'—

কিন্তু এ মনের ভাব বেশিদিন রাখা গেল না—তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। পরের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে কতদিন আর ভাল লাগে। কিছুদিন পর এমন হল যে, ভুবেনীকে দূর থেকে দেখলেই আমরা পাশ কাটাবার চেষ্টা করি। কানা মুসাফিরলাল একদিন বলেই ফেলল তাকে—'এখানে কি টাকার গাছ আছে ? আমরা নিজেরাই বলে চেয়েচিন্তে কোনোরকমে কাজ চালাই—তোমাদের দেশ কোন্ জেলায় ? কখন বলো বালিয়া, কখন বলো সারন, কখনও বলো ভোজপুর ! কিছু বুঝেও তো পাই না। নিজেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য ? তিনকুলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে ?'

ভুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফিরলালের কথা। আমাকে বলে—'আপনাদের ভুবেজী কী মানুষ ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। আমার কথারও জবাব দেয় না আজ ক'দিন থেকে। কী সব বিড়বিড় করে বকে। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর উঠে বসে থাকে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। বলে বর্ষা আসছে। চাল মেরামত করছি।'—

ভুবের চেয়ে ভুবেনীর কথাই আমার বেশি মনে হয়, তার বিষাদে ভরা মুখখানি দেখে। তাকানো আর যায় না সেদিকে। বাহাত্তুরে-ধরা বুড়োর জন্য দুটো টাকা দিয়ে তখনকার মতো নিষ্কৃতি পাই।

তারপর মাসখানেক আর দেখা নেই ভুবেনীর। টাকা নিতে আসে না দেখে অস্বস্তিই লাগে। প্রত্যাশিত বিপদ না ঘটতে দেখলে হয় না একরকম ? মুসাফিরলাল সন্দেহ করল যে, হাটের বুড়ো জমিদারবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছে ওকে—পুরনো দিনের কথা মনে করে। ভাল চোখটি কৌতুকে ভরা।—তোমরা শুধু দেশ দেশ করেই মরলে—আশপাশে দুনিয়ার পুরনো ইতিহাসের কতটুকু খবর রাখ।—

একদিন ভুবেনী এল, চোখে জল নিয়ে।

—ভুবেজীর খুব অসুখ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে, ভুবেনী বড়ো রোগা হয়ে গিয়েছে।…তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর উঠে এসে এই কবজিটি আঙুলের বেড় দিয়ে মেপে বলল—তুই দেড় আঙুল রোগা হয়ে গিয়েছিস। দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি পয়সা রোজগার করতে পারি কি না।…ঘোড়ার পিঠে বোরা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কত মানা করলাম। মাথা কুটলাম পায়ে। শুনল না। সে বুঝ কি এখন আর

আছে ?···বেশি দূর যেতে হয়নি। পারবে কেন! ঘোড়াটাকে সন্ধ্যার সময় খালিপিঠে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ফিরে আসতে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছে। গোলাদারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি। সে লোক পাঠাল চারিদিকে! কিছুক্ষণ পরেই পুরানদাহার লোকেরা গোরুর গাড়িতে করে দুবেজীকে পৌছে দিয়ে গেল আমার কাছে। তখন বেহুঁশ একেবারে! ঘোড়া থেকে পড়ে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা তখনই আপনাদের এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু গোলাদার বিসারিয়ার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নড়াচড়া করলে রুগী বাঁচবে না।··· তারপর থেকে তো চলছেই। চোখ খুলল তিন দিন পরে। জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান! ঐ একরকমের জবুথবু অবস্থা। না পারে লোক চিনতে, না পারে কিছু বলতে। শুধু তাকায়। আমার দিকে তাকায় কিন্তু আমাকেও চিনতে পারে না। মুখে দুধ দিলে বেশ ঢুকঢুক করে খায়।···ডাক্তার বলেছে খাওয়াতে বেশি করে। ঘোড়াটাকে বিক্রি করে তো এতদিন ওষুধপথ্য চলল।·· আপনাদের কাছে আসবার ফুরসতই পাই না রুগী ফেলে।—আজ মুদীর ছেলেটাকে বাবা-বাছা বলে বসিয়ে এসেছি। কে জানে থাকবে কিনা এতক্ষণ।—সেইজন্যই বাস্‌-এ এলাম এক টাকা খরচ করে।'

দুবেনীর দুঃখের কাহিনী আর শেষ হয় না। বুঝলাম এখন দরকার টাকার। বেশি টাকার। মেয়েমানুষের চোখে জল দেখলেই আমি কী রকম অভিভূত গোছের যেন হয়ে যাই। দুঃস্থ রাজনীতিক কর্মীদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে একটি 'ফাণ্ড' ছিল। তার থেকে দু'শ টাকা আমি দুবেনীকে দিলাম। তাকে বাস-এ চড়িয়ে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন মুসাফিরলাল সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।—পাবলিকের টাকা এবকম নাহক খরচ করা, আর যে-কেউ বরদাস্ত করুক, সে করবে না। দুবে জেলে যায়নি, তার স্ত্রী সাপ চেপে বেরিয়েছে জেল থেকে—ওরা আবার রাজনীতিক কর্মী হল কবে থেকে?—

মুসাফিরলাল আমায় শাসিয়ে দিল যে, আসছে মিটিঙে সে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

দিন দুই-তিন পরে দুবেজীকে দেখতে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ি মানে তো একখানি ঘর—ঘরের দেওয়াল, চাল সব কেরোসিন তেলের টিন কেটে, দুবে-দুবেনীর নিজ হাতে তৈরি করা। দোকান বলো, শোবার ঘর বলো, অতিথিশালা, ঠাকুরঘর বলো, সব এরই মধ্যে। সেই ঘরখানিকে ঘিরে কুতূহলী দর্শকের ভিড় জমেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘরের যে

কোনায় রঙিন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গোরু দাঁড়িয়ে। সুন্দর নধর গাইটি। ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় ঢুবেজী শুয়ে। চোখ বোঁজা। ঢুবেনী খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঢুবের একখান হাত ছুঁয়ে রয়েছে; ডান হাত গোরুটির গায়ে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে ঢুবেনী। ঢুবেজীকে ছুঁয়ে থেকে রামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দুজনে মিলে।

পুরুত চলে গেলে ঢুবেনীর কথা বলবার সময় হল।

—'ঢুবেজীর আজ দুদিন থেকে কোনো সাড়া নেই। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গোদান করবার। তাই আপনার দেওয়া দু'শ টাকা দিয়ে গোরু কিনেছিলাম! জানি না এতেও রামজী আমাদের মতো পাপীদের উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন কিনা। ওই মুখে আগেও যেমন হাসি দেখেছি, এখনও তেমনি। মুচকে হাসছেন। ও হাসি দেখলেই আমার ভয়-ভয় করে—বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। আমাদের দুজনের শাপমোচনের দরখাস্ত উনি নামঞ্জুর করেছেন বলেই বোধ হয় এই দুষ্টুমির হাসি মুখে! বলছেন—পাপীর মুক্তি কি অত সোজা!'—

—ঢুবেনীরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপমোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। টাকা দিলাম ওষুধ-পথ্যর জন্য, খরচ করে দিল গোদানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ওষুধ-পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল!—এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়!—

ঢুবেজীকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে আসতে মন সরল না। থেকে গেলাম সেখানে সেদিন। বুঝলাম যে, ঢুবেজীর আর দেরি নেই।

সে রাত্রে আমি ঢুবেজীর মাথার কাছে পাখা হাতে বসে ঢুলছি। আমি থাকায় ঢুবেনী একটু মনে বল পেয়েছে। সে হাত জোড় করে বসে আছে রামজীর রথের সম্মুখে। ধ্যান করছে চোখ বুজে। পাপীদের দরখাস্ত-নামঞ্জুর-করা হাসিটি পাছে চোখে পড়বে ভেবে, চোখ খুলতে সাহস পায় না। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হল, কেরোসিন টিন দিয়ে তৈরী ছাপ্পরের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দতে। রামজীকে প্রণাম করে ঢুবেনী উঠে এল, খাটিয়ার উপর জল পড়ছে কিনা দেখতে।—বৃষ্টি পড়বার সময় খাটিয়া মধ্যে মধ্যে সরাতে হয়। এখন বাবুজী আছে। দুজন লোক না হলে খাটিয়া সরানো যায় না। তখন মাটির ভাঁড় রাখতে হয় খাটিয়ার উপর। ভাগ্যিস ও পাগল কদিন থেকে বেহুঁশ হয়ে আছে, নইলে এই রাত দুপুরেই হয়তো বাতিক উঠত, হাতুড়ি পেরেক নিয়ে চালের উপর উঠবার!—

খাটিয়া সরানো হল। রুগীর মৃদু আলোতেও বোঝা গেল ঢুবেনী কাঁদছে।

'বাবুজী, বিপদের সময় তুমি যা করেছ, সে ঋণ আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমার পায়ের জুতো তৈয়ের করে দিলেও শোধ হবার নয়।'—

আচমকা এই অলংকারবহুল কৃতজ্ঞতা নিবেদনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ তো ঢুবেনীর স্বাভাবিক ভাষা নয়। অথচ কান্নার ফাঁক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা কথা! এতক্ষণ ধরে জপে বসেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি। ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে তার! 'আমাদের গায়ের চামড়া'!—'আমাদের পাপ'! 'আমার' না বলে 'আমাদের' বলা তাদের চিরকালের অভ্যাস। এখনকার এই বিহ্বলতার মধ্যেও সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি!—খাটিয়ার ওদিক থেকে আমারই দিকে আসছে ঢুবেনী! শঙ্কা, দ্বিধা চোখের জলেও ঢাকা পড়েনি। আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।—দ্বিধা কাটিয়ে, চোখের জল ছাপিয়ে, আকুল মিনতি ফুটে উঠল সে চাউনিতে!—বলতে চায় কিছু—অনুরোধ জানাতে চায়।

বলো, বলো, ভয় কী।

আশ্বাসের ইঙ্গিত জানাই। তবু বলতে কি পারে! সব কথা কি বলা যায় সকলকে। অচৈতন্য ঢুবের দিকে আবার একবার দেখে নিল ঢুবেনী—কে জানে যদি তার কথা বুঝতে পারে!—পাখাসুদ্ধ আমার হাতখানি সে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে।

'এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু বলছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখি না বলবার মতো। একজন কাউকে যে বলতেই হবে। চল্লিশ বছর ধরে চেপে চেপে কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে! তবু রামজী ক্ষমা করেননি আমাদের।—ডাক্তারবাবু পরিষ্কার না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন যে, রুগী আর দু-চার দিনের বেশি বাঁচবে না। আমিও সে কথা বুঝতে পেরেছি।—সেইজন্য একটা কথা বলার দরকার হয়েছে তোমার কাছে। শুনে আমাদের কী মনে করবে তাও জানি। তবু বলছি।—আমার কথা রাখতে হবে একটা। রাখবে? আগে কথা দাও, তবে বলব।'—

কথা দিলাম।

'শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়া মুখ! আমি ঢুবেজীর নিকট-আত্মীয়া। ঢুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সেসব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও! কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না

পেয়ে ঢ়ুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? ছেলের হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার মন যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবি না; আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ খণ্ডাবার। তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে। সাহাবাদ জেলা,—সাসারাম থানা—হরকতমাহী গ্রামের পচ্ছিমটোলা। চিঠি দিলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গিয়েছে; তাহলে এক যদি আসে!···না কোরো না বাবুজী। আমাকে কথা দিয়েছ!

সাংসারিক জীবনের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। তবু জড়িয়ে পড়লাম এদের নিভৃত পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। দিন তিনেক পর সাহাবাদ জেলার এক গ্রামে গিয়ে ঢ়ুবেজীর ছেলের সঙ্গে দেখা করলাম। নাতিপুতি-ওয়ালা ঘোর সংসারী লোক। বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনেও আমলই দিতে চায় না প্রথমটায়। রুক্ষ মেজাজ। তার মা বেঁচে আছেন কি না, জিজ্ঞেস করায় রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, তাদের বাড়ির জেনানাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কৌতূহল সে পছন্দ করে না। বাবার কথা তার মনে নেই, তাই তাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না। বুঝলাম যে, এতদিনকার ভুলে-যাওয়া পারিবারিক কলঙ্কটাকে নিয়ে সে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে না। তাদের সেই আত্মীয়টি মারা গিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদটি পেয়েও তার মন ভিজল না। তখন আমি অন্য রাস্তা নিলাম। ঢ়ুবেজী সেখানে একজন মস্ত লীডার, এ খবর শুনে একটু যেন তার উদাসীনতা কাটল। তখন ছাড়লাম ব্রহ্মাস্ত্র।—'ঢ়ুবেজী সেখানে বাড়িঘরদোর করেছে। বাজারের উপর দোকান। তুমি না গেলে সেসব সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। সেগুলো বিক্রি করে আসবার জন্যও তো তোমার যাওয়া দরকার।'

'বাড়ি কি খাপরার?'

'না। টিনের।'

মিথ্যা বলিনি। বাড়ি যে কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরি, শুধু সেই কথাটি খুলে বললাম না। এই ওষুধেই কাজ হল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় যখন ধামদাহা-হাটে পৌঁছলাম, তখন ঢ়ুবেজীর শবদেহ বার হচ্ছে। কানা মুসাফিরলালের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আশপাশের গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের সে ডাকিয়ে এনেছে। বিস্তর লোক

জমেছে। নিশান, শোভাযাত্রা, অ্যাসিটিলিন আলো,—যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশি।

আমাদের দেখেই মুসাফিরালাল এগিয়ে এল। তাকে আলাদা দূরে নিয়ে গিয়ে বলে দিলাম যে, এ হচ্ছে ঢুবেজীর ছেলে,—তাকে যেন কিছু গোলমেলে কথা না জিজ্ঞাসা করা হয়।

'ছেলে ?'

মুসাফিরলাল অবাক হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় আমাকে শোনাল ঢুবেজীর মৃত্যুর চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর।

'ঢুবেনী প্যালিয়েছে! আমি এখানে এসেছিলাম পরশু রাতে, তোমার খোঁজে। তখনও ঢুবেনী ছিল। আমাকে রুগীর কাছে বসিয়ে সে একটা ছুতো করে বাইরে যায়। আর ফেরেনি।—বুঝলে ব্যাপারটা?—বিদেশে এক কানাকড়িও না নিয়ে যে রোজগারের ধান্দায় আসে, সে কি কখনও বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রথমেই?—এসে, মাথা গুঁজবার মতো একটা জায়গা করে নিয়ে তবে না লোকে বউ আনে? আমি চিরকাল বলেছি—'

তার কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার উৎসাহ তখন আমার নেই। বুঝলাম যে, মুসাফিরলাল এখানে আসায় ঢুবেনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল, সে না এলে রুগীকে একেবারে একা ফেলে বোধ হয় ঢুবেনী পালাতে পারত না। মুসাফিরলাল এখনও বোধ হয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে।—কিন্তু আমি তো জানি!—ঢুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে ঢুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে!—

একটি ছোট্ট নদীর ধারে শ্মশানঘাট। ভাদ্র মাস। শ্মশানঘাটের কাছটুকু ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে ভরা। যেখানে জল নেই, সেখানে কাশের বন। চিতা জ্বলছে। আলো পড়ে ওপারের অন্ধকারের বুকে কাশফুলের চুনকাম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঢুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত; বোধ হয় বাড় দেখে হতাশ হয়েছে।—সকলেই চুপচাপ।—হঠাৎ ওপারের কাশবন নড়ে উঠল—চুনকামের মধ্যে যেন একটু ফাঁক—স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই—কাশের সমুদ্রের মধ্যে খসখসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল।—

বুঝলাম।—হয়তো আমার সন্দেহ মাত্র! ভুলও হতে পারে! কে জানে।

সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে। ঢুবের ছেলেও।

মুসাফিরলাল বলে—'শিয়াল-টিয়াল হবে বোধ হয়।' তাকিয়ে দেখি তার

ভাল চোখটির উপর চিতার আলো পড়েছে! দরদে ভরা! তার পরিচিত কুটিল দৃষ্টি গেল কোথায়?

সেও বুঝেছে, আমি যা বুঝেছি। শিয়ালের কথা তুলেছে, যাতে বাকি সকলে আর ও নিয়ে মাথা না ঘামায়—ওদিকে আর না তাকায়।

এই প্রথম কানা মুসাফিরলালকে খুব ভাল লাগল; তার ভাল চোখের চাউনিটিকেও।

## বৈয়াকরণ

—টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবী-সাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরী নেকড়া বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবীসাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই, কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো জল-তুলবার দড়িটা পেড়ে নিলেন পণ্ডিতজী। আর এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজা আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুকুটাও দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাসীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেননি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?—

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই ; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজী আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবীসাহেবের সঙ্গে বেশি করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

—আর যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তাহলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন ?—

'মৌলবীসাহেব, কোনো-একটা কাজে এখান থেকে দাই দাই বলে চিৎকার করতে লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয় তো হরখুরমা বলে ডাকলেই পারেন।'

—মৌলবীসাহেব ঠিক বুঝতে পারেননি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ওঁর মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য !—দ্বে বিধে—দ্বিধা—তদ্ধিতান্ত শব্দ।

'মেয়েস্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন-কেমন না ?'

আফিংখোর মৌলবীসাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন পণ্ডিতজীর কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

'আপনাদের সান্‌সকির্তে আছে না—হাংস মধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আব কী আমরা এখানে।'

না। ঠিক এই ভাবটার কথা পণ্ডিতজী বলতে চাননি। তবু মৌলবী-সাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজাসুজি করতে পারলেন না। স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

'আপনাকে আর বক বলি কী করে। বকের পালকের মতো আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মতো কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন—আপনি হলেন ভ্রমর।'

সম্প্রতি মৌলবীসাহেব আবার আর-একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'হাতি চলে বাজারে, কুকুব ডাকে হাজারে।'

'কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবীসাহেব—সেই হাতি যখন পাঁকে পড়ে।'

মৌলবীসাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

'আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না? বগুলা-ভকত্ত (বকধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবীসাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বকধার্মিক শব্দটা তীরের মতো তাঁর মনের গভীরে গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই সঙ্গে যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে। আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়গায় ঘষটানি লেগেছে। মৌলবীসাহেব নিজের খেয়ালখুশিতেই অষ্টপ্রহর মশগুল। পণ্ডিতজীর মুখ-চোখের চকিতের বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে পড়ল না। তাঁর টেবিলে-তোলা নড়ন্ত পা দুটোকে দেখে হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর মন। চাকরি জীবনে অনেক কিছুই গা-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়েস্কুলে তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয়; সর্বত্র বাঞ্ছিতও নয়। স্কুলঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্কুলের ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছোট্টটো ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে একখানা টেবিল, দুপাশে দুখানা চেয়ার। টেবিলখানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্থান পাকিস্তানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন; একদিকে থাকে ঘটি, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের ঘটিটাকে নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল তিনি আর মৌলবীসাহেব একসঙ্গে কাজ করেছেন জেলা স্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলানো এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগেনি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টারমশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবীসাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোশমেজাজী লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জানতে তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবন-যাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই! তিনি যা নন তা দেখাতে তো কোনোদিন চেষ্টা করেননি! তবে কেন মৌলবীসাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিতমশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন 'তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়ো! কাব্য

পড়ে কী হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা। ইন্দ্রিয়াসক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত থাকে।' সেইজন্য গুরুর আদেশে, লঘু চাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজী মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবীসাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা —কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু'মাস থেকে তাঁর মনে কিরকির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম; তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে 'ওরা'। বাক্যটি হচ্ছে 'ওরা কি ওই চায়!' এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।···

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখোচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পৌঁছে তবে মাটি থেকে চোখ তুললেন পণ্ডিতজী। অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্বিঘ্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। টেবিলের উপর পা-জোড়া নড়ছে। মৌলবীসাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেননা সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কী করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা থেকে,—এ কথা কেউ বুঝবে না! মৌলবীসাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটল কিনা, সেসব বিষয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোনো কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ; ভেবে নিতে পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি। তাই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—'ও মৌলবীসাহেব, ক্লাস নেই নাকি?'

মৌলবীসাহেব চোখ বুঁজেই উত্তর দিলেন—'আমরে আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনোদিন ক্লাস থাকে নাকি?'

'বেশ আছেন মৌলবীসাহেব।'

'যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা দোলান; আমি ক্লাস ঠেঙিয়ে আসি।'

নিজের অতর্কিতে তিনি আজ মৌলবীসাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বার বার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

'আরে ভাই, যে কটা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা-দোলানোর মেহনতই যথেষ্ট।'

পাটকরা চাদরখান পণ্ডিতজী কাঁধের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফ-জোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই; চিরকাল তিনি নিজের জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধনকর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মতো, খেয়ে কুলকুচা করবার মতো নির্দোষ অভ্যাস।...

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তাঁর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবীটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোনো সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে, সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করে বলে।...মহান্-শব্দঃ মহাশ্শব্দঃ...। ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটাও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশি।...নৃত্যন্-চকোরঃ—নৃত্যংশ্চকোরঃ...। কোনো ক্লাসের শান্ত-অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লীডারদের সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে।

দেবভাষার অনুস্বারে বিসর্গে সংবলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে! ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেননি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজী-না-জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানোর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজী শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উলটো; ছাত্ররা আরও বেশি করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজীর জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।···

এই ক্লাসের লীডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে; কিন্তু প্রগল্‌ভতা যেন আর-একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।···

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হনহন করে—যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না! ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কী হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মতো পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে স্বর করে বললেন—'বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্।' অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কী হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হনহন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনরূপ সংকোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

'এসব নামতার মতো কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!'

সারা ক্লাস হেসে ফেটে পড়ল।

···কেন? হঠাৎ এত হাসির কী হল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ

করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই পণ্ডিতজী চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি!

'একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ানো রয়েছে।'

...ছি, ছি, ছি! (পঙ্কন্-চকিতঃ—পঙ্ক্তংশ্চকিতঃ) ...লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে স্বর করে চেঁচালেন—'বা-অ-আই ইন্‌টেলেকট্।'

উচ্চ হাসির রোল তাঁর গলার স্বরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—'আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?'

অন্য দিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী বললেন—'আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?'

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালী। অবাঙালীদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে তারা অতদূর পৌঁছতে পারে না! বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব বাঙালী মেয়েদের। ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মতো মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কী করে শেখাবে বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।...(মহতী ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)...। কুক্কুটাগুলোভী বাঙালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে যেত; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠায়, আচার-বিচারে পুরুষদের বিচ্যুতিটুকু মেয়েরাই পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও ঠিক আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনদিন মিটবার নয়।...

কোন্ কথার কী প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সেসব ছাত্রীদের মুখস্থ।

'কেমনভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী?'

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

'বলো—বিয়াকরণ, বিয়াকরণ।'

'বিয়া-করণ, বিয়া করণ'—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙে আলাদা করে বলছে সে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মতো কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

'আবার বলো! ত্রিশবার বলো!'

…এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।…মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেননি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। শৌখিন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এইসব ছেলে-ছোকরাদের যে, বাপদাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হলও কি তাই! স্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের শাড়িতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুনপোড়ার মতো পুড়ে থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য! সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটুও পোড়েনি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন।…সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজী, সীতাকুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ: পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোনো ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সে কথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব যোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরি করিয়েছে, সে-ই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটোয় অমনি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কী হত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী মনে হয়, খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোট-শালার মুখের দিকে তাকানো আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃতপত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙে পড়তে আর কাউকে দেখেননি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড়

অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার ?···

'হয়ে গেল ত্রিশ বার ? গুড্। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধ শরীরঃ।'

'অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।'

'গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।'

'অর্ধং যথা তথা দগ্ধম্···সুপসুপেতি সমাস।'

'গুড্। কিন্তু চংড়ী মছলি খাওয়া বাঙালীরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।'

'ও তো পণ্ডিতজী সামাসা হয়ে যাচ্ছে।'

'ও ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার।'

···কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যেরকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুধু উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় ধ্বনি। সংগীতের ঝংকারের মতো এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

···মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরঝঙ্কারাঃ।···

'হল দশবার ? সিট ডাউন! এবার গৌরী তুমি বলো। Expound সমাস—মৃতপত্নীকঃ। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভয় কিসের ?—আশ্‌ন-কতে। আশঙ্কতে ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশি কেন তোমাদের মধ্যে ? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।'

স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনান, তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনও শালাজ কথা বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। যে কথাটি তাঁকে গত দু' মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনই বলা।···তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালাজের গায়ে। পুরুষমানুষদের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু কোনো ভরসা দেননি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ কত কী বলে চলেছেন···'খুব কষ্ট হচ্ছে ? ওষুধ দিতে লাগছে ? ভাবনা কী, সেরে যাবে দিন-কয়েকের মধ্যে। না আবার কিসের ? সারবে না। কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোসকাটুকু সারবে না।'

'না না, আমার আর বেঁচে দরকার নেই'· 'ছি, ও কথা বলতে নেই।'

'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'…'কী যে বলো। কেন, হয়েছে কী তোমার ?' …এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে পারেননি। একটু পরে আবার কানে এল…'না, সেসব ভেবো না তুমি। সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায় ? দেখ দিকিনি, এই ব্যথাবিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কী সুন্দর দেখাচ্ছে!'…'ওরা কি ওই চায়'…যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয়-নিঙড়ানো কথা কয়টি। বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দুই মাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতোই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কী মনে করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন…

'পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাসের উচ্চারণ অভ্যাস করব নাকি ?'

'ও, তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ্‌-ছবিঃ কী হয় ? তচ্ছবিঃ। গুড। সখী-উত্তম—সখ্যুত্তম্। গুড। বাণী ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণৌচিত্যম্। গুড্। সিট ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ হল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ-এর একই উচ্চারণ কর। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী, তোমার নামের উচ্চারণ করো। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পারে না, সে নাম রেখে লাভ কী ? দশবার বলো।'

এই চেষ্টায়, হাসির ধুম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

…মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন। ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না ; কিন্তু কী বুদ্ধিমতী !…ও গন্ধতেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন ?… সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার 'পাস'টা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস'-এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যাতে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন-অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায় ? এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন ? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনীর বয়সী ; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন

না? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন? ··· ক্লাসে এর পরে কী প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেডমিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়।···স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকা কালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙালী ছেলেদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত? মনে পড়েছে আর-একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাসে পড়বার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন··বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী ও বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন কিন্তু এ প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী। এসব শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কী! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবাদের মতো তাঁকেও যে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়; কে আবার কী কোথা থেকে বলে দেবে।· আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ। তবে তাঁর পড়ানোর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের বেলা একরকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি?···দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। আদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ।···কারণটা ঠিক মনের মতো হল না।···

'লিলি! কাম্ টু দি বোর্ড।'

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার মতো প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই-হারানো নিবারণের ওষুধ।

'লেখো, ওরা শব্দের সংস্কৃত কী। এর মধ্যে আবার ভাবছ কী?'

'আমি ভাবছিলাম যে আপনি সমাস না-হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।'

'বাঃ, বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হচ্ছ বিদুষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদুষী। বুঝেছ? সম্ভবত বোঝনি। শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড। গো টু ইয়োর সিট।'

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন তিনি টেনে নিলেন। অন্য কোনো সময়ে হলে তিনি অপেক্ষা করতেন তার খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—'বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর: মৌলবীসাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধবয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্থে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড। সিট ডাউন।'

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজীর বাংলা পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দীতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরা তো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত—তুরন্ত ফিরে আসব পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসত, আর তিনি বেশ উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর সম্বন্ধে কৌতূহলের তাঁর সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; হ্রস্ব ইকারটা রেফের মতো করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভয়ে পণ্ডিতজী কোনোদিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সব সময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজী অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুঁজে আড়ষ্ট হয়ে কেমন করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। 'তে বহুবচন, তে মানে ওরা। শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী they শব্দটির কী রকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?' তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়িসুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।...সেই সতীসাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়'। 'ওরা' বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেননি তো? তা কী করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানাশোনা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখেছিলেন। সকলে সে-রকম হতে যাবে কেন!

স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্কা ননদের সম্মুখে কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার? কী ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ...আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবীসাহেবকে একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাকবোর্ডের উপরকার লেখাটা দেখে তো তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে? ...কী দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?...

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। ডাকপিয়ন হেডমিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যার যার চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময়, খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজী, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শুচিবাই কেন?—কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরে-বেঁধে রাজী করানো গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কী জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।—দুই মাসও কাটেনি! সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হত!—

'লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলো তো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জান না? নেক্সট! নেক্সট! এনি বডি ইন্ দি ক্লাস? কেউ জান না?—(মালবিকা থাকলে পারত)—। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—'গৌরবে বহুবচন'। লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল

লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না ; কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে !—

'ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন করব তোমাকে। মধু-উৎসবঃ কী হয় ? বানান করে বলো। গুড। হ্যাঁ, দীর্ঘঊকার, মনে করে রেখো। সমাস করো—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড। সিট ডাউন। নেক্সট। গায়ত্রী, তুমি ভ্রম সংশোধন করো এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম ধাবন্তি। না। ভেবে বলো। হল না। এনি বডি ইন দি ক্লাস ; কেউ পার না ?—( মালবিকা এখনও ফেরেনি ) !—পিবতুম ভুল। পাতুম হবে। মনে করে রেখো।'

—আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। এ কী অন্যায় কথা ! গিয়েছে, সে কি এখন ! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে ! প্রতিদিন সে এই করে ! লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়েছে ! এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ঐ পাসখানা নেবার দরকার হতে পারে !—

মেয়েরা সকলেই জানে যে পণ্ডিতজীর সবচেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড' শব্দটি।

মালবিকা এসে ক্লাসে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দু-চার মিনিট মাত্র দেরি আছে। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।

—শোভনঃ গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন ?—

'অনেক দেরি হল তোমার।'

'আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ আর সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।'

মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।'

'উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী ?'

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, 'না না। তুমি বলো তো বিদ্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কী হয় ?'

এত সহজ প্রশ্ন ? মালবিকার মতো ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে ? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

'বিশ্বোষ্ঠী, বিশ্বোষ্ঠা দুই-ই হয়।'

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। গুড, সিট্ ডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে— ব্যাড বলতে হবে! মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড বলতে ভুলে গিয়েছেন! শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিশ্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলীর মধ্যে শুধু একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অলঘু বিষয়কে লঘু করবার চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে-বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না।

ঝাড়নখানাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিনকার পোষা আত্মগৌরবটুকুও মুছে গেল এরই সঙ্গে।

'এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।'

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার।

খড়ির গুঁড়ো ফুঁ দিয়েছে উড়িয়ে নেবার ছলে, নিজের হাতের আঙুল-গুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অঙ্কের উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি নেই এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতার সব-কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, মৌলবীসাহেব, ছোটশালা,—সবাই!—গত্তৌ ঔৎসুক্যম— শোভন আচরণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে বিশ্রামঘরের দিকে চলেছেন।—আকৃষ্—তঃ আকৃষ্টঃ—। সহস্রজোড়া কুতূহলী চোখ নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে,—চিনে গিয়েছে সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জ্বালায় টেবিলের উপর একখানা বই পর্যন্ত রাখবার জো নেই!—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বকধার্মিকবলা লোকটা যদি চোখদুটোও খুলে

রাখত পা দোলানোর সময়, তাহলে আর তাঁর কানে পট্টি জড়ানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হত না আজ।

'ও মৌলবীসাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা বলছি—এতদিন বলি-বলি করেও বলিনি—কিছু মনে করবেন না। আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে হেডমিস্ট্রেস আর স্কুল কমিটির মেম্বররা বিরক্ত হবেন।'

মৌলবীসাহেব চোখ বোজা অবস্থাতেই ছড়া আওড়ালেন, 'জো গুল কি জোহিয়া হ্যায়, উসে রেয়া খার কা খট্‌কা? যে গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও কাঁটার ভয় করলে চলে?'

—বলা বৃথা লোকটাকে। অলঘুম্ লঘুম্ করোতি—লঘু করোতি ঘ-এ দীর্ঘউ হবে, বুঝলে মালবিকা।—আচ্ছা, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে কেমন হয়? পোস্ট অফিসে কত চিঠিই তো হারিয়ে যায়। তাহলে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোটশালার বিয়েতে।—কিন্তু, মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে। তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়।—কোনো উপায় নেই।—তবু তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করবেন। —কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই প্রথম মিথ্যাচার?

## ডাকাতের মা

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে।—ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরাতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টক্‌টক্ করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম—'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।' —আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে; পুলিশকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল।

দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে জিব কেটে ফেলেছিল —পাছে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখ! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দু বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কি কখনও হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কি একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে; সৌখীরও এর আগে দুবার কয়েদ হয়েছে; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে—কখনও বা আগাম—তিন-চার মাসের একসঙ্গে। কিন্তু এবার দেখ তো কাণ্ড। একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কিনা তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভাল। সৌখীর এবারকার বউটা রোগা-রোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন একবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার-পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল! যার বাপের নামে চৌকিদার সাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেননি কোনোদিন, তারই কিনা দুবেলা ভাত জোটে না! হায় রে কপাল! এ বউমা যে খাটতে পারে না ঐ রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ, কোনোরকমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খই-মুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কি আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তাছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়। নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে বউ-নাতিকে নিয়ে ঘর করি। বেয়াইয়ের দুটো মোষ আছে। তবু বউনাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী ছাড়া পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপার গয়না দিয়ে মুড়ে দেব। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখারী ন... আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠাণ্ডা করতে...বে। আমি ...ল, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কি ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিঁচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ। তালপাতার সেপাই! থুতনির

নিচে দুগাছা দাড়ি! কালি-ঝুলিই মাখ, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগা-পটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনো কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে।...একবার সৌথী কোথা হতে রাত দুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কি কম দুঃখের কথা!—

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

—বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায়—বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেক কালের পুরনো। এর আগের বার সৌথী জেল থেকে এনেছিল। সে কি আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স ক' বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টকটক করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়। হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টকটক করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

—না। তাহলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা থনথনে—টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ি উঠে বসে। ঘর গরম করার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে।—এতদিনে কি তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌথীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

—তবু বলা যায় না।—কে না কে—

সোঁন্দীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল।—লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে।—আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো তার জানে না!—সোঁন্দীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি!—নিশ্চয়ই পুলিশের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তার পর অন্য কথা।—কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে।—

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুনবে কী।—বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

'কে?'

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে।

'ঘর যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার! ঢুকি কী করে?'

'কে, সোঁন্দী। ওমা তুই। আমি ভাবি কে না কে?'

বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে।—এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ।—এ আনন্দ আর রাখবার জায়গা নেই।—

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কী। হেড জমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।'

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সোঁন্দী যাতে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে।

বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক

ধরেছে এবার ; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগা-রোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপেরই মতো জেলে গেলে শরীর ভাল হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কী যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।—

'হ্যাঁ রে, জেলে তোর অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না ; জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?'

প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে. জিজ্ঞাসা করবেই ;—তবু—

'বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে।'

'হঠাৎ বাপের বাড়ি?'

—এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।—নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সৌখী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়ইনি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সৌখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।—

'কেন, মেয়েদের কি মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?'

'না না, তাই কি বলছি নাকি?' অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সৌখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত ন'টার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে—কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে। এ কথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভাল দেখায় না ; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে।—মা কত কী বলে চলেছে ; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

'নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।'

'না, রাঁধছে কে। খইমুড়ি আছে। খেয়ে নে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না।'

ব্যাবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা'র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

'ওখান আমাকে দে।'

আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আব আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সৌখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল ; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সৌখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকমে চলে গেল। যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তাহলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।—আলু-চচ্চড়ি খেতে কী ভালই বাসে সৌখীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব!

—কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল।—ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়ে-যাওয়ার উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরুল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙা ইটের পাহাড় নিচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না। বাড়ি নিষুতি!

অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোর-গোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকারসাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে। ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে

বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি। এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থুল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী,…এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—'বাজে বকবক্ কোরো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?'

আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুঁতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো-দেওয়া লোটা…বুঝলে কিনা—এই এত বড় সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রুপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।…দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। শস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।'

'পুরনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।'

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন।…খুরোর নিচে ঠিক সেই তারা আঁকা। আর সন্দেহ নেই।…

মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন।—বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!'

একেবারে হই-হই রই-রই কাণ্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দ আনা পয়সা গুনে, সৌখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে।

'চোদ্দ আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস! চোরাই মাল রাখবার ধারা জানিস?'

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সৌখীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা-পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে। তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসনগুলোকে রং-চং দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না···পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করেছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী-পুত্রের হকের পেশা। সে তো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি!···ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে···

লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, 'তুই এই লোটা আজ বাজারের বাসনের দোকানে চৌদ্দ আনায় বিক্রি করেছিস?'

কোনো জবাব বেরুল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা। চোদ্দ আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল! কেন মা তাকে বলল না!···এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার।—বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় পেল কই? রাত্তে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের

মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কতুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনো দিন। ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়।—'কতুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়।—মা কি জানে না যে—

'এই বুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।'

বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সৌখী।

'দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।'

কিন্তু দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌখীকে ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল। ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে।

'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।—'

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি।

কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিংবা এই বুড়িটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

## মুনাফা ঠাকরুণ

ফণী ইংরাজী বাংলা লিখত ভাল। বাসনা ছিল কাগজ চালাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু নিতে হয়েছিল কাজ শেঠজীর গদিতে, মাসিক সত্তর টাকা মাইনেতে। তবে কাজটা নিজের লাইনের—অর্থাৎ লেখাপড়ার কাজ—ইংরাজী আর বাংলায় চিঠিপত্র লেখার কাজ। কলেজে পড়বার সময় সে পলিটিক্স করত। এখানে এসে দেখে যে গদির পরিবেশ আর মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ঠিক তার

পলিটিক্সের জানা ছকে ফেলা যায় না।—চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নেই; ফরাশে বসে জলচৌকির উপর খাতা রেখে লিখতে হয়। সিঁদুর দিয়ে বড় বড় করে লেখা দেওয়ালের 'মুনাফা' শব্দটিকে ও কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরকে প্রধান কর্মচারী টিকমচাঁদ ধূপ-ধুনো দিয়ে প্রত্যহ পূজা করে; অন্য কর্মচারীরা ভক্তিভরে প্রণাম করে। গদির মধ্যে থুতু ফেলা বারণ নয়, কিন্তু চা খাওয়া বারণ। নামমাত্র মাইনেতে গদির এতগুলি কর্মচারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে; কিন্তু কেউ মাইনে বাড়াবার দাবি করে না। একই ধরনের কাজ করে কেউ কম মাইনে পায়, কেউ বেশি; তবু তা নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই। অন্দরমহলের আচার, বড়ি, পাঁপড় শেঠগৃহিণীর সঙ্গে আধাআধি বখরায় গদির কর্মচারীরা লুকিয়ে বিক্রি করে দেন। অদ্ভুত!—মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে যায় এদের ধরন-ধারণ দেখে!—

একদিন বলেই ফেলল। সকালে গদিতে ঢুকেই শোনে যে অন্য কর্মচারীরা কালকের হঠাৎ ফাটকা দরটা নেমে যাবার কথা আলোচনা করেছে। ফণীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—'এক মিনিটও সময় নষ্ট নেই বাবা! যেন এই প্রেমের গল্পটুকু না করতে পেরে রাত্রিতে ঘুম হয়নি ভাল করে! মাসকাবারে মাইনে পাই, ফাটকার দরে আমার আপনার দরকার কী মশাই? সে বুঝুক গিয়ে মালিকরা।'

এই মন্তব্যটা থেকেই বাদানুবাদ আরম্ভ। নির্দোষ হাসিঠাট্টা থেকে অকারণে গরম গরম কথা এসে গেল। গদির লোকেরা 'ফণী' উচ্চারণ করতে পারে না, বলে ফাণী। আজ ফণী তাদের জিভের ডগায় আরও খানিকটা বেশি করে ঘি আর লঙ্কা মালিশ করতে উপদেশ দিল—উচ্চারণ ঠিক করবার জন্য। তারা মিস্টার ফণীর প্যান্টালুন আর থার্মফ্লাস্ক নিয়ে ঠাট্টা করে; ফণী তাদের পালটা উপদেশ দেয় আরও একটু জবজবে করে মাথায় তেল মাখতে;—তা হলে যদি এক ওই মরুভূমি-ভরা মগজগুলো, টাকার ঝনঝনানি ছাড়া, আর অন্য কোনো আওয়াজে সাড়া দেয়!—

এই বিমুখ মুহূর্তে গদিতে এসে প্রবেশ করলেন শেঠজী।

প্রথমে দেয়ালের 'মুনাফা' কথাটাকে, তারপর কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরকে চোখ বুঁজে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এর পর তিনি তাকালেন ঘড়িটার দিকে।—'জয় গণেশ! এখনও তোমরা কাজ আরম্ভ করনি? পনর মিনিট কাজে ফাঁকি দিলে গদির লোকসান কত হয় হিসাব রাখো?'

সকলে নিরুত্তর।

'গদি হল মন্দিরের মতো জায়গা। এখানে এসব ঝগড়াঝাঁটি কেন?

দেখি টিকমচাঁদ, চিঠিপত্র কী সব এসেছে। সে-রকম জরুরী কিছু নেই তো? বাংলা ইংরাজী চিঠিগুলোই আগে দাও। কোথায়, ও মিস্টার ফাণী! পড় তো এগুলো। বছরে আটশ' চল্লিশ টাকা করে মাইনে দিই তোমাকে; তবু তোমার কাজে মন নেই!' শেঠজীর মুখে 'মিস্টার ফাণী' শুনে কর্মচারীদের চোখে চোখে হাসি খেলে যায়। দেখে ফণীর মাথা গরম হয়ে ওঠে।

'মাইনে দিচ্ছেন বলে কি যা ইচ্ছে তাই বলবেন। কর্মচারীকে তুমি না বলে আপনি বলা যায় না? এদিকে নিজের ছেলেকে তো বিরিজলালবাবু বলে ডাকা হয়। বছরে আটশ' চল্লিশ টাকা দেখাতে এসেছেন? অমন টাকা—!'

টিকমচাঁদ হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল।

'করলেন কী ফণীবাবু। নিমক খেলে তার দামও দিতে হয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে। আপনি থামুন তো! মাসে সত্তর টাকার নিমকের দাম, আমি তিল তিল করে দিচ্ছি দু বছর ধরে। দিন আট ঘণ্টা করে এই মুনাফাদেবীর মন্দিরে বসে কাটানোর মজুরিই সত্তর টাকার চাইতে বেশি। আপনার মাসিক ছিয়াশি টাকার নিমকের দাম, আপনি হুজুরের মাথার পাকাচুল তুলে, হুজুরের খয়নির থুতু চেটে, হুজুরের 'মুনাফা'তে ধূপ-ধুনো দিয়ে, যেমন করে ইচ্ছে শোধ করুন না কেন। অন্যের ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে আসেন?'

ছোট মুখে বড় কথা। কয়েকজন আমলা এগিয়ে এল বেয়াদব ফাণীটার জিভ ছিঁড়ে নেবার জন্য। অসীম আত্মপ্রত্যয় আর প্রশান্তির দ্যুতি শেঠজীর মুখচোখে।

'যাও। তোমরা সকলে নিজের নিজের কাজ করোগে যাও। কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে মিস্টার ফাণীর—তোমাদের কী এর মধ্যে? হ্যাঁ, শোন মিস্টার ফাণী, নিজের দর নিজে ফেললে সব সময় ভুল হয়। লোকের দর ফেলবার মালিকানী হচ্ছেন ওই মুনাফা ঠাকরুণ। সব করেন উনি! ঠাকুর দেবতার কাছে একচোখামি নেই। তবে আমি বুঝতে পারছি যে তোমার এখানে অসুবিধা। এই নাও তিন মাসের মাইনে। পেণ্টুলুন পরে চেয়ারে বসবার চাকরি তোমার যেন কোথাও জুটে যায়! জয় গণেশ! জয় গণেশ!'

মুহূর্তের জন্য ফণী হতভম্ব হয়ে যায়। সে এতটা ভাবেনি। তারপর তার মুখে খই ফুটতে আরম্ভ করে।

'সব জয়-গণেশ আমি বার করছি! তোমার গদির ওই গণেশকে আমি উলটে ছাড়ব। লালবাতি দেখেছ, লালবাতি? তোমার দেয়ালের ওই

মুনাফা ঠাকরুনকে আমি লোকসান ঠাকুর করিয়ে ছাড়ব। ভেবেছ কী! তোমার গদির নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা; সব আমি ফাঁস করব। হাটে হাঁড়ি ভাঙব আমি। ফণী চাটুজ্যেকে চেন না।'—

শেঠজী মনে মনে হাসলেন—গণেশ উলটোবার কথা বলে ভয় দেখায় ছোকরা—জানে না যে আসল থাকেন বাড়ির ভিতর—ইনি তো গদির গণেশ—কতবার উলটোন কতবার বসেন মুনাফা ঠাকরুনকে কসরত দেখানোর আনন্দে, তার কি ঠিক আছে!—

এর মাস কয়েক পরের কথা। অন্দরমহলের আসল গণেশঠাকুর আর দেওয়ালের মুনাফা ঠাকরুনকে প্রণাম সেরে, গদিতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন শেঠজী, হঠাৎ নিচে মোটর-হর্ণ-এর শব্দ শোনা গেল।

—বিরজুর গাড়ি না? এই তো খানিক আগে নিজের গদিতে যাবে বলে বেরুল। এখনই ফিরে এল?—

শেঠ-গিন্নী দোতলার জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখলেন। হাঁ৷ বিরজুর তো। কিছু ফেলে-টেলে গিয়েছিল নাকি? হাতে দেখছি একখান বই—রঙিন ছবিওয়ালা মলাট। নিশ্চয়ই বউমার হুকুম ছিল যে এখনই চাই—তাই দিতে এসেছেন বইখান। কী ছাঁদেরই যে বউ হয়েছে। ফরমাশের উপর ফরমাশ চলছে বিরজুর উপর অষ্টপ্রহর। দাই ঠিকই বলে—দিনরাত্রি ফুসলানি দেয় বউ বিরজুকে আলাদা হবার জন্য; ছেলেরও লক্ষণ ভাল না। দেখছি তো। মা-বাপকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ওই দেখ না—বউয়ের জন্য আনা বইখান মা-বাপকে একটু লুকিয়েও তো আনতে পারত।—ও দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুন। রোজ তোমাকে ঠেকিয়ে একটা করে আধলা আমি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসি; আচার তয়ের করবার আগে তেল দিয়ে হাঁড়ির উপর তোমার অক্ষর মূর্তি এঁকে নিই; হিঙের বড়ি দেবার আগে ছোট ছোট বড়ি সাজিয়ে তোমারই দেবকলেবর লিখে নিই; তবু কেন ঠাকরুন আমার এমন রোজগেরে ছেলেকে লোকসানের খাতায় ফেলতে দিচ্ছ! কেন একটা পরের বাড়ির মেয়েকে দিয়ে এমন লাখপতি ছেলেকে বেহাত হয়ে যেতে দিচ্ছ!'

বিরিজলাল ঘরে এসে ঢুকল গম্ভীর হয়ে। বইখানাকে লুকোতে ভুলে গিয়েছে ছেলে—বউমার জন্য কেনা বই—ছেলে লজ্জা পেতে পারে ভেবে শেঠজী সেদিকে তাকান না।

'কী বাবা বিরজু, শরীর খারাপ হয়নি তো?'

'না।'

'কোনো লোকসানের খবর নয় তো?'

'না।'

'নতুন কোনো সরকারী কানুন হল নাকি ?'

'না।'

'ইনকামট্যাক্স ?'

'না।'

'তবে ?'

'বইখানা কিনে তোমাকে দেখাতে এলাম।'

'বই। আমার জন্য ?'

অবাক হয়ে তাকালেন শেঠজী ছেলের দিকে।—খবরের কাগজে তবু না-হয় বাজারদর আর নতুন কানুনের খবর থাকে। কিন্তু বই তিনি কী করবেন ?—

—বইখানা তাহলে বউমার জন্য কেনা নয়।—বিরজুর মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, বইখান স্বামীর হাত থেকে নিলেন।

—বাঃ, মলাটের ছবিটা ভারী মজার তো! একজন পাগড়িবাঁধা, মেরজাইপরা লোক জাঁতা ঘোরাচ্ছে ; জাঁতায় দেওয়া হচ্ছে মানুষের কঙ্কাল, আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে টাকাকড়ি, সোনারুপো।—

'ওমা! লোকটার মুখে তোর বাপের মুখের আদল আসে—তাই না বিরজু ?' শেঠজী ছবিটার দিকে তাকালেন—লোকটার নাক গণেশজীর মতো লম্বা, সম্মুখের দাঁত দুটোও প্রায় তাই। এর সঙ্গে বিরজুর মা তাঁর মিল দেখল কোনখানে ? যেমন নিজের চেহারা তেমনি তো দেখবে অন্যকে।—

এতক্ষণে বিরিজলাল কথা বলল। আজ সকালে বেরিয়েই দেখে যে পথের মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজওয়ালারা তার বাবার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে—'শেঠজীর কেচ্ছা! শেঠজীর কেচ্ছা! দাম দু টাকা। দাম দু টাকা!' বইগুলোর কী বিক্রি! পড়তে পাচ্ছে না। সেও একখানা কিনে নেড়েচেড়ে দেখে। ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স নামের একটা রদ্দি বইয়ের দোকান 'হাটে হাঁড়ি' নামের একটা সিরিজ বার করছে। এখানা সেই সিরিজের প্রথম বই। বিরিজলাল তখনই যায় তার মামা ফেকমলের গদিতে। একটা মোটর-ট্রাকে করে বাজারের সব বইগুলো কিনে আনবার জন্য ফেকমলকে পাঠায়। নিজে তো যেতে পারে না—তাহলে যে বাপের ছেলে বলে সবাই চিনে ফেলবে! মামা কিছুক্ষণের মধ্যেই বইগুলোকে নিয়ে আসবে।—

শেঠজীর মুখের শান্তভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হল না।

'এবার কিনে না-হয় পুড়িয়ে ফেললে। কিন্তু তারপর? আবার যে ওরা ছাপবে? কত টাকা পুঁজির লোক বইয়ের দোকানদাররা? এই লেখা থেকে কত ক্ষতি হতে পারে আমার, সেটা না জানলে, ঠিক করবে কী করে যে কত টাকা আমরা ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে খাওয়াতে পারি! বিরজুর মা, তুমি চট করে গিয়ে জাঁতার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখো। ফেকমল বইগুলো নিয়ে এলে ওই ঘরে রাখতে হবে। তারপর খানকয়েক খানকয়েক করে রোজ রান্নাঘরের উনোনে পুড়িয়ে ফেলো।'

গিন্নীকে কোনো রকমে এখান থেকে বিদায় করে, তারপর শেঠজী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে বিরজু, বইখানাতে আমার সব লিখেছে নাকি?'

'সব কি আর লিখতে পেরেছে?'

বইখানাকে ভাল করে পড়ে, আন্দাজ কত টাকার খারাপ বলেছে, সেইটা একবার হিসাব করে নিয়ে আয়।'

বিরিজলাল চটে উঠল, এখনও হিসাব? যত টাকা খরচ হয়, ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সকে একবার দেখে নেব! মানহানির মোকদ্দমা আনব তাদের বিরুদ্ধে। পুলিসকে টাকা খাইয়ে আমি ওদের জেরবার করব। বজ্জাত ফণীটার পিছনে আমি গুণ্ডা লাগাব। ভেবেছে কী ওরা।'

'মাথা গরম করিস না বিরজু।'

ধীর পদক্ষেপে শেঠজী বার হলেন গদিতে যাবার জন্য।

সেই সন্ধ্যায়, বিরিজলাল গিয়েছে ফণীর সঙ্গে দেখা করতে। শেঠজীর ঘরে শালা ভগ্নীপতিতে শলাপরামর্শ চলছে।

ফেকমলের মতে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্সদের কারবারটা কিনে, সেটাতে তালা দিয়ে রাখাই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এরই সপক্ষে ও বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোর আলোচনা চলছে। হঠাৎ কথার মধ্যে শেঠজী জিজ্ঞাসা করলেন শালাকে—'আজ কত লাগল, বইগুলো কিনতে?' ফেকমল এর জন্য তৈরি ছিল। এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেল, 'দু হাজার সাতশ' আটত্রিশ টাকা সাড়ে-ন আনা। যোলশ' আটানব্বইখানা বই দু টাকা করে; কুড়ি টাকা ট্রাক ভাড়া; দু টাকা সাড়ে-ন আনা কুলি, পাইকারী রেটে কেনা বলে কমিশন পাওয়া গিয়েছে শতকরা কুড়ি টাকা করে!'

শেঠজীকে ঠকাবার ক্ষমতা নেই কোনো শালার। তিনি ফোনে জেনে নিয়েছেন আজ যে, বেশি বই নিলে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাওয়া যাবে। কথাটার ইশারা দিতেই শালাই সুর বদলাল।

'মারো গোলি! যেতে দাও। একশ' টাকা কমই দিও। আমি না-হয় বুঝব যে ভগ্নীপতির জন্য শতকরা পাঁচ টাকা করে, ঘর থেকে খরচ করলাম।'

শেঠজী চোখ টিপে রসিকতা করলেন, 'শালা কোথাকার! আচ্ছা আ। এখন একবার উঠি। তুমি ততক্ষণ তোমার দিদির সঙ্গে একটু লাভ-লোকসানের গল্প করো। আমি একবার চট্ করে গদি থেকে তোমার পাওনা টাকাটা নিয়ে আসি। সেখানে টিকমচাঁদকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'তার এখনই কী দরকার ছিল। বাড়ির লোকের সঙ্গে আবার...'

'না না, এসব ব্যাপার নগদনারায়ণ হয়ে যাওয়াই ভাল। জয় গণেশ জয় গণেশ!'

শেঠজী চলে গেলে শেঠ-গিন্নী মুখ খুললেন। 'ভাখ ফেকনা, তুই নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করিস— না? আমার বাপের বংশের মাথা হেঁট হবে বলে আমি বিরজুর বাপের সম্মুখে কথাটা বলিনি। তুই হিসাব দিলি ষোলশ' আটানব্বইখানা বই কিনেছিস। আমি গুনে দেখছি মোটে তেরশ' দশখান আছে।'

ফেকমল দিদির পা জড়িয়ে ধরে—এ কথা যেন ভগ্নীপতিকে বলা না হয়—বাকি বইগুলোর লাভের উপর সে আধাআধি বখরা দিতে রাজী দিদিকে।

ফেকন চলে ডালে ডালে তো দিদি চলেন পাতায় পাতায়। দিদি সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গিয়েছেন যে কাল থেকে এ বইগুলোর বাজারদর চড়বে; লোকে যখন দেখবে যে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দু টাকার বই পাঁচ টাকা দিয়েও কিনতে পারে। শেষ পর্যন্ত রফা হল, বই-পিছু এক টাকা করে তিনি পাবেন। —তোর ধর্ম তোর কাছে ফেকনা। মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাস না যেন!—

তারপর তিনি গলা নামিয়ে, ছোট ভাইকে আর-একটা রোজগারের রাস্তা বাৎলে দিলেন—মোটেই গোলমেলে না—শীতকালে তো জলের মতো সোজা —জাঁতার ঘরের বইগুলো উনোনে না ফেলে, খানকয়েক খানকয়েক করে প্রত্যহ আলোয়ানের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া—এইটুকু তো কাজ।—

ফেকমল দিদির কাছে সত্যিই শিশু—দিদি যদি বেটাছেলে হত, তাহলে লাটসাহেব কিংবা ইনকামট্যাক্সের হাকিম পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত বোধ হয়। —কিন্তু ধরা পড়লে যে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে! আজ থাক, দিদি আশ্বাস দিলেন, 'আলোয়ানের মধ্যে করে বই নিয়ে যাওয়া আবার একটা শক্ত কাজ নাকি? ছেলেবেলায় ঠাকুরদাকে দেখেছি, বাজরা ওজন করবার সময়, খদ্দেরের চোখের সম্মুখে সেরে পোয়া সাফ্। তুই বোধ হয় তখন জন্মাসনি! কিন্তু বাবা যখন গুটগুটিয়াদের গদিতে বছরে বাহাত্তর টাকা মাইনেতে চাকরি

করতেন, সেই সময়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোর? সে সময় আটা আর ডাল কোনো দিন পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়েছে আমাদের? গ্রীষ্মকালেও না। সেই ছেগমলের নাতি, লেখমলের ছেলে তুই! গায়ে আলোয়ান থাকতেও পাবি ভয়? ছি! ছি! ছেলেমানুষেরও অধম তুই! এই নে!'

কুলুঙ্গির গণেশঠাকুরের পিছনের স্তূপীকৃত ফুল সরিয়ে খানকয়েক বই বার করলেন।—প্রণাম গণেশজী! প্রণাম মুনাফা ঠাকরুন! ফেকনের উপর দৃষ্টি রেখো! ও নেহাত ছেলেমানুষ!—দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুনের দেবাক্ষরা কলেবরে বইগুলো ঠেকিয়ে, তিনি দিলেন ফেকমলের হাতে।

লেখমল-বংশের গৌরবময় ঐতিহ্য আটা ডাল নিয়ে; ছাপা লেখা নিয়ে নয়। তাই ফেকমলের বুক দুরদুর করে।

'দেখ তো দিদি, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না তো?'

'না না! ভয়েই ম'ল! তোর আলোয়ানটা কি কাঁচের, যে বাইরে থেকে দেখা যাবে বইগুলো!'

বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল। বিরিজলাল হাত ধরে টানতে টানতে টিকমচাঁদকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে।

'চোর কোথাকার! আজ আমি মেরে হাড় গুঁড়ো করব তোর! বাবার পেয়ারের পায়রার দেখ কাণ্ড! দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি যে, এই ধর্মপুত্তুরের বাচ্চা আলোয়ানের নিচে খানকয়েক বই নিয়ে বার হচ্ছেন। যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে বাবার গদিটা! বাবা কোথায় মা?'

'এই তো, এখনই গেল গদিতে।'

'গদিতে! গদিতে তো নেই! আমি তো সেখান থেকেই আসছি।'

'এই ফেকনা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এদের গদির লোক নিয়ে ব্যাপার—ওরা বাপবেটায় যা মন চায় করবে টিকমচাঁদকে, তোর এর মধ্যে কী? যা, বাড়ি যা!'

'না না মামা, তুমি যেও না। আগে এ বদমাইসটাকে ঠাণ্ডা করে নিতে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

এই শীতের মধ্যেও ফেকমলের কপাল তখন ঘেমে উঠেছে।

বিরিজলালের হাতের এক চড় খেয়েই টিকমচাঁদ পরিত্রাহি চিৎকার করতে আরম্ভ করে, 'ও শেঠজী, শিগগির আসুন—এরা আমায় মেরে ফেললে।—'

নিচে থেকে শেঠজী সাড়া দিলেন। বোঝা গেল যে তিনি বাড়িতেই আছেন। আসছেন। এসে, দেখেশুনে অবাক! কী ব্যাপার? ছেলে

বুঝিয়ে দিল—'বাজারে বইয়ের দর এবেলা চার টাকা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে আপনাব পেয়ারের টিকমচাঁদ দশখান বই সরাচ্ছিলেন।'

আরও দু-চার ঘা পড়তেই টিকমচাঁদ সব বলে ফেলল—তার কোনো দোষ নেই—শেঠজী নিজে তাকে ওই বইগুলো দিয়েছিলেন জাঁতার ঘর থেকে, বাজারে বিক্রি করবার জন্য—চার টাকা দরে।—প্রত্যহ খানকয়েক করে দেবেন বলেছিলেন। বিরিজলালবাবুকে আসতে দেখে শেঠজী জাঁতার ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন।—

এর পর আর টিকমচাঁদকে কিছু বলা চলে না। সে চলে গেল। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেঠজী হুংকার দিলেন, 'কেন? নিজের বাড়ির জাঁতা-ঘরে ঢুকতে হলেও কি আমায় টিকিট কেটে ঢুকতে হবে নাকি? আমি জাঁতার ঘরে চুরি করতে যাইনি—বই গুনতে ঢুকেছিলাম।' শেষের কথাটা বলবার সময় অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানলেন শ্যালকের দিকে। পেনমলের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে; তার দিদিরও।

বিরিজলালের এখন আর এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। সে খবর দিল যে ইন্দ্রাণী পাবলিশার্স সে পঁচিশ হাজার টাকায় কিনবে ঠিক করে এসেছে। হাজার ত্রিশেক টাকা দিয়ে আর-একটা ভাল প্রেস কিনবে। মাসে মাসে 'হাটে হাঁড়ি' সিরিজের বই বার করবে, ইংরাজী, হিন্দী, আর বাংলায়। ছাপার অক্ষরের কারবারে, পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জত আছে। মিস্টার ফাণীর সঙ্গেও সে সব ঠিক করে এসেছে। ছাপা অক্ষরের ব্যাবসাতে ওই রকম পেণ্টুলুন পরা লোকেরই দরকার। এ তো আর রাম রামে, দুয়ে দু নয়। এ হচ্ছে ছাপার অক্ষরের ব্যাবসা। চেয়ার টেবিলে বসবে, বন্ধুদের নিয়ে চা সিগারেট ওড়াবে, এই হচ্ছে এ ব্যাবসার রীত।—

শেঠগৃহিণী ছেলের এই নূতন ব্যাবসা খুলবার সংকল্পের মধ্যে বউমার ফুসলানির গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশান্ত আনন্দে ভরে উঠেছে শেঠজীর মুখ, ছেলের ব্যাবসায়িক বুদ্ধি দেখে। পারবে। এ ছেলে পারবে বাপের নাম রাখতে। সবচেয়ে আনন্দ যে এই রকম একটা নতুন অজানা ব্যবসাতে তাঁকে টাকা ঢালতে হবে না। ঢালবে বিরজু, তার নিজের টাকা থেকে।—

ও মহামহিম ছেগমলের বংশধর, আলোয়ানের মধ্যে ডান হাতখানা তোমার যে অবশ হয়ে এল। আর কষ্ট করবার দরকার কী! ও সাতখান বই গণেশঠাকুরের ফুলের নিচে আমি আগেই দেখেছিলাম।

নিজের নিজের কাজের জন্য কেউই অপ্রস্তুত নয়। এ সবই মুনাফা

ঠাকরুনের রাজ্যের নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবু বিরজুর মা কথা পালটাবার জন্য দেয়ালের মুনাফা ঠাকরুনকে প্রণাম জানাতে জানাতে বললেন, 'যাঁর কৃপায় এত বড় লোকসানটা বদলে লাভের কারবার হয়ে গেল, তাঁর দেবাক্ষরা কলেবর, আজই আমি সেকরা ডেকে রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।'

এবার মুনাফা ঠাকরুন ফণীর দর ফেললেন মাসে একশ' পঞ্চাশ টাকা। সে যে রকম করিতকর্মা লোক তাতে মনে হয় যে দেবীর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে তার আর বেশি দেরি নেই।

## পত্রলেখার বাবা

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নেই, হৈ-চৈ নেই, কথা-কাটাকাটি নেই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়? সবটা কোনো কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পর সবটা করা যায়, সেসব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নেই। রুচির মিলের জন্যই তিন-চারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডাটা টিকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হল।

'শুরু হল!'

'হ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।'

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা ওই বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিস এঁদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটা ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটি বাক্যে।

আবার সবাই নীরব—যতক্ষণ না আর-একটা নূতন বিষয়ের উপর কথা ওঠে।

নীরবতা ভাঙল সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনে।

'ন্যাপলা আসছে।'

'হ্যা-অ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'বাড়ির কাছাকাছি এসে ও সাইকেলের ঘণ্টা বাজাবেই বাজাবে।'

'হ্যা-অ্যা।'

ঠিকই নেপাল। সাইকেলখানাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। বেরিয়ে এল খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।

'কাগজে কোনো খবরটবর আছে নাকি হে নেপাল?'

'তাই দেখছি।'

গভীর মনোযোগে সে খবরের কাগজ পড়ছে দেখে সকলে অবাক হয়।—ব্যাপার কী?

দোলগোবিন্দবাবু কিন্তু একবারও নেপালের দিকে তাকাননি।

আবার মিনিট-দুয়েক সকলে চুপচাপ।

রাস্তার দিক থেকে 'টর্চ'-এর আলো পড়ল। কারা যেন আসছে।

'ও আবার কারা?'

'অনুপ আর পত্রলেখা হবে বোধ হয়।'

'পত্রলেখা বাড়িতে ছিল না? তাই বলো!'

মদনবাবু বেফাঁস কথাটাকে সামলে নিলেন, 'তাই আজ চা পাওয়া যায়নি এখনও।'

'এত রাত করে গিয়েছিল কোথায়?'

'নীলমণিবাবুর বাড়িতে আটকৌড়ে ছিল যে। ওঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে জান না?'

নীলমণিবাবুর বাড়ির চাকর পত্রলেখাদের পৌছে দিতে এসেছে। হাতের ধামিতে আটকৌড়ের মুড়িমুড়কি আর জিলিপি।

'আটকৌড়ের খুব ঘটা দেখছি।'

'হ্যা-অ্যা।'

অনুপ দেখাল, তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটেই মুড়ি-কড়াই ভাজায় ভরা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরই তো ছিল আসল নেমন্তন্ন। দিদি তো পেটুকের মতো তোরই পিছনে পিছনে গিয়েছে।'

'সে আর বলতে হয় না। আমাকে ডাকতে এসেছে তবে গিয়েছি। নইলে আমার দায় পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে।'

'তোকে ডাকতে এসেছিল, সেও ভাইয়েরই খাতিরে। নইলে আটকৌড়ের কুলো পেটাবার জন্য মেয়েদের আবার ডাকে নাকি।'

'আচ্ছা বেশ, আমি পেটুক। হল তো?'

'এই রে, পত্রলেখা চটেছে। আর তোকে চটালে কি আমাদের চলে। এই দ্যাখ্ না, তুই আজ ছিলি না, তাই আমরা এখনও চা পাইনি।'

'এই নিয়ে এলাম বলে।'

পত্রলেখা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল হাসতে হাসতে।

'এই সেদিন বিয়ে হল না নীলমণিবাবুর মেয়ের?' একটু চাপা গলা মাধববাবুর। নেপাল কাছেই রয়েছে। ছেলেমানুষদের সম্মুখে এসব কথা যত না বলা যায় তত ভাল। তবে হ্যাঁ, নেপাল আর এখন ছেলেমানুষ নেই। এই মাস থেকে কলেক্টরিতে 'কপিস্ট'-এর কাজ পেয়েছে। চাকরি-বাকরিতে ঢুকলেই ছোটরা বড়দের সঙ্গে সমান হবার অধিকার পায়। তবুও প্রথম প্রথম একটু বাধে। কাল প্রথম দোলগোবিন্দবাবু নেপালকে একটা গোপন কাজের ভার দিয়ে, তার বড় হবার অধিকারের সুনিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে খবর আড্ডার অন্য বন্ধুদের জানা নেই, তাই তাঁরা গলার স্বর একটু নামিয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। নেপাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছে।

'শ্রাবণ মাসে।'

'হ্যা-অ্যা।'

'আর আজকে হল এ মাসের তেইশে।'

'হ্যা।'

আঙুলের কড় গোনা শেষ হলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা।'

সকলেই দোলগোবিন্দবাবুর এ স্বভাবের কথা জানে। পরকুৎসা শোনবার আগ্রহ তাঁরই বোধ হয় দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথাসময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন। তাই আসল কথাটা শোনা হয়ে গেলে, তিনি মৃদু আপত্তি তুলে বলেন, 'থাক, থাক—কী দরকার আমাদের এইসব পরের কথার মধ্যে থাকবার!'

তাঁর এই বারণ কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু এই কম কথার আড্ডাটা আপন নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়।

ভিতর থেকে পত্রলেখা সকলের জন্য আটপৌড়ের মুড়ি-কড়াই ভাজা নিয়ে এল।

'দেখুন কাকা, কে পেটুক—আমি না আপনারা।'

'আরে তোকে কি কখনো পেটুক বলতে পারি! তাহলে তো আমাদের চা-ই দিবি না আজ!'

'মা চা ঢালছে; এই এনে দিলাম বলে। নেপালদা, তুমি হুট করে চলে

যেয়ো না যেন রাগ করে। তোমার মুড়ি নিয়ে আসছি। হাত তো আমার মোটে দুখানা। একসঙ্গে কতগুলো বাটি আনব?

'পত্রলেখা, একটি লঙ্কা আনিস তো মা আসবার সময়।'

'আচ্ছা, কাকা।'

তাঁর বন্ধুরা কেমন অনায়াসে মেয়েদের মা বলে সম্বোধন করেন, দেখে দোলগোবিন্দবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি তো চেষ্টা করেও পারেন না। বাধো-বাধো ঠেকে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। পত্রলেখা নামটা যা বড়—অনেক সময় যেন মনেই পড়তে চায় না। মা মা বলে ডাকতে পারলে সুবিধা ছিল। পত্রলেখার অন্য কোনো ডাকনাম দেবারও উপায় নেই; স্ত্রীর কড়া হুকুম মেয়েকে পত্রলেখা বলেই ডাকতে হবে। তিনি নিজে এই পাড়ারই মেয়ে—ডাকনামেই আজও পরিচিত—ভাল নামটা কেউই জানে না—ডাকনামটা আবার বিশেষ ভাল নয়—তাই পত্রলেখার নাম সম্বন্ধে তাঁর এত সতর্কতা। পত্রলেখা নামটায় দোলগোবিন্দবাবুর প্রথম থেকে আপত্তি। বলেছিলেন যে, যদি লেখা দেওয়া নামই রাখতে হয় তবে সুলেখা বা চিত্রলেখা রাখ না কেন? কিন্তু স্ত্রীর কাছে তাঁর কোনো কথা খাটে? যে কথা একবার মুখ থেকে বার হবে, তার আর নড়চড় হবার জো নেই। পাড়ার মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তো তাকে। আর নিজের নাম দোলগোবিন্দ তখন তার কি পত্রলেখা নামটাকে বড় বলবার মুখ আছে?

কথার খই ফুটোতে ফুটোতে পত্রলেখা চা দিয়ে গেল।

'এবার তুমি পড়তে বোসোগে যাও পত্রলেখা।'

'ও কী হে নেপাল, তুমি যে একগাল করে মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে চা খাচ্ছ! মুড়ির মুচমুচে ভাবটা চা দিয়ে নষ্ট করে লাভ কী?'

'আমার তাই ভাল লাগে।'

'হ্যা-অ্যা! আপরুচি খানা!'

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাড়ার ইউনিভার্সাল মাসিমা। এঁর জিভের ধার আছে। আর কোনো খবর ইনি এগারটার সময় শুনলে, সে খবর এগারটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার সব বাড়িতে অবধারিত পৌঁছে যাবে, এইরকম একটা খ্যাতি তাঁর আছে এখানে।

'কিসের গল্প হচ্ছে ছেলেদের?'

'ও আপনি এখানে ছিলেন? হচ্ছে এইসব হাবিজাবি কথা। আচ্ছা, চা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে মুড়িচিঁড়েভাজার মুচমুচে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় না?'

'দাঁতই নেই, তার আবার মুড়ি খাওয়া। সাতকাল গিয়ে এককালে

ঠেকেছে আমার এখন। তবে যেকালে খেতাম তখন মুড়ির সঙ্গে শসা খেতে আমার ভালই লাগত। মুড়ির মুড়মুড়ে ভাবটা শসার জন্য নষ্ট হয়ে যেত বলে তো বোধ হয় না।'

'তাহলে দেখছি নেপালেরই জিত।'

'হ্যা-অ্যা, ওরই জয়জয়কার আজকাল।'

'শুনতে পাচ্ছি তো তাই। আচ্ছা, আমি এখন চলি।'

'বড় তাডাতাডি চললেন ?'

এসেছি কি এখন ? জপসন্ধ্যা আমার এখনও বাকি।'

'আরে দাঁডান দাঁডান। এই অন্ধকারে একা যাবেন কি! নেপালের চা খাওয়া শেষ হল বলে। ও পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।'

'না না, ও এখন অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে চা খাবে। কী বলিস নেপাল ? আমার আবার কোথাও যাবার জন্য লোক লাগে নাকি ? কাশী বৃন্দাবন সেরে এলাম একা; এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যেতে লোক লাগবে সঙ্গে ?'

'না না। নেপাল সঙ্গে যাক।'

'ও বেচারা এসেছে খবরের কাগজ পড়তে—তোমরা ওকে জোর করে পাঠাবে ফোকলা দিদিমার সঙ্গে।'

'ও কাগজ ওর পড়া। এখন এমনি নাডাচাড়া করছে।'

'হ্যা-অ্যা, রিভাইজ করছে।'

'ইংরাজী করে আবার কী বলা হল ? এসব কী আমরা বুঝি। ওসব বুঝবে পত্রলেখার মতো আজকালকার ইংরাজী-পড়া মেয়েরা! আচ্ছা আমি চলি। নেপাল, তুমি খবরের কাগজ পড়।'

'পড়া না হয়ে থাকে, কাগজখানা বাডিতেও তো নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যা-অ্যা।'

এতক্ষণে নেপাল কথা বলল। আর চলে না চুপ করে থাকা।

'আমার কাগজ-পডা হয়ে গিয়েছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই!'

'দাঁড়ান দাঁড়ান মাসিমা। একটা কথা। নীলমণিদার নাতি দেখতে গিয়েছিলেন তো ? কেমন হয়েছে ?'

'দিব্বি বড়সড় ছেলে।'

প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই চাপা গলায়। দুই-ই অর্থপূর্ণ। এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না।

'থাক্ থাক্, যেতে দাও, দরকার কী ওসব পরের বাড়ির কথায়।'

নেপাল খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাজ করছে।

বাড়ির ভিতর থেকে দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর চিৎকার শোনা গেল, 'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় পত্রলেখা! অঙ্ক-টঙ্ক এখন নয়। ওসব চালাকি আমি ঢের বুঝি, বুঝলি।'

'এতক্ষণে শক্ত পাল্লায় পড়েছে পত্রলেখা।'

'হ্যা-অ্যা।'

পত্রলেখা জোরে জোরে ইতিহাস-পড়া আরম্ভ করেছে।

'বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম খেঁদি, মেয়ের নাম হল কিনা পত্রলেখা! হেসে বাঁচি না। নেপাল আর কেন—চল এবার আমরা যাই। তোর দরকার থাকে তো আবার না হয় ফিরে আসিস এখানে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে।'

'হ্যা-অ্যা।'

'না না না—আমি আর আসব না—ওই দিক দিয়েই বাড়ি চলে যাব।'

বেশ জোরের সঙ্গে বলা। বোঝা গেল যে এতক্ষণে নেপাল সত্যি সত্যিই মত স্থির করে ফেলেছে।

অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবরের কাগজখানা দোলগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে নেপাল বারান্দা থেকে নেমে এল। তিনিও নিস্পৃহভাবে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অকিঞ্চিৎকর জিনিসটাকে নিলেন। বুঝে গিয়েছেন তিনি, কাগজখানা বাড়ির ভিতরে না রেখে নেপাল তাঁর হাতে দিল কেন। বুদ্ধিমান ছেলে নেপাল—

কারও মুখে একটাও কথা নেই। মাসিমার গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, তারপর আর শোনা গেল না। নির্বাক আড্ডায় একজন পা দোলাচ্ছেন, একজন আঙুলের কর গুনছেন, একজন আঙুল মটকাচ্ছেন। এ সবই প্রত্যাশিত আচরণ, হিসাব করবার সময়ের। গুনে, হিসাব করে একটা সঠিক তারিখ বার করবার গুরু দায়িত্ব এখন এঁদের মাথায়। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের তারিখটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আর এখন এদের উপায় নেই। চুপ করে আছেন বলে যে এঁরা সময় নষ্ট করছেন তা নয়।

'সেটা ছিল ঊনিশে আগস্ট। ঠিক মনে পড়েছে।' তারিখের হিসাব মদনবাবুর সব সময় নির্ভুল। সেইজন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

'যেতে দাও ওসব কথা।'

'হ্যা-হ্যা।'

এর চেয়ে বেশি কথা খরচ করতে কেউ রাজী না। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দোলগোবিন্দবাবু নেপালের

দেওয়া খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামাননি তখন থেকে। রোলারের মতো গোল করে পাকিয়ে নিয়েছেন কাগজখানাকে।

মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুখে না প্রকাশ পেয়ে যায়, এ সংযম এঁদের প্রত্যেকেরই আছে। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের সঠিক তারিখটা খুঁজে বার করবার মধ্যে অঙ্কর উত্তর মিলবার তৃপ্তি নেই। ওটা শুধু কৌতূহল জাগ্রত করবার প্রথম ধাপ। তার পরের প্রশ্ন ও উত্তরটাই যে আসল। সেইটা আসছে—এইবার আসছে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা খোঁজবার পালা এখন চলেছে। কার মুখ থেকে সেই কথার নির্যাসটা বার হবে প্রথম, তার এখনও ঠিক নেই। দোলগোবিন্দবাবু পা নাচাচ্ছেন। তিনি যখনই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন তখনই এমনি করে পা নাচান। এই রকম অবস্থায়, তিনি অনেক সময় ভুলে পরনিন্দা করে ফেলেন।

তবে কি ছোট্ট টিপ্পনীটা তাঁর মুখ থেকেই বার হবে? তাঁর অবিরাম পা-নাচানো লক্ষ্য করে বন্ধুরা সেই প্রত্যাশাই করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যরকম। অতিপরিচিত ভঙ্গিতে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটা বাজল?'

অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ব্যাপার কী? সবে আজকের আড্ডাটা জমে আসছিল। বন্ধুরা জানে যে ওই প্রশ্ন দোলগোবিন্দবাবুর নোটিশ—আড্ডা ভাঙবার। রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্তই এ আড্ডার মেয়াদ। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর হুকুম। স্ত্রীর কথা না শুনে চলবার সাহস তাঁর নেই। শাসন বড় কড়া। পত্রলেখার পড়াশোনায় একটু মন কম; তার লেখাপড়ার একটু দেখাশোনা না করলে গিন্নী রাগারাগি করেন।—'অঙ্ক না-হয় তোমার মাথায় ঢোকে না; অন্য বিষয়গুলো তো পড়াতে পার! আর কিছু না হোক বানান-টানানগুলোও তো একটু দেখিয়ে দিতে পার। না-ও যদি পড়াও, কাছাকাছি একটু বসে থাকলেও তো মেয়েটা নভেল-নাটক না পড়ে, পড়ার বইটই নাড়াচাড়া করে। মেয়েকে ঢুলতে দেখলে চোখে জলের ঝাপটাও তো দিয়ে আসতে বলতে পার। আমি থাকি সে-ই রান্নাঘরে—'

এইসব মুখঝামটার ভয়ে সাড়ে-আটটার সময় আড্ডা ভাঙতে হয় প্রতিদিন। খাওয়া রাত দশটায়। তার আগে কিছুতেই না—মরে গেলেও না! এই হচ্ছে পত্রলেখার মায়ের ব্যবস্থা।

এইসব ব্যবস্থার কথা দোলগোবিন্দবাবুর বন্ধুদের সকলেরই জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকে যেন সাড়ে-আটটা বড় তাড়াতাড়ি বেজে গেল।

অবশ্য তাঁদের কারও কাছেই ঘড়ি নেই—তবে একটা আন্দাজ আছে তো সব জিনিসেরই। দোলগোবিন্দবাবু যেন একটু উসখুস করছেন। এ জিনিস বন্ধুদের নজর এড়ায় না।—কেন ?—মেয়ের পরীক্ষার সময় এখন তো নয়। কোনো কথা না বলে বন্ধুরা উঠলেন। যাবার আগে দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখ আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে গেলেন।

'হ্যা-অ্যা।'

শুধু এই কথাটা জুতো পরবার সময় একজনের মুখ থেকে অজানতে বার হয়ে গেল।

এতক্ষণে দোলগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের খবরের কাগজখানা খুলবার সময় পেলেন।—ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে! পারবে। এ ছেলে পারবে। কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এসব ছেলেকে!—এদের হাতে রাখতে পারলে লাভ আছে।

খবরের কাগজের ভাজের ভিতর, টাইপ-করা চিঠি, আব একখানা খাম। খামের ঠিকানাটাও টাইপ করে লেখা—এত তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছেলেটাব মাথায় বুদ্ধি খেলেছে খুব!—

টাইপ করবার জন্য কাল রাত্রিতে নিজের লেখা খসড়াটা দিয়েছিলেন নেপালের কাছে। নেপাল ফৌজদারী আদালতে কপিস্ট-এর পদে বহাল হয়েছে নতুন। তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেনি নেপাল ব্যাপারটা। 'দশের উপকার', 'অপ্রিয় কর্তব্য', ইত্যাদি কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুব মতো অল্পকথার মানুষের মুখে শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল তার। তার উপর আবার ফিসফিস করে বলা। পর মুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আগাগোড়া জিনিসটা। গলা নামিয়ে সে বলে, 'এ আব একটা শক্ত কাজ কী কাকাবাবু। কিছু ভাববেন না। মেসিন বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারি যদি দরকার পড়ে তো। যখন যা দরকার লাগবে বলবেন কাকাবাবু।'

'না না, আমার নিজের আবাব দরকার কী। পাবলিকের উপকাবের জন্যই এ কাজ করা।'

'সে তো বটেই।'

এই হয়েছিল কালকের কথা। নেপাল পত্রলেখায় বাবার আস্থাভাজন হতে পারবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সম্বন্ধে বেনামী চিঠি হাতে না লিখে, টাইপ করে পাঠানোই সব দিক বিবেচনা করে যুক্তিযুক্ত। নিজের অফিসের

মেসিনে টাইপ করা নিরাপদ নয়। তাই নেপালের সাহায্য নেবার দরকার হয়েছিল।

বেনামী চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর তুলনায় পানসে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুনসুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ; সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলে তো কথাই নেই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিখতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা-ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ওসবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস প্রচারে; চটকদার কুৎসার কথাটা দশজনে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশি গভীর। তাই তিনি ক্রমে ওসব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদও অপেক্ষাকৃত কম।

এই নিরাপত্তার দিকে চিরকাল তাঁর দৃষ্টি সজাগ। তাঁর বেনামী চিঠি দেবার কোনো কথা বন্ধুবাও জানেন না। কারও সঙ্গে তিনি কখনও আলোচনা করেননি এসব কথা। কাউকে বিশ্বাস পাননি। ওসব বিষয়ে কখনো কোনো কথা উঠলে, তিনি চিরকাল একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাব দেখাতে অভ্যস্ত। জানেন এক শুধু তাঁর স্ত্রী—তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা কর না কেন, স্ত্রীর কাছে কোনো-না-কোনো সময় সেটা ধরা পড়তে বাধ্য। চাবি-দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই তাঁর স্ত্রীর মতো বুদ্ধিমতী মহিলা হয়তো অন্য একটা মনগড়া মানে করে নিতেন। তাই তিনি তাঁর সমাজসেবার নিজস্ব ধারার কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা হল। বেনামী চিঠিও আবার নানারকমের আছে তো। দরকার

পড়েছিল সেদিন একখানা মেয়েমানুষের হাতে-লেখা বেনামী চিঠির। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলতেই দেখা গেল যে এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতা প্রচুর। একবার জিজ্ঞাসাও করেননি এ কাজে কোনো বিপদ আছে কি না। সম্মতিজ্ঞাপক মৃদু আপত্তি জানিয়ে, পরার্থে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, স্বামীর দেওয়া 'ডিক্টেশন' লিখেছিলেন। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোনোদিন পাইনি ; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোনোদিন হয়নি। চিঠি লেখার পাটই আমার নেই। যাক, ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।'

আর গুণের মধ্যে বেনামী চিঠির কথা পাড়ার অন্য কারও কাছে বলে না ফেলবার মতো বুদ্ধি আছে তাঁর স্ত্রীর।

এখন কথা হচ্ছে যে, নেপালটারও সে সুবুদ্ধি আছে কি না। নেপালকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করলেন কি না সেই কথাটাই কালকে থেকে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তবে আজকে খানিক আগেই নিজের আচরণে নেপাল যা দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

যাক, সেসব যা হবার তা তো হয়েইছে। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত টাইপকরা চিঠিখানা দেখেশুনে এখনই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে ; নইলে ভোরে উঠে মাইল চারেক দূরের ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে আসতে পারবেন কী করে। এ পাড়ার পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিখানার উপর কোনোমতেই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আবার একটা নতুন কাজ হাতে এসে পড়ল হঠাৎ, আজকের সান্ধ্য আড্ডার গল্প থেকে। নীলমণিবাবুর মেয়ের 'কেসটা'। এই রকমই হয় ; কোন দিক থেকে যে কখন কাজের বোঝা মাথায় এসে পড়ে তার কি ঠিক আছে ! যখন আসে, তখন যেন অনেকগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়ে—এ তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন। এখন নীলমণিবাবুর নামে একখানা বেনামী চিঠি ছাড়তেই হয়। নতুন জামাইয়ের কাছে এখন নয়। সে সব হবে পরে দরকার বুঝলে—একটা সতর্কবাণীর মধ্যে দিয়ে। এখন শুধু নীলমণিবাবুকে দিতে হবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রথম চিঠিতে তার চেয়ে বেশি কিছু দেবার প্রয়োজন হবে না। একসঙ্গে বেশি না। নিংড়ে নিংড়ে একটু একটু করে এসব আনন্দের রস নিতে হয়। কোণঠাসা প্রাণীটা এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আঘাত খাওয়ার পর আহত শিকারটার চোখের মণিটাকে তাঁর বড় দেখতে ইচ্ছা করে ; ভয়ার্ত বুকের অসহায় স্পন্দন আঙুলের ডগায় নিতে

ইচ্ছা করে।—জামাইয়ের চিঠিখানাও এখনই দিয়ে দিলে কেমন হয়?—কিন্তু ঠিকানা যে জানা নেই। মদনবাবুর এসব মুখস্থ। কথায় কথায় জেনে নিলেই হত আজ। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।—

দোলগোবিন্দবাবু উঠলেন, ঘরের ভিতর যাবার জন্য। পত্রলেখা ছুটে আসছিল এই দিকেই—হাতে বই।

'নেপালদা। এ কী, নেপালদা চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সে তো মাসিমার সঙ্গে গেল। কেন রে?'

'লাইব্রেরির বইখানা আজ ফেরত দেবে বলেছিল।'

নেপালই নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয় এ বাড়িতে।

'যাক, কালকে ফেরত দিলেই হবে। বইখানা দে তো দেখি একবার।'

'এ বই তোমার পড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।'

'না, সেজন্য চাচ্ছি না। বইখানা বেশ লম্বা সাইজের আছে। দু-চারখানা অফিসের চিঠি লিখতে হবে; ওই বইখানার উপর কাগজ রেখে লিখবার বেশ সুবিধা।'

দাঁড়াও, আমি বড় প্যাডখানা এনে দিচ্ছি।'

'না না, এতেই হবে। তুই শিগগির পড়তে বোসগে যা। নইলে তোর মা এখনই আবার বকাবকি আরম্ভ করবে। চেঁচিয়ে পড়বি, বুঝলি। আর তোর কলমটা দিয়ে যাস তো।'

এসব কাজে নিজের কলম ব্যবহার না করে অপরের কলম ব্যবহার করাই ভাল।

পত্রলেখা কলমটা দিয়ে যাবার সময় একখানা লম্বা গোছের খাতাও আনে।

'লাইব্রেরির বই; ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে; তার চেয়ে এই খাতাখানার উপর কাগজ রেখে লেখাপড়া করো।'

'লাইব্রেরির বই ছিঁড়বে কেন। আমি কি বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে যাব। যা, পড়তে বোসগে যা। তুই দেখছি আমাকেও আজ বকুনি না খাইয়ে ছাড়বি না!'

মেয়ে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথাগুলো বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে তিনি কোনোদিনই বকতে পারেন না। শুধু মেয়েকে কেন, কাউকেই না। বকা, চিৎকার করা এসব তাঁর কোনোকালেই আসে না।

চাবি দিয়ে তাঁর প্রাইভেট দেরাজ খুলে, তিনি লেখাপড়ার কাগজপত্র বার করলেন। একে তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কুনোব্যাঙের দপ্তর খুলে বসা। খাম, পোস্টকার্ড. টিকিট, কাগজ—বহু রকমের কালি আরও অনেক দরকারি

জিনিসের তাঁর স্টক থাকে, কখন কাজে লাগবে বলা তো যায় না। বেনামী চিঠি পাঠাবার দিনে ওসব কেনা ঠিক না। নেপালের চিঠিখানা তিনি ভাল করে পড়লেন। দু-চারটে বানানে ভুল করলেও মোটামুটি মন্দ টাইপ করেনি নেপাল। ভুলগুলো কালি দিয়ে সংশোধন করা ঠিক হবে না—কে জানে কিসে থেকে কী হয়। খামখানা থুতু দিয়ে আঁটবার সময় চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই সরকারী কর্মচারীটির ছবি। অপ্রত্যাশিত আঘাতে কেমন করে ছটফট করে বেড়াবে, অথচ কাউকে কিছু বলতেও পারবে না—এ কথা ভেবেও আনন্দ।—লোকটার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।—

'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড, পত্রলেখা।'

এইবার দোলগোবিন্দবাবু দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখতে বসলেন। অপ্রতিহত তাঁর ক্ষমতা এখন। পুতুলনাচের সুতো তাঁর হাতে; যেমন ভাবে ইচ্ছা নাচাতে পারেন। আজকের হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া দায়িত্ব; সর্বাধুনিক কিনা, তাই এইটাই আজকের আসল কাজ। তিনি একখানা খামের উপর খসখস করে বাঁ হাত দিয়ে নীলমণিবাবুর ঠিকানাটা লিখলেন। অভ্যস্ত হাত। তারপর আরম্ভ হল চিঠি লেখা। কলম হাতে ধরলে কখনও কথার জন্য ভাবতে হয় না তাঁকে। কিন্তু আজ প্রথমেই আটকাল একটা বানানে! আরম্ভ করেছিলেন—'আমরা ঘাস খেয়ে থাকি না। লোকের চোখে ধুলো—'

খটকা লাগল ধুলোর বানানে। ধ-এ দীর্ঘউ না ধ-এ হ্রস্বউ? এইটা দেখবার জন্য পত্রলেখার কাছ থেকে বাংলা অভিধানখানা চাইতে একটু সংকোচ বোধ হল। লাইব্রেরির বইয়ের মলাটের উপর ধুলো আর ধূলো দুটো পাশাপাশি লিখে দেখলেন কোনটা দেখায় ভাল। দুটোই সমান যে! —যদি ধুলো কথাটা পাওয়া যায় এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা ওলটাতে আরম্ভ করলেন।—বঙ্কিম চাটুজ্যে কি আর ধুলোটুলো নিয়ে কারবার করে! গোধূলি, ধূলি, ধূলিকণা এই সব গোটাকয়েক পাওয়া গেল; কয়েক পৃষ্ঠার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বইখানা নাড়াচাড়া করছেন— একখানা কাগজ বেরিয়ে এল। কতদূর পর্যন্ত পড়া হল, তারই বোধ হয় চিহ্ন। দিয়েছিল লাইব্রেরির কোনো পাঠক ওই কাগজখানাকে দিয়ে।— কাগজখানার উপরের লেখাটার দিকে নজর গেল।—এ কী! পত্রলেখার হাতের লেখা না?—লেখাটা পড়লেন। প্রথমটায় একটু গোলমেলে ঠেকে। চিঠিখানার নিচে কোনো নাম নেই। কাকে লেখা তারও কোনো উল্লেখ নেই চিঠির ভিতরে। চিঠিখানা তাড়াতাড়িতে লেখা—মনে হয় খানিক আগেই লেখা হয়েছে।

—সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে পারিনি। ছোট ভাইকে নিয়ে মা'র হুকুমে আটকৌড়েতে যেতে হয়েছিল। আমার যেতে একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাগ কোরো না লক্ষীটি।—

শেষের শব্দটার ভুল বানান এই মানসিক অবস্থাতেও নজরে পড়ে।—না— অসম্ভব! আবার পড়ে দেখলেন।—রাগে সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে। নিজের মেয়ের এই কাজ। ইচ্ছা হয় চুলের ঝুঁটি ধরে এখানে টেনে নিয়ে এসে মেয়ের এই আচরণের জবাবদিহি নেন!

চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে মনে হল যেন হঠাৎ মেয়ের নামটাই মনে পড়ছে না; কেমন যেন গুলিয়ে গেল! পরের মুহূর্তে নামটা খুঁজে পেলেন। পত্রলেখাকে তিনি আজ পর্যন্ত কখনো বকেন নি। মারধর বকুনি, ওসব তাঁর আসে না কোনো কালে। বলেছেন ওসব হচ্ছে ওর মায়ের ডিপার্টমেণ্ট!—তা ছাড়া মায়ের কাছে কি কখনো ওসব কথা তিনি বলতে পারেন।—

সব রাগ গিয়ে পড়ল ভিজে-বিড়াল হ্যাপলাটার উপর। ওটার উপর বিশ্বাস করে তিনি কী ভুলই না করেছেন!—মা-বাপেরই বুঝি এসব জিনিস নজরে পড়ে সবচেয়ে শেষে! এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে আজ সন্ধ্যার আড্ডায় বন্ধুদের কথাগুলোর ইঙ্গিত এই দিকেই ছিল। মাসিমা পর্যন্ত নেপালের এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার উপর কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। দেখা যাচ্ছে সকলেই জানেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, সকলে ঘুরিয়ে তাঁকেই খোঁটা দিচ্ছিলেন এ নিয়ে। অথচ শুধু তিনিই বুঝতে পারেননি সে সময়। এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে।—ছি ছি ছি।—ওই হতভাগাটাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে; ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে; করতে হবে তো আরও কত কী! কিন্তু তাঁর যে ওসব আসে না কোনো কালেই। পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাট কি তাঁরই উপর এসে পড়বে!—ওই বাঁদরটাই নিশ্চয় পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানোর ফন্দিটা শিখিয়েছে। ও চালাকিটা আগে থেকে রপ্ত না থাকলে, কখনও কি অত তাড়াতাড়িতে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে ভরে চিঠি চালান দেবার কথাটা কারও মাথায় খেলে? ধরে চাবকানো উচিত রাস্কেলটাকে!—কিন্তু মারধর করলে নেপালটা আবার চটে তাঁর বেনামী চিঠি দেবার অভ্যাসের কথা লোকের কাছে বলে বেড়াবে না তো? তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠির খসড়াটাও যে সেই হতভাগাটার কাছেই থেকে গিয়েছে।—ভয়-ভয় করে।

কী করা উচিত এখন? অনেকক্ষণ ধরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন বিষয়টাকে নানা দিক থেকে। যত ভাবেন তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোনো কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজের থেকে একটা পুরনো পেন-হোল্ডার বার করলেন। কলমটার নিব নেই। কলমের উলটো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।

## বাহাত্তুরে

মানহানির মোকদ্দমাটা নিয়ে বেশ খানিকটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে শ্রীদাম সাহার। এই উত্তেজনাটাই তাঁর নেশা। মহাজনী কারবার করেন। কোর্টে মোকদ্দমা লেগেই থাকে। প্রত্যহ নিজে না গেলেও চলে; কিন্তু তিনি না গিয়ে থাকতে পারেন না। এই বাহাত্তর বছর বয়সেও নথিপত্রের পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি, ঠুকুর ঠুকুর করে হাঁটতে হাঁটতে কোর্টে তাঁর যাওয়া চাই-ই চাই। কাছারির বারান্দায় ছাতা মাথায় দেওয়া অবস্থায় কত সময় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়; কত সময় দেখা যায় নথিপত্রের পুঁটুলিটাকে বালিশ করে বার লাইব্রেরির বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছেন: সকলেই তাঁকে চেনে। জাল-জুয়াচুরি না করে, আইন-সংগত উপায়ে তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি করেছেন; কিন্তু শহরের লোকে সকাল-বেলাটায় তাঁর মুখদর্শন বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করে না। স্কুলের ছাত্রদের ধারণা, শ্রীদামবাবুর মুখদর্শনের অমঙ্গল এক শুধু কাটতে পারে তাঁর দাঁত দেখলে।

বার-লাইব্রেরিতে একদিন ব্যারিস্টারসাহেব তাঁকে হাসতে হাসতে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য লোক হলে চেপে যেত; কিন্তু তিনি মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন কোর্টে। তাঁর বাঁধা উকিল আছেন আদালতে। দু টাকা করে ফি এবং মক্কেলের বলা পয়েন্ট অনুযায়ী বহস্, এই কঠিন শর্তে রাজী বলেই তিনি শ্রীদামবাবুর আস্থাভাজন হতে পেরেছেন। বিবাদী পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শহরের বাসিন্দারা সকলেই

বাদীর নাম নেবার দরকার পড়লে বিশ্রীদামবাবুই বলে। শ্রীদামবাবুর উকিল বহস্ করেন যে, সকালে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়া আর কখনো কেউ তাঁর মক্কেলকে বিশ্রীদামবাবু বলে সম্বোধন করে না; এবং মানহানির কথাটা বলা হয় ব্যারিস্টারসাহেবের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর।

ওইরকম একটা মোক্ষম পয়েন্ট মাথায় খেলেছিল বলে বেশ খুশী মেজাজে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন শ্রীদামবাবু। এক শুধু দুর্ভাবনা যদি অপরপক্ষ হাকিমকে ঘুষ খাওয়ায়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিতব্যয়ী বলে বাইরে তাঁর দুর্নাম আছে; কিন্তু তাঁর বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার দিকটা ভাল। ভালমন্দ খাওয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক আছে; এবং এই ঝোঁকটা বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে দিনদিনই বাড়ছে। ভেবেছিলেন যে, আজ জমিয়ে মোকদ্দমার গল্পটা করবেন স্ত্রীর কাছে, কিন্তু জলখাবার খাওয়ার সময় শুনলেন যে, তাঁর হাঁপানির টানটা হঠাৎ বেড়েছে। সৃষ্টিধরের মা বারোমাস এই হাঁপানি রোগে ভোগেন। পঞ্চান্ন বছর আগের সেই বিয়ের দিন থেকেই তিনি দেখছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে; আঙুলে গুলে নিয়ে একটু পায়েস ছোট নাতনীর মুখে দিয়েছেন; এমন সময় একটা মারাত্মক খবর শুনলেন বড়বউমার মুখে। আজকাল বাড়ির লোকে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধান হয়ে কথা বলে; কোন কথার যে কী মানে করে নেবেন এই ভেবেই সবাই তটস্থ। কাজেই খবরটার মারাত্মকতার দিকটার কিছুমাত্র আঁচ পেলে বড়বউমা কথাটা তুলতেন না শ্বশুরের কাছে। শাশুড়ীর অসুখের আধুনিকতম চিকিৎসার সম্বন্ধে খবর। মজার কথা ভেবেই বলা; কিন্তু ছেঁকা লাগবার মতো গিয়ে লাগল কথাটা শ্রীদামবাবুর মনে। মনের অস্বাচ্ছন্দ্য চাপা দিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নরেন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল কেন?'

জবাব দিলেন মেজবউমা। 'নরেনবাবু নিজে থেকেই এসেছিলেন বন্ধুর খোঁজে; কী যেন দরকার ছিল। কথাবার্তা হওয়ার পর বুঝি নিজে থেকেই বট্‌ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মা কোথায়! মা'র তো এখন নিচে নেমে দেখা করবার মতো অবস্থা নেই। তিনি নিজেই উপরে গিয়ে দেখলেন মাকে।'

যতদূর সম্ভব গলার স্বর নরম করে শ্বশুর বড়বউমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিজিটের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো?'

সকলেই জানেন যে, নরেন ডাক্তার সৃষ্টিধরের বন্ধু; এ বাড়ি থেকে ফি নিতে পারেন না। তবু বড়বউমাকে উত্তর দিতে হয়, 'আমরা কী করে বলব?'

'দেখ বড়বউমা, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে করবার অভ্যাস ছাড়! বলো

জানি না—আমি জানি না। আমরা-টামরা নয়! পরিষ্কার কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে!'

'আমি জানি না।'

'সৃষ্টিধরের কি এসব খেয়াল আছে! কাল আমাকেই পাঠাতে হবে টাকাটা। কারও ন্যায্য পাওনা, যে-কোনো ছুতোয় তাকে না দেওয়া ঠকামি! চারশ বিশ দফার নাম শুনেছ তো? তাই। আমি যা চাই তা কি এরা হতে দেবে!'

হনহন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এখন দেখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! শ্বশুরের মেজাজ বউরা বোঝে, কিন্তু এই অকস্মাৎ উষ্মার কারণ তারা ঠিক ধরতে পারল না। হিসাবী তিনি ঠিকই। কম্পাউণ্ডারবাবুই এ বাড়ির ডাক্তার, কারণ তিনি ইনজেকশন দিতে এক টাকা করে নেন। শ্রীদামবাবু আরও বলেন যে, আজকালকার ডাক্তাররা যখন শুধু পেটেণ্ট ওষুধই খেতে দেয় রুগীকে, তখন কম্পাউণ্ডার আর ডাক্তারে তফাত কী? তবে শক্ত অসুখে টাকা খরচের ভয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকবেন না এমন লোক তিনি নন। এ কথা বাড়ির বউরাও জানে। বিশেষত স্ত্রীর বেলায় তাঁর রাশ যে একটু আলগা, এ কথা শুধু বাড়ির কেন, বাইরের লোকেও জানে। তবে তিনি এমন চটলেন কেন? বুঝতে না পেরে পুত্রবধূরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল কথাটা। নরেন ডাক্তারকে ফি না দেওয়ার কথাটা যে তাঁর রাগের আসল কারণ নয়, এ কথা তারা বুঝতে পেরেছে।

শ্রীদামবাবু খবরটা শুনেই বেশ বিচলিত হয়েছেন। বুঝতে পারছেন যে, আর কেউ ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দিচ্ছে না।—দেবে না কেন? উচিত ছিল দেওয়া। তিনি বাড়ির কর্তা। একবার তার সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে! কিন্তু শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পাত্র তিনি নন। সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য তিনি স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। সৃষ্টিধরের মা খাটের উপরে বসে। কোলে দুটো বালিশ নিয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন আর কাশছেন তখনও। পাকা চুলের মধ্যের টাকপড়া সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর নজরে না পড়ে পারে না। প্রথম কথাতেই ধরা পড়ে গেল স্ত্রীর মনোভাব। সৃষ্টিধরের মা মানহানির মোকদ্দমার সম্বন্ধে প্রত্যাশিত প্রশ্নটা করলেন না; পায়েসে মিষ্টি বেশি হয়েছিল কি না কিংবা বউমারা খাওয়ার সময় পাখা নিয়ে কাছে বসেছিল কি না, এ কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না; মুখে একগাল হাসি নিয়ে তিনি তুললেন নরেন ডাক্তারের নূতন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনটার কথা। হাঁপানির টান সত্ত্বেও যে-রকম

উৎসাহের সঙ্গে বলা, তাতে মনে হল যে, ডাক্তারের ব্যবস্থা পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে তাঁর মনের কাছ থেকে।—নরেন ডাক্তার এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কোন্ জিনিস খেলে হাঁপানিটা আরম্ভ হয়। ধোঁয়া নাকে গেলে বাড়ে নাকি, স্নান করলে বাড়ে নাকি, ছেলেবেলায় কবে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মনে আছে নাকি—আরও কত এইরকমের হাবিজাবি প্রশ্ন। সব শুনে বলল—এক কাজ করে দেখুন। উপকার যে হবেই তা সে ঠিক বলতে পারে না; তবে চেষ্টা করে দেখা উচিত। এ ঠিক হাঁপানি নয়; রোগের নাম ব্যানার্জি না কী যেন বললে।—কত রকমের যে নতুন নতুন রোগ হচ্ছে আজকাল!—

হতবাক হয়ে গিয়েছেন শ্রীদামবাবু স্ত্রীর কথার ধরন দেখে। পুত্রবধূরা যা বলেছিলেন সংক্ষেপে, ইনি সেই কথাই বলছেন বিস্তৃত ভাবে। মা আর ছেলের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে। তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যে গোনেনি। এমন মারাত্মক বিষয়টা বিচারের সময়ও! হ্যাঁ, মারাত্মক বইকি। তাঁকে খবর দিতে যাবে কেন। মনেই পড়েনি তাঁর কথা!

স্ত্রীর কথা কানে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বলে চলেছেন নূতন ওষুধটার কথা।—কতই বা দাম। শস্তার ওষুধ। সারলে পরে অবাক হবার কথা। কিন্তু ও কি আর সারবে! অত সোজা নয় এ রোগ। কত কিছুই তো করে দেখলাম সারাজীবন। ধরে আরশোলাসেদ্ধ জল খেয়েছি তোমার কথায়। সেবার ওষুধের সিগারেট পর্যন্ত খেতে হয়েছে তোমার পাল্লায় পড়ে।—

শুনছেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তিনি জানেন যে, স্ত্রীর কথাগুলো আন্তরিক নয়; স্ত্রীর মনে মনে বিশ্বাস ওষুধে আশু ফল পাবেন। নূতন ওষুধের সন্ধান পেয়ে বেশ উৎফুল্লই হয়েছেন তিনি।—ওষুধের শস্তা দামটাই শুধু দেখলে সৃষ্টিধরের মা! ওর দাম কি শুধু ওই কয় আনাই? আমার দিকটা না-হয় না ভাবলে, নিজের দিক থেকেও ভাবো জিনিসটাকে। তোমার মাছ খাওয়া ঘুচবে, সাদা থান পরতে হবে, আরও কত কী করতে হবে! ছেলে, ছেলের বউ আজ তোমায় মাথায় করে রেখেছে—তখন কি কেউ পুছবে। ওদের সংসারে একবেলা চাড্ডি আলো-চালের ভাত খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে হবে।—যাক, সেসব যার জিনিস সে বুঝবে।—

মুখে বললেন, 'দেখ, কতদূর কী হয়।'

প্রায় অর্থহীন কথাটা। তারপর শ্রীদামবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। মৃত্যুভয়টা তাঁর চিরকালের। ইদানীং বেড়েছে।

এ নিয়ে উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তাও বাড়ছে দিন দিন। অনেক বিষয়ে মন খুঁতখুঁত করে। সন্দেহ হয়। পারলে পরে সাবধান হয়ে যান। ছেলেমেয়েরা না জানুক, স্ত্রী তাঁর স্বভাবের এই দিকটার কথা জানেন। সময় সময় স্ত্রীর কাছে বলেও ফেলেন কিনা। এখনও বলতে পারলে হয়তো আসন্ন সংকটের একটা সমাধান হতে পারত। যাঁরা আঘাতটা দিয়েছেন তাঁরা সামলে যেতেন নিশ্চয়ই। অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসা আঘাতের প্রকৃতিটা আবার অপরের কাছে বলবার মতো নয়। এত ব্যক্তিগত, এমন একটা স্পর্শকাতর জায়গার সঙ্গে সম্বন্ধিত যে বলতে বাধে। সেই হয়েছে মুশকিল। অভিমানের শ্রেণীর মনের ভাবের কোনোই মূল্য থাকে না, যদি 'ওগো আমি অভিমান করেছি গো' বলে সেটা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়।—তাঁর দিকটা একবার মনেও পড়ল না স্বষ্টিধরের মায়ের!—অমন ওষুধ ব্যবহারের কথা উঠতেই যে মনে পড়া উচিত ছিল। এ দুঃখ তাঁর রাখবার জায়গা নেই।

যে কথাটা ভাবতে চান না, সেই কথাটাই বারবার মনে আসে। যত দুশ্চিন্তাটা মন থেকে দূর করে ফেলতে চান, ততই যেন উদ্‌বেগ বাড়ে। বয়স হয়ে এই হয়েছে মনের অবস্থা! বোঝেন, কিন্তু আবার না করেও পারেন না। একটা উদ্‌বেগ যায় তো আর একটা এসে তার জায়গা নেয়। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল যে অপর পক্ষ আবার হাকিমকে ঘুষ খাইয়ে মানহানির মোকদ্দমার রায় পাল্‌টে না দেয়। সেই দুশ্চিন্তার জায়গা নিয়েছে এখন স্ত্রীপুত্রের স্বষ্টি করা অমঙ্গলের অবশ্যম্ভাবিতা। ছেলেরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করে তাঁকে; কিন্তু এর সবগুলোই কি অকারণ উৎকণ্ঠা? রক্তের গরমে ওরা অনেক জিনিস উড়িয়ে দেয় তুড়ি মেরে। কিন্তু বাহাত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তো তাদের নেই। সে কথাটাও ওরা স্বীকার করবে কিনা কে জানে। আরে তোরা বুঝবি কী; এইসব ছোট ছোট জিনিসগুলোর উপর নজর চিরকাল ছিল বলেই তোদের জন্য এত সব টাকাকড়ি সম্পত্তি রেখে যেতে পারব। তোদেরই জন্য এত সব; আর একবার মনেও পড়ল না আমার কথাটা।...

বড় ছেলে বাড়িতে বলে গিয়েছে যে সে রাত ন'টায় ফিরবে ওষুধ নিয়ে। নরেন ডাক্তারের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কাজে গিয়েছে। কাজ মানে ইনসিওরের দালালি। স্বষ্টিধর একবার তাকেও ঘুরিয়ে বলেছিল লাইফ ইনসিওর করতে। বেশি বয়সেও নাকি ইনসিওর করা যায়। তিনি কানে তোলেননি কথাটা। তার ধারণা ইনসিওর-করা লোক বেশি দিন বাঁচে না। স্বষ্টিধরের মা কিন্তু তখন তাকে লাইফ ইনসিওর করতে বারণ করেছিলেন।

সেই মানুষের আজ স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা মনেই পড়ল না !···এই সেদিনও সৃষ্টিধরের মা সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন; এক গুরুর কাছ থেকে দুইজনে একসঙ্গে দীক্ষা নিয়েছেন; একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন কিছুদিন আগেও; প্রয়াগসংগমে স্নান করবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের কথায় দুজনের আঁচল একসঙ্গে বেঁধে তারা একসময়ে ডুব দিয়েছিলেন। এ সবই কি লোক-দেখানো ?

শ্রীদামবাবু ঘড়ি দেখলেন। নটা বাজবার এখনও অনেক দেরি আছে।

···বাড়ির কর্তার দিকটাই তো সবচেয়ে আগে মনে পড়া উচিত বাড়ির লোকের। এ বাড়ির লোকের ওঠা-বসা, কাজ বিশ্রাম সব নিয়ন্ত্রিত হয় তার সুবিধা-অসুবিধার উপর লক্ষ্য রেখে। তিনি যেমন ইচ্ছা চলেছেন; অন্য সকলে অতি সন্তর্পণে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। কোর্টে যাবার জন্য যত সকাল সকালই খান না কেন তিনি তার প্রিয় পলতার বড়া এবং ছানার ডালনা একদিনও পাননি এ কথা মনে পড়ে না। তাকে ঘিরেই এ সংসারের সব-কিছু। তিনি শুলে পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ছেলেরা বড় হয়ে আজকাল তবু তার সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা বলে; আগে তো সে সাহসও ছিল না। তার ছোট ছেলেটা যখন পাঁচ-ছয় বছরের তখন তিনি বাড়ি ঢুকলেই সে ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকত। ঘরের দেওয়ালে সম্মুখে টাঙানো রয়েছে ছোট ছেলের বিয়ের সময়ের তোলা একখানা গ্রুপ ফটো। মাঝখানে বসে রয়েছেন তিনি। ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতনী—চার সারিতে অতি কষ্টে এঁটেছে ফটোর কাগজে। তাঁকে কেন্দ্র করেই সব···'এক ছেলে ছেলে নয়, এক টাকা টাকা নয়।' তাই তাঁর অনেক সন্তান, অনেক টাকা। এতগুলো প্রাণীর কাছ থেকে তাঁর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া, বাড়ির কর্তার এইটুকুই তো তৃপ্তি। তাঁর ধারণা ছিল এরা তাঁকে ভালওবাসে। সবই কি ভুল ? সবই কি ফাঁকি ? তাঁর দিকটা একবার ভাবলও না এরা !

এরা মানে সৃষ্টিধরের মা।

···নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত! এগারটি সন্তানের জননী। সংসারের লক্ষ্মী বলেই তাঁকে জানতেন। সেকেলে মানুষ শ্রীদামবাবু। ভাবতেন স্ত্রীভাগ্যেই তাঁর এত ধন জন বিষয়সম্পত্তি। এই পঞ্চান্ন বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে যা-কিছু পেয়েছেন, সবটুকুকে মিথ্যা ছলাকলা বলে ভাবতে বাধে। সেইজন্যই স্ত্রীর তাঁর কথা মনে না পড়াটা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছে আরও বেশি করে। ব্যারিস্টারসাহেবকে 'আর্গুমেন্ট' দিয়ে কাবু করবার

উল্লাসে বিকালের আহারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। অম্বলে বুক জ্বালা করছে। দুশ্চিন্তা বাড়লে তাঁর অম্বলও বাড়ে। একটু জল খেলে হয়। কিন্তু তিনি চান না এ বাড়ির কাউকে ডেকে এখন জল আনতে বলতে। কোনো নাতনী হয়তো জল নিয়ে আসবে ; এসে দাদুর সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকবে কতক্ষণ কে জানে। সে সময় আর সে মনের অবস্থা এখন তাঁর নেই।...ন'টা এখনও বাজেনি। এখনও সময় আছে—স্ত্রীর মনে পড়বার সময়, আর নিজের ভেবে দেখবার সময়।...স্ত্রীকে মুখ ফুটে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে স্বামীর অস্তিত্বের কথাটা ? কেশে আমি বেঁচে আছি এই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার মতোই হাস্যাস্পদ ! অমঙ্গলে বলে ছোট করায়, যে লোকটা ব্যারিস্টারসাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা লড়তে পারে, নিজের অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে স্ত্রীর কাছে ছোট হতে পারে না। মরে গেলেও না ! সৃষ্টিধরের মা'র চোখে তিনি খেলো হতে চান না।...আচ্ছা, হাসিঠাট্টার ছলে কথাটা সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিলে কেমন হয় ? একটু ঘুরিয়ে বলা। 'ওগো—মাছে আঁষটে গন্ধ লাগতে আরম্ভ করেছে বুঝি আজকাল'—বা ওই গোছের কোনো কথা ? ওতেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। স্ত্রীর অধিকার আছে নিজের অসুখ সারাবার চেষ্টা করবার ; ছেলের অধিকার আছে নিজের মায়ের জন্য ওষুধ কিনে আনবার ; তাদের অধিকার আছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলে যাবার ; তিনি তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান না কোনো কথা বলে। আদালতের কড়া জজসাহেবের মতো পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তিনি আচরণের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে চান। হয়তো হয়ে ওঠে না সব সময়, কিন্তু সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও আইনসংগত অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপে মেপে চলতে চান।

...সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে যাওয়াই তো চিরকাল মেয়েদের কাম্য বলে জানতেন। সৃষ্টিধরের মা'রও আজকালকার মেয়েদের মেমসাহেবী হাওয়া লাগল নাকি ? আইন তো হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ করে নিলেই তো পারে যদি তার মন চায় ! ...মানহানির মোকদ্দমায় বড়লোকের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে বড় ভাবছিলেন তিনি খানিক আগে। কতটুকু মূল্য তার ! থেঁতলে চটকে পা মাড়িয়ে চলে যাওয়ার চাইতেও অপমানজনক হচ্ছে চোখের সম্মুখে থেকেও নজরে না পড়া ! নিজের কাছে নিজের লজ্জা করে !...কে জানে, হয়তো তাঁর কপালে লেখা আছে যে, তাঁর স্ত্রীই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন। সে কথা ভাবলেও ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ! কপালের লেখা জিনিসটা কী ধরনের তা ঠিক জানা নেই। আইনের ধারাগুলো যেমনভাবে লেখা হয়, সেই

রকমই নাকি? আইনের ধারার মতো কপালের লেখার মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজা চলে নাকি? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেও কি কপালের লেখাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না? যাকগে! লোকে শুনলে পাগল ভাববে। এইসব মনের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। এসব চিন্তার কি কোনো মাথামুণ্ডু আছে!···তবে এ কথা তিনি বলবেন যে, কপালের লেখা খণ্ডানো শক্ত বলে কি তাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতে হবে?···মেটে সিঁদুর আবার একটা ওষুধ নাকি! যত ভাবেন, তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।—রগের কাছটায় দব্‌দব্‌ করছে। অম্বল হলেই তাঁর এইরকম মাথা দব্‌দব্‌ করে আর বুকের কাছে ব্যথা-ব্যথা করে। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। ছেলের ফেরবার সময় হল। এখনও ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাননি। বড় গরম লাগছে। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা আনচান ভাব হচ্ছে। ওই! নিচে মোটরগাড়ির শব্দ! শ্রীদামবাবু উঠে একবার বাথরুমের দিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সৃষ্টিধরই প্রথম জানতে পারল। তারপরে তো হৈ হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। কান্নাকাটি, ডাক্তার, বদ্যি, নার্স, অক্সিজেন আরও কত কী! বড ভয়ানক রোগ! চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ভাগ্য ভাল যে, ডাক্তার ডাকবার সময় পাওয়া গেল। সেই যে মেঝের উপর এনে শোয়ানো হয়েছিল, তিন দিন সেই একই অবস্থায়। নরেন ডাক্তার বলেছিল নড়াচড়া বারণ।

তারপর আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা এল, ভাববার শক্তি এল, মনে বল এল। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে বাড়ির লোকে। সৃষ্টিধরের মা মানতের পুজো দিলেন বুড়োশিবতলায়। ওই বেঁচেই গেলেন; নরেন ডাক্তার বলেছে, এখনও তিন মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, তারপর যতদিন বাঁচবেন, বেশ সাবধানে থাকতে হবে; তেল-ঘি খাওয়া বারণ—যতকাল বাঁচবেন মাখনতোলা দুধ খেতে হবে। কোর্টে যাওয়া আর চলবে না।

ভাববার ক্ষমতা ফিরে পাবার দিন থেকেই শ্রীদামবাবু কত কী ভাবছেন। এ-যাত্রা নিস্তার পেলেন ভেবে আনন্দ আছে; কিন্তু এর চেয়ে বেশি তৃপ্তি যে তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ধরেছিলেন ঠিকই। এসব জিনিসকে বাহাত্তুরে বুড়োর খামখেয়ালী বলে উড়িয়ে দিলেই তো হল না! জন্তুজানোয়াররা পর্যন্ত বিপদের গন্ধ টের পায়। চিরাচরিত আচার-ব্যবহারগুলো

আইনের ধারার মতো জিনিস। মেনে চলতে হবে। সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে তার মানে করতে হবে। লোকাচার যেখানে বলছে—এই করতে হবে, সেখানে তা না করলে কী হবে, সে কথাটা বোঝবার জন্য বি এ, এম এ, পাস করার দরকার নেই। ওসব আচারের পান থেকে চুন খসলে কী হয়, সেটা খেয়াল হওয়া উচিত ছিল একজন সাতষট্টি বছর বয়সের সধবা স্ত্রীলোকের! হয়তো খেয়াল হয়েছিল ঠিকই। জেনেশুনে যদি সৃষ্টিধরের মা এই কাজ করে থাকেন, তাহলে সে কথার কোনো জবাব নেই। মা-ছেলেতে মিলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে যদি এই কাজ করে থাকে তাহলে তাদের কিছু বলবার নেই··· সৃষ্টিধরের মায়ের এই কাণ্ড! বহু নিমকহারাম তিনি সারাজীবন ধরে দেখছেন। বিপদের সময় এসে টাকা ধার নেয়; তারপর তামাতুলসী হাতে নিয়ে হাকিমের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, তারা টাকা ধার নেয়নি। এই তো লোকের ধারা! কিন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মতো অকৃতজ্ঞ লোকের কথা তিনি এর আগে কল্পনা করতে পারেননি। বিশ্বাস তিনি কোনোদিনই কাউকে করেন না। টিপসই না নিয়ে তাঁর অতি বড় বন্ধুকেও টাকা ধার দেননি। তবু এতটা আশা করেননি নিজের স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে। যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন তাদের কাছ থেকে।

মেয়েমানুষেরা সব বুজরুক! সুবিধা পেলেই নিজমূর্তি প্রকাশ করে। ভেবে ভেবে তিনি দেখেছেন স্ত্রীর স্বভাবের পরিবর্তনের দিকটা। অল্প বয়সে স্বামীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। সেকালকার কথা সব মনে আছে। বড় করে কথা বলবার সাহস ছিল না স্বামীর সম্মুখে। ছেলেরা বড় হবার পর থেকেই তিনি প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন সৃষ্টিধরের মায়ের। বাপ যতই করুক ছেলেদের জন্য, তারা সব সময় মায়ের দিকে। মায়েরা সেটা বেশ বোঝে। তাই যত ছেলেরা বড় হয়, তত তাদের বুকের পাটা বাড়ে। শেষে স্বামীকে 'ডোণ্টকেয়ার'। ছেলেরা বড় হবার পর থেকে সত্যিই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলেন। কিন্তু এতটা! ঘেন্না ধরে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলের উপর! সবাই মিলে পরামর্শ করে এই কাণ্ড করেছে। ওই নরেন ডাক্তারটাও এর মধ্যে আছে। ডাক্তার না ছাই! ইনসিওরের ডাক্তার আবার ডাক্তার নাকি! তার আবার ওষুধ, তার আবার চিকিৎসা! মা-ছেলেতে পরামর্শ করে তাঁর কাঁধেও চাপিয়েছে নরেন ডাক্তারকে। কথা বলাও নাকি তাঁর পক্ষে খারাপ। তাই একটা কলিংবেল রাখা হয়েছিল তার কথা মতো তাঁর বালিশের কাছে। কোনো দরকার পড়লে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকতে হবে? কেন বাড়ির লোকজন কেউ-না-কেউ চব্বিশ ঘণ্টা

বসে থাকতে পারে না রোগীর পাশে ? আর যেখানে বাড়ির কর্তা নিজে রুগী ! টান মেরে ছুঁড়ে তিনি ফেলে দিয়েছেন কলিংবেলটাকে সেই দিনই। ভাবে কি বাড়ির লোকে তাঁকে ! যতটা বেকুফ ভাবে, ততটা বেকুফ তিনি নন ! সৃষ্টিধরের মা ছুটে এসেছিলেন কলিংবেল মেঝেতে পড়বার শব্দটা শুনে।

'কিছু বলছ ? কিছু এনে দেব ?'

স্ত্রী আসতেই কেমন যেন শক্ত আড়ষ্ট গোছের হয়ে গিয়েছিল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর। কোনো উত্তর দেননি তিনি। অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে, বালিশের পাশে এসে বসেছিলেন; তিনি জানেন রোগভোগ হলে ছেলেমানুষী রাগ বাড়ে সব মানুষেরই। সেই দিন থেকেই শ্রীদামবাবু লক্ষ্য করলেন যে সৃষ্টিধরের মা কাছে এসে বসলেই তাঁর শরীরে আড়ষ্টতা আসে। আগেকার সেই সহজ ভাবটা আর কিছুতেই আনতে পারেন না। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কটা যে অমূলক ছিল না, সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে হাতেনাতে; মৃত্যুর পূর্বস্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছেন; ঠিক যখন সৃষ্টিধরের মা সিঁথির সিঁদুর মুছে ছেলের আনা মেটে সিঁদুর সিঁথিতে দিয়েছেন, তখনই 'করোনারি' রোগটা তাঁকে চেপে ধরে; এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোনো সন্দেহ নেই। যতই চেষ্টা করুন সেই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে খানিকটা আড়ষ্টতা আসতে বাধ্য। আর এ-রকম স্ত্রীপুত্রকে খাতির করে চলবার কোনো কারণও থাকতে পারে না! তাঁর অসুখ ও সৃষ্টিধরের মায়ের আসল-সিঁদুর মোছার মধ্যে সম্পর্কটা সবচেয়ে নির্বুদ্ধি লোকেরও নজরে পড়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে আর ডেকে তুলবে কী করে! ওরা সব জানে! সব বোঝে! বুঝে না বোঝবার ভান দেখায়! রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে তাঁর।

শ্রীদামবাবু সব সময় চেষ্টা করেন যাতে তাঁর মনের রাগ কথাবার্তায় প্রকাশ না পায়। ফলে অধিকাংশ সময়েই তিনি চুপ করে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। স্ত্রীপুত্ররা তাঁর এই গাম্ভীর্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও বর্তমান রোগের একটা লক্ষণ বলে ভাবে। রুগীর মন ভাল রাখবার জন্য তারা সব সময় অনর্গল গল্প করে যান। নবেন ডাক্তারের সঙ্গে যাতে তিনি কোনো রকম অসদ্‌-ব্যবহার না করেন, সেই ভেবে সৃষ্টিধর আর সৃষ্টিধরের মা অনেক সময়ই 'অ্যালার্জি' রোগের গল্প এবং নবেন ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তোলেন। বিচিত্র মাতগতি এ রোগের! ওষুধও না বিষুধও না! লাল সিঁদুর মুছে মেটে সিঁদুর দিলাম সিঁথিতে—আর তাতেই সেরে গেল এতকালকার রোগ। এখন মনে হয় কেন পুরে রেখেছিলাম এ রোগ? এত

সোজা যার চিকিৎসা! শোনেন, আর মাথা থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত রিরি করে ওঠে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা যায় কিন্তু কান তো বন্ধ করে রাখা যায় না ইচ্ছা করলেও। শুনতেই হয় বাধ্য হয়ে। কেবল নিজের রোগের কথা! কই, স্বামীর যে ভয়ানক রোগটাকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলল এ কয়দিন, সে কথা তো ভুলেও বলে না!…

মনখারাপ হতে পারে ভেবে স্ত্রীপুত্ররা তাঁর রোগের কথাটা তোলে না, এ কথা তাঁর খেয়াল হয় না। কেবলই মনে হয় যে স্ত্রীপুত্র যখন শুধু নিজের দিকটা দেখতে পেরেছে, তখন তাঁরও নিজের দিকটা দেখতে পারবার অধিকার আছে। পালটা জবাব তিনিই বা দেবেন না কেন! যেতে দাও না আর কয়েকটা দিন!…মনে মনে তিনি একটা দিন ঠিক করে নিয়েছেন। যেদিন তাঁর রোগের দুই সপ্তাহ পুরবে, সেই দিনই তিনি নিজ মূর্তি প্রকাশ করবেন এদের কাছে।…কুকুর বিড়ালের মতো ব্যবহার করেছে এরা তাঁর সঙ্গে! ভাবছে যে 'ফিডিং বটল্'-এ করে জলো মাখন তোলা দুধ খাওয়াচ্ছে রুগীকে—আর তাতেই ভবী ভুলবে! ভুলে গিয়েছে যে কুকুরে ফিরে কামড়াতেও জানে। করতে তো তিনি পারেন কত কিছু, নিজের অধিকারের মধ্যে থেকেও। নিজের রক্ত-জল-করা পয়সা—বাপের কাছ থেকে পাওয়া এক পয়সাও নয়—এগুলোকে তিনি যথেচ্ছ দান করে দিয়ে যেতে পারেন—কারও কিছু বলবার নেই। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোর্টে নালিশ করতে পারেন। আবার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারেন, এই বুড়ো বয়সেও। কিন্তু অতদূর তিনি যেতে চান না! অন্যের চোখে ছোট হতে হয় এমন কাজ তিনি করতে চান না—অধিকার থাকলেও। এরা তাঁর কাছে ন্যায় বিচারই পাবে। নিক্তিতে ওজন করে তিনি ন্যায় বিচার করবেন স্বার্থপর, নাচুনে, হুজুগে-মাতা, নিমকহারাম স্ত্রী-পুত্রদের উপর! তিনি যার উপর যতই বিরক্ত থাকুন, তার জন্য কাউকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। অত নীচ তার মন নয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ওরাও যেন ভাববার অবকাশ না পায় যে ওদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। হিসাব করে হাতে-কলমে ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে ওরা প্রত্যেকে তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছে। বিষয়টা অতি সরল। 'অ্যাকাউন্ট স্যুট'-এর মতো শুধু হিসাবনিকাশের ব্যাপার!…

পনের দিনের দিন সকালবেলায় উঠেই তিনি বাড়ির চাকরকে ডাকলেন চিৎকার করে। স্ত্রী জপে বসেছিলেন। উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী? কেন?'

চাকরটাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীদামবাবু তাকে বললেন, দেওয়ালের খানকয়েক ছবি নামিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে। সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো সোনার জলে লেখা 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্মঃ' শ্লোকটা, আর গ্রুপ ফটোখানা তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, ছেলেমেয়েরা দোরগোড়া থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রুগীর আবদার রাখতে সকলে উদ্‌গ্রীব! যাতে তাঁর মন ভাল থাকে। তাই তিনি করুন। নরেন ডাক্তার বলে দিয়েছে, এমন কিছু যেন করা না হয়, যাতে রুগীর উদ্‌বেগ দুশ্চিন্তা বাড়ে।

এইবার তিনি ছাতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একবার যেন কম্পাউণ্ডার বাবুকে খবর দেওয়া হয়। আর নরেনবাবুকে যেন বারণ করে দেওয়া হয় আমাকে দেখবার জন্য আসতে।'

গলার স্বরে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এনে বলা। বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে রাশ নিজের হাতে নিলেন। যতই রুগ্ন ভাবুক এরা তাঁকে, নিজের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে এখনও নিজের বাড়িতে নিজের মতো থাকবার অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ তিনি আর বরদাস্ত করবেন না।

ইচ্ছা করে অতিরিক্ত খাতির দেখিয়ে, নরেন না বলে নরেনবাবু বলেছেন তিনি। কথার সুর এবং চাউনির ভঙ্গি সৃষ্টিধরের মা'র কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকল। ছেলের সঙ্গে তিনি গিয়ে পরামর্শ করলেন। নরেন ডাক্তারকে তখনই সব কথা বুঝিয়ে বলা হল। সে ঘরের ছেলের মতো; তার কাছে বাড়ির কথা বলতে কোনো সংকোচ নেই। ঠিক হল সে নিয়মিত আসবে শ্রীদামবাবুর বাড়ি, কিন্তু রুগীর ঘরে ঢুকবে না। রুগীর মন খুশী রাখবার জন্য কম্পাউণ্ডারবাবুই দেখুন। দরকার বুঝলে এবং কম্পাউণ্ডারবাবু তার কথা শুনলে, সে বাইরে থেকে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে। সে সৃষ্টিধরের মাকে বলে দিল এখন থেকে রুগীকে একটু চোখে চোখে রাখতে।

এইবার শ্রীদামবাবু এক নাতির নাম ধরে ডাকলেন। সৃষ্টিধর গিয়ে দাঁড়াল কাছে।

'বাবা, কিছু বলছেন?'

অন্যদিকে তাকিয়ে শ্রীদামবাবু বললেন, 'নিচের ঘরের আলমারি থেকে পুরনো হিসাবের খাতাগুলো নিয়ে আসা দরকার একবার।'

'এখন কিছুদিন যেতে দিন না ওসব জিনিস! আগে ভাল করে সুস্থ হয়ে নিন। তারপর ওসব আবার করবেন।'

'যার আনবার ইচ্ছা নেই তাকে তো আমি ডাকিনি।'

'কোন কোন বছরের আনব ?'

'যতগুলো আছে সবগুলো। আর একটা পেনসিল।'

মা-ছেলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এইসব করে আবার অসুখ বাড়িয়ে না ফেলেন বাড়ির কর্তা।

একরাশ খাতাপত্র এল নিচে থেকে।— চাকরের কাঁধে করে উপরে আনিয়েছে স্মৃষ্টিধর! —নিজে আনতে বাধে। বাপের পয়সায় ফুটানি। ধুলো আর মাকড়সার জাল ঝেড়ে আনতে হয় সে কথাটাও কি এদের বলে দিতে হবে।—

স্মৃষ্টিধর হাসিমুখে একটা সুখবর দিল বাবাকে। মানহানির মোকদ্দমায় তিনি জিতেছেন; হাকিমের রায় বেরিয়েছে; ব্যারিস্টারসাহেবের এক টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে; অর্থদণ্ডের পরিমানটার কোনো গুরুত্ব নেই; আসল প্রশ্ন হারজিতের।

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না শ্রীদামবাবু। মানহানির মোকদ্দমার ফলাফলের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

তিনি ভাবছেন যে ছেলে খোশামোদ করে তাঁর মন গলাতে চায়। পুরনো হিসাবের খাতাগুলো আনাতে দেখে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে। যাক! করে থাকলে করেছে! আপনার লোক সব! আত্মীয়-স্বজন না ছাই! 'কলিং বেল' দেখাতে এসেছিল আমাকে আমারই পয়সায়। ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে পুজো করতে হবে, তবে এঁদের আবির্ভাব হবে!— তাঁকে যদি মাখনতোলা দুধ খেয়ে থাকতে হয় সারাজীবন!— গম্ভীরভাবে তিনি কাগজ পেনসিল হিসাবের খাতা বালিশের উপর নিয়ে, চোখে চশমা এঁটে বসলেন। তাঁর প্রতিদিনকার আয়ব্যয়ের হিসাব লেখা অছে এইসব খাতাগুলোতে। সেই হিসাবগুলো থেকে বেছে বেছে কী যেন সব টুকে রাখছেন কাগজে।

কম্পাউণ্ডারবাবু আসায় বাধা পড়ল। ইনি নরেন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার নয়। একসময় কোথায় যেন কম্পাউণ্ডারি করতেন; এখন স্বাধীন হাতুড়ে ডাক্তার। এসেই প্রথমে জেনে নিলেন, রুগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন কিনা।— যদি সুস্থ বোধ করেন, আর হজম যদি হয়, তবে যা ইচ্ছা খেতে পাবেন। কী খেতে ইচ্ছা করছে? লুচি?—

নিজে সম্মুখে বসে, লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে তবে তিনি গেলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা স্মৃষ্টিধরের মায়েরও মনঃপূত। কম্পাউণ্ডারবাবু চলে যাবার সময় রুগী তাঁকে বলে দিলেন উকিলবাবুকে একটা খবর দিয়ে দিতে। বিকালের দিকে আসবার জন্য। উইল লেখাতে হবে তাঁকে দিয়ে। বাড়ির লোকদের

দিয়ে উকিলবাবুকে ডাকতে ভরসা পান না তিনি। আসবার আগে উকিলবাবু যেন আইনের ধারাগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

'উইল ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উইল। অত চোখ বড় বড় করছেন কেন উইল শুনে ? কাজটা করতে না পারেন তো বলুন পরিষ্কার করে।'

'না না। আমি উকিলবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি এখনই।'

সেখান থেকে পালাতে পেরে বাঁচলেন কম্পাউণ্ডারবাবু।

স্বষ্টিধরের মা নিজে হাতে রেঁধে সেদিন পলতার বড়া, লুচি, আর ছানার ডালনা স্বামীকে খাওয়ালেন। কর্তা খেলেন ; খেতে ভালও লাগল ; কিন্তু ভাব দেখালেন যেন শুধু কর্তব্যের খাতিরে খাচ্ছেন। খাওয়াদাওয়ার পর অন্যদিন একটু ঘুমোন। আজ সে ফুরসত নেই। সারাদিন চলল এই হিসাবপত্র লেখাপড়ার কাজ।

একটাও কথা বলেননি। এক শুধু তিনটে-চারটের সময় একবার চাকরকে ডেকেছিলেন, স্বষ্টিধর সেই ঘরে বসে থাকা সত্ত্বেও। চাকরকে হুকুম দিয়েছিলেন—ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল ও একখানা চেয়ার এনে রাখতে। বাড়ির লোকে বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তাঁর রকমসকম দেখে। রুগীর সব খবর খুঁটিয়ে বলবার জন্য স্বষ্টিধর নরেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। স্বষ্টিধরের মা গিয়ে বসেছিলেন বালিশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে। অমনি রুগীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি শুলেন না। আড়ষ্ট হয়ে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসে থাকলেন অন্য দিকে তাকিয়ে। মরে গেলেও তিনি স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না, এই তাঁর সংকল্প।

'দাদু। উকিলবাবু এসেছেন।'

ছোট নাতি দোরগোড়া থেকে সংবাদ দিল। নিজের অজ্ঞাতে স্বষ্টিধরের মা মাথার কাপড় টেনে দিলেন, খাট থেকে ধড়মড় করে নামবার আগে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হঠাৎ নজরে পড়ে গেল শ্রীদামবাবুর ; কিসের মতো যেন রঙ সিঁথির সিঁদুরটার ? ঠিক মনে পড়ছে না। পচা মাংসের মতো কিংবা বুড়ো শকুনের ঘাড়ের ঝুঁটিটার মতো। দেখলে গা ঘিনঘিন করে। শিউরেও ওঠে সর্বশরীর। মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা অবশের মতো হয়ে যায়। বালিশে হেলান দিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন যাতে স্বষ্টিধরের মা বুঝতে পারেন যে, স্বামী ইচ্ছা করে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

'উকিলবাবু ! এই রোগভোগের মধ্যে আবার উকিলবাবুকে দিয়ে কী হবে ? না না, বারণ করে দিগে যা ! যা বলবার স্বষ্টিধরকে তুমি ভাল করে

বুঝিয়ে দাও! কাছারির মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তো সে কথাও ছেলেদের কাউকে বলো না কেন!'

অধিকার ফলাতে এসেছে সৃষ্টিধরের মা! স্ত্রীর কথায় কান দিয়ে নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেবিলের উপর কাগজ-কলম সব ঠিক আছে তো? আর একখান বড় দেখে বইটই গোছের কিছু রাখতে বলেছিলাম না? আছে সব ঠিক? তাহলে এবার উকিলবাবুকে আসতে বলে দাও।'

সৃষ্টিধরের মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। উকিলবাবুর সঙ্গে নিচে নরেন ডাক্তারের দেখা হয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন রুগীকে যেন বেশি কথা বলান না হয়। 'এই যে!'

'নমস্কার! মোকদ্দমাটাতে তো আমাদের জিত হয়েছে।'

নাতির সঙ্গে উকিলবাবু ঢুকেছেন ঘরে। এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, সে কথা বোঝবার বয়স এখনও ছেলেটির হয়নি। কিংবা হয়তো বাড়ির লোকরা তাকে এখানে থাকতে বলেছে, যদি ফাইফরমাশের জন্য দরকার হয় সে কথা ভেবে।

শ্রীদামবাবু নাতিকে চলে যেতে বললেন ঘর থেকে। 'উকিলবাবু দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন। কম্পাউণ্ডারবাবু নিশ্চয়ই সব কথা বলেছেন আপনাকে। আমি উইল করতে চাই।'

প্রথমেই কাজের কথা পেড়েছেন; মোকদ্দমায় হার-জিত নিয়ে বাজে কথা বলবার সময় নেই তাঁর এখন! উকিলবাবু বুঝে গিয়েছেন তাঁর মনের ভাব। কর্মতৎপরতা দেখাবার জন্য কাগজে খসখস করে উইল লিখবার বাঁধা গৎ এক লাইন লিখলেন।

'ও কী লিখলেন, আমি না বলতেই?'

'লিখলাম, ইহাই আমার শেষ উইল।'

বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেল বৃদ্ধের চোখমুখে।

'না! আপনি একটা একেবারে—! এখন তো একটা মোটামুটি খসড়া লিখতে হবে শুধু। টাইপ করতে হবে, দুজন সাক্ষীর দরকার হবে, রেজিষ্টার-সাহেবকে আসবার জন্য খবর দিতে হবে—সেসব এখন কোথায়? এখন শুধু নোট করে দিন মোটামুটি। আমি পয়েন্ট দিচ্ছি। দশ টাকা দেব আপনাকে, বুঝলেন? লিখুন! আমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সৃষ্টিধরের বয়স সর্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য সে সর্বাপেক্ষা বেশিদিন আমার অন্ন ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। হ্যাঁ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যবহারে কথাটাও লিখে দেবেন। তাহার বয়স আজ সাতচল্লিশ বৎসর সাত মাস পাঁচ দিন।

উকিলবাবু, পরে এই দিনটা ঠিক করে বসিয়ে নেবেন। ইহার ভিতর বিশ বৎসর পিতা হিসাবে আমি তাহাকে লালনপালন করিতে বাধ্য। উকিলবাবু, এটাকে বিশের জায়গায় বাইশ বছর করে দেওয়া যাক—কী বলেন ? অন্যায় অবিচার আমি কারও উপর করতে চাই না, বুঝলেন। সৃষ্টিধরের যা প্রাপ্য, তার থেকে এই পঁচিশ বছর পাঁচ মাস সাত দিনের খাইখরচা বাবদ পনর হাজার টাকা বাদ যাবে ! ওর বিবাহ হয়েছে চব্বিশ বছর হল। স্ত্রীর খাইখরচ বাবদ চৌদ্দ হাজার চারশ টাকা। ওদের বড় ছেলের কলেজে পড়া ও খাইখরচ বাবদ চৌদ্দ হাজার টাকা। ওদের বড় মেয়ের খাইখরচ ও বিবাহাদি বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা। ওদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের খরচ বাবদ সাতাশ হাজার টাকা। বউমার ভাওয়ালী স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসা বাবদ ছয় হাজার টাকা। সব মিলিয়ে হল এক লক্ষ এক হাজার ছয়শ টাকা। এই টাকাটা ওর প্রাপ্য টাকা থেকে বাদ দিতে হবে। আর আমারও কিছু দেনা আছে সৃষ্টিধরের কাছে। এই মাসের ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য নরেন ডাক্তারের ফি বারো টাকা। নরেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওর মায়ের মেটে-সিঁদুরের দরুন ছয় আনা। কোর্টে জ্বর আসায় আমাকে একদিন ও ওর ইন্সিওর কোম্পানির দেওয়া গাড়িতে বাড়ি নিয়ে এসেছিল—তার দরুন গাড়িভাড়া দুই টাকা। মোট এই চৌদ্দ টাকা ছয় আনা আমার দেনা ওর কাছে। এটা যেন ওকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এ তো হল। এইবার আমার স্ত্রীরটা লিখে নিন। মাসে ষাট টাকা করে পান এইরকম একটা অ্যানুইটির ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয় তাঁর জন্য। এতেই ওঁর চলে যাওয়া উচিত, কী বলেন ? আচ্ছা না-হয় মেটে-সিঁদুর বাবদ ছয় আনা করে আরও বেশি লিখে রাখুন। ষাট টাকা ছয় আনা করে উনি মাসহারা পাবেন।'

এতক্ষণে উকিলবাবু কথা বলেন, 'ওঁর তখন তো সিঁদুর লাগবে না।'

চটে উঠেছেন শ্রীদামবাবু, 'আপনার উপদেশ আমি চাইনি। যা বলছি তাই লিখুন। আমি সিঁদুর বলিনি, মেটে-সিঁদুর বলেছি। সিঁদুর আর মেটে-সিঁদুর এক জিনিস নয়। মেটে-সিঁদুর ইচ্ছা করলে বিধবারাও ব্যবহার করতে পারেন। বিধবা হবার চেষ্টাতেও সধবারা ব্যবহার করতে পারেন—নিজেদের স্বার্থ থাকলে ! আসল সিঁদুর ব্যবহার করলে তো কোনো কথাই ছিল না।'

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন শ্রীদামবাবু কথাগুলো বলতে বলতে। বারান্দার জানলার পাশে খুট করে একটা শব্দ হল। উকিলবাবু তাকালেন সেদিকে। বোধ হয় বাড়ির লোকেরা আড়ি পেতে শুনছে।

'দেখুন উকিলবাবু, বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে এত সব কথা বলে। জলের গ্লাসটা দেবেন তো ওখান থেকে। ঘিয়ের জিনিস খেলেই বড় জলতেষ্টা পায়।'

'আচ্ছা থাক এখন তবে। অন্য সময় আসব আবার।'

'সেই ভাল। আচ্ছা, এই কাগজখানা রাখুন। আমার প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের আলাদা আলাদা হিসাব লেখা আছে এতে। আর উলটো পিঠে আমার সম্পত্তির তালিকা নোট করা আছে। বুঝেই তো গেলেন আমি কেমন ভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাই। কালকে এই অনুযায়ী একটা মোটামুটি খসড়া লিখে আনবেন আপনি। তারপর দেখা যাবে।'

দুমদুম করে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ হল। উকিলবাবু কাগজপত্র ফাইলে বেঁধে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন।

সৃষ্টিধরের মা।

বাড়ির অন্য লোকেরা দরজা ধাক্কা দেওয়া থেকে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়ির মেয়েদের দেখে উকিলবাবু একটু পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ালেন। হেঁপো রুগীর ছিপছিপে গড়ন সৃষ্টিধরের মায়ের। ছুটে গিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টগোছের হয়ে গেল শ্রীদামবাবুর সর্বশরীর।

'এ তুমি কী বলছ! ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাই যে এতে তোমার আপত্তি, তাহলে কি আমি মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করি।'

আড়িপাতার জন্য কোনোরকম সংকোচ নাই; উইলে কম টাকা পাবার জন্য অনুযোগ নাই, কেবল আছে মেটে-সিঁদুর ব্যবহার করবার জন্য অনুতাপ। এ জিনিস শ্রীদামবাবুর নজর এড়ায় না। কিন্তু এ অনুতাপ পর্যাপ্ত নয়। অনুতাপের কারণ বলছেন, স্বামীর আপত্তির কথা টের পাননি বলে। কিন্তু এ তো শুধু স্বামীর আপত্তির কথা নয়; স্বামীর মারাত্মক অমঙ্গলের আশঙ্কা সত্ত্বেও স্বার্থত্যাগ না করবার জন্য অনুশোচনা হওয়া উচিত ছিল। তবু এতে মনের ক্ষোভ খানিকটা কমে; প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাটা নরম হয়ে আসে। যেখানে আগে সাবিত্রী-সত্যবানের ছবিটা ছিল সেইখানটাতে তাকিয়ে রয়েছেন শ্রীদামবাবু। বাড়ির সকলেই এসে জুটেছে এই ঘরে; কিন্তু কারও সাহস নাই এর মধ্যে কোনো কথা বলবার। উকিলবাবু চলে যাবার সময় নিচের ঘরে নরেন ডাক্তারকে রুগীর আধুনিকতম সংবাদ দিয়ে গেলেন।

সৃষ্টিধরের মা অঝোরে কেঁদে চলেছেন, 'ওগো তুমি একবার বললে না কেন মুখ ফুটে। আমরা কতটুকু কী বুঝি! পোড়াকপাল, নইলে এই দুর্বুদ্ধি হয়।'

স্ত্রী কী বলছেন, সেটা সম্বন্ধে রুগীর ঔদাসীন্য ক্রমেই কমছে। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা আস্তে আস্তে কাটছে। ক্ষোভের স্থান নিচ্ছে অভিমান।

'কী কুক্ষণে যে সেদিন নরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! তুমি বলে দিতে যাবে কেন। আমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। নরেনের কথা শুনে আমার নেচে ওঠা উচিত হয়নি। কপাল! আমি মুখ্যু মানুষ। ভুলে কী করে ফেলেছি। সে কথা কি মনে গিঁট দিয়ে রেখে দিতে হয় চিরকাল?'

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না শ্রীদামবাবু।

'এ আমার মনে রাখবার বা ভুলে যাবার কথা নয়। এ হচ্ছে আমার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল; তাতেও তোমাদের নজরে পড়ল না? যখনই তুমি আসল সিঁদুর ছেড়ে নকল সিঁদুর দিলে সিঁথিতে, তখনই যে আমার হার্টের ব্যপাটা হয়েছিল, এ কথা আমি লাঠি মেরে তোমার গোবরভরা মাথায় ঢুকিয়ে দেব, তবে বুঝবে?' এতক্ষণে তিনি তাঁর সংকল্প ভুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছেন। দুঃখে, ব্যথায়, অভিমানে বৃদ্ধের চোখে জল এসে গিয়েছে। মানসিক উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। শ্বশুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেন এক পুত্রবধূ। বড়ছেলে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন সৃষ্টিধরের মা। এত অপ্রস্তুত তিনি জীবনে কখনও হননি এর আগে।

—স্বামীর অমঙ্গলের জন্য দায়ী তিনি? নিজের কপাল নিজের হাতে পোড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। এ-যাত্রা বুড়োশিব রক্ষা করেছেন! তাঁর ভুল শোধরাবার জন্য সময় দিয়েছেন! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হল যে আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত না। প্রতি মুহূর্তের দাম আছে এখন।—'আমি এখনই এ সিঁদুর মুছে সিঁথিতে আসল সিঁদুর দিয়ে আসছি।'

ছুটে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধা ঘর থেকে। পিছনে পিছনে বড়বউমাও গেলেন বোধ হয় শাশুড়ীকে সাহায্য করবার জন্য।

ঘটনার এই তীব্র গতিবেগ বোধ হয় শ্রীদামবাবুরও প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন দরজার দিকে; অথচ বোঝা যাচ্ছে যে কিছু দেখছেন না। হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল সে চাউনিতে। তাঁরও খেয়াল হয়েছে একটা কথা। এত রকমের কথা চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ভাবেন, কিন্তু এ দিকটার কথা তিনি এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত ভাবেননি।—সংকট-মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি চোখের সম্মুখে। সাদা চুলের মধ্যে টাকপড়া সিঁথি।—বড়বউমা একখানা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে

সেই চরম মুহূর্তকে এগিয়ে আনছেন!—ঠিক যে মুহূর্তে মেটে-সিঁদুরের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে সিঁথিটা একেবারে সাদা হয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে!— সেই মুহূর্ত আর সিঁথিতে আসল সিঁদুর দেবার সময়ের মধ্যে যে ক্ষণিকের ব্যবধান সেইটেই তাঁর সংকট-মুহূর্তটার জন্য ওত পেতে রয়েছে আড়ালে শত্রু; নিঃশব্দ সঞ্চারে অন্ধকারের মধ্যে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে! আর নিস্তার নাই! ইচ্ছা হল চিৎকার করে ডেকে সৃষ্টিধরের মাকে এখনও একবার বারণ করেন। পারলেন না।—বুঝল না সৃষ্টিধরের মা যে এরকম একটা ব্যাপারে ভাববার জন্য একটু সময় পাওয়ার দরকার ছিল।—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন তিনি। সর্বশরীরে আতঙ্কের সাড়া লেগেছে! মেজবউমা পাখা করছেন জোরে জোরে। তবু বড় গরম লাগছে।—সমস্ত শরীরের মধ্যে আনচান করছে কেমন যেন একটা অস্বস্তি! এই বুঝি বড়বউমা নেকড়া ভিজাল?— এই—এই বুঝি! বুকের কাছটায়—

ভাবলেন আঙুল দিয়ে দেখাবেন বুকের দিকে। হাত তুলতে পারলেন না।—তাহলে—

ভয় পেয়েছে সকলে। মুখচোখের ভাব দেখে ভয় পেয়েছে সৃষ্টিধর।

নরেন! নরেন! শিগগির!—আর তুই যা দৌড়ে! অক্সিজেনের যন্ত্রটা পাশের ঘরে আছে। ভিড় কোরো না এখানে! জোরে পাখা করো! জানলা-দরজাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও!

বাবা! বাবা! কোথায় কষ্ট হচ্ছে? বাবা! ও বাবা!

বাবার বুকের উপর হাত রাখল সৃষ্টিধর।

## অভিজ্ঞতা

তামাকের আমেজ জমে এসেছে। স্ত্রীর হাতে হুঁকোটা দিয়ে এইবার দিবানিদ্রার যোগাড় করবেন থানার দারোগা শ্রীরামভরোসা প্রসাদ। হাই উঠেছে, তুড়ি পড়েছে; শুনে স্ত্রী দাঁড়িয়েছেন; সব ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক চলেছে।

'দারোগাজী!'

মৃদু কুণ্ঠিত গলার স্বর বিরিঞ্চি সিং কনস্টেবলের। বাইরে থেকে ডাকছে, অতি অনিচ্ছা ও দ্বিধার সঙ্গে।

কণ্ঠস্বরের এই দ্বিধাটুকু থেকেই দারোগাজী বুঝে গিয়েছেন কেন ডাকছে। জেলা সদর থেকে কোনো হাকিম এলেও, থানার কনস্টেবল তাঁর 'কোয়ার্টার'-এ তাঁকে ডাকতে আসত ঠিকই; কিন্তু সে ডাক এমন মৃদু কুণ্ঠাজড়িত হত না। আসত ছুটতে ছুটতে, হাঁফাতে হাঁফাতে। উর্দি পরে বার হবার জরুরী তলব—চাপা গলায় অথচ জোরে জোরে—লাউডস্পীকারে চুপিচুপি কথা বললে যেমন শোনায় সেই রকম। সে ডাক সব দারোগার জানা—সাবেক কাল থেকে চলে আসছে, সব থানায়, সব দারোগার বেলায়। কিন্তু এখনকার এই বিরিঞ্চি সিং-এর ডাক হচ্ছে একেবারে অন্য জিনিস; মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত, এ স্বরের ডাক, তাঁকে কখনও শুনতে হয়নি জীবনে। কোনো কনস্টেবলের সাহস হয়নি কখনও রামভরোসা দারোগার ঘুমের ব্যাঘাত করতে। যখন যেখানে বদলি হয়েছেন, সেখানেই এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গিয়েছে। আজ সে নিয়ম বদলেছে। তিনি কাউকে বলে দেননি; তবু সবাই জানে যে আগেকার নিয়ম আজ আর নেই।

পুরনো দিনের কথা মনে করেই বিরিঞ্চি সিং-এর এই কুণ্ঠা। হৃতরাজ্য রাজাকে সম্মান দেখাচ্ছে বিশ্বস্ত অনুচর।

'কে? বিরিঞ্চি সিং?'

'হুজুর!'

'কী ব্যাপার?'

'খুনের কেস হুজুর। গ্রামের লোক খবর এনেছে।'

'আচ্ছা চল—যাচ্ছি।'

হুঁকোতে টান মারা বন্ধ না করে, বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, ঘুম তাঁর মাটি হল ঠিকই, তবে এমন একটা কিছু ব্যাপার না যার জন্যে তাঁকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে থানার অফিস ঘরে যেতে হবে এই মুহূর্তে।

এইসব সময়ে সান্ত্বনা স্ত্রীর নীরব সহানুভূতিটুকু। চিরকাল ভদ্রমহিলা এ-রকম নীরব ছিলেন না। স্বামীর কথার মিষ্টি করে পাল্টা জবাব তিনি চিরদিন দিয়ে এসেছেন। খেতে বসে চাকরে জীবনের খুঁটিনাটি স্ত্রীর কাছে গল্প করা দারোগাজীর অভ্যাস। ঘুষ নেন না বলে ডিপার্টমেণ্টে তাঁর কত নাম, উপরওয়ালা তাঁকে কত খাতির করেন, এই সব কথাই ছিল গল্পের বিষয়বস্তু। গৃহিণীর এসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, একুশ বছর ধরে প্রত্যহ শুনতে শুনতে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতেন বিরক্ত হয়ে, 'আচ্ছা, এত তো তোমার খাতির, তবে তোমাকে ইন্সপেক্টর করে না কেন?'

নিজের চাকরে জীবনের সততার বড়াই তখনকার মতো বন্ধ হত ; কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে-সে।

কিংবা হয়তো কোনোদিন দারোগাজী বললেন, 'ঘুষ না নেওয়ার জন্য আর্থিক সাচ্ছল্য আমার কোনদিনও হবে না ; কিন্তু এত বড় থানার এলাকার মধ্যে তো আমি রাজা। এখানে দারোগাজীর সম্মুখে সব বাছাধনকে মাথা নোয়াতেই হবে, সে তুমি যে-ই হও না কেন!'

'আচ্ছা, এইবার রাজরানী চলল বাসন মাজতে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।'

ওই রকম চলত থানার রাজা-রানীতে। কিন্তু দেড় মাস থেকে গল্পের ধারা গিয়েছে একেবারে বদলে। দারোগাজী পারলে পরে চুপ করেই থাকতেন। কিন্তু একজন কারও কাছে দুঃখের কথা না বলতে পারলে, বুকের বোঝা হালকা হয় না যে। এখনকার কথাবার্তার ধুয়ো দারোগাগিরির ঝকমারি। দিকদারি ধরে গিয়েছে তাঁর এ চাকরিতে। প্রথম জীবনেই ভুল করে ফেলেছেন এ লাইনে এসে।—হ্যাঁ-কে না করতে পারতে, দিনকে রাত করতে পারতে, উপরওয়ালার অকাজ-কুকাজে সাহায্য করতে পারতে, সে যদি বলে জল উঁচু তুমিও জলকে উঁচু বলতে পারতে, তবে চাকরিতে তোমার সুনাম হত, উন্নতি হত!—চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সাহস যে নেই।—

দারোগাগিন্নী চুপ করে শোনেন। শুনতে শুনতে এক-এক সময় চোখে জল এসে যায় আজকাল।

'ভোখরাহার কেস হুজুর।'

ফিরে যাবার পথে বিরিঞ্চি সিং সতর্কবাণী দিয়ে যাচ্ছে।

ভোখরাহার! চমকে উঠেছেন দারোগাজী। তামাকের ধোঁয়া গলায় লাগল। ভোখরাহা বলল না? কেঁপে উঠেছে বুক রাজরানীর। ওই গ্রামের একটা কাণ্ড নিয়েই থানার রাজা নিজের রাজ্যে ফকিরের অধম হয়ে গিয়েছে দেড় মাস থেকে।

—কে জানে ইনি আবার কে!

ধুতির খুঁট গায়ে দিয়েই দারোগাজী ছুটলেন থানা অফিসে। দারোগা-গিন্নী দেয়ালের মহাবীরজীকে প্রণাম করলেন। আতঙ্ক আসে ভোখরাহা নামটাতে। কে জানে এও আবার সেই রকমই কোনো কিনা। সেদিন তো চাকরি যাব-যাব হয়েছিল। কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছে। ওই যে সেই চাকরির বই থাকে না—তাতে দারোগাজীর নামে কালো দাগ পড়েছে,

ভোখরাহার ব্যাপারটা নিয়ে। জেলার নতুন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটা অস্থি বদ। লোকের চাকরি খাওয়ার জন্য হাঁ করে রয়েছে সব সময়।

স্বামীর কাছে তিনি সব শুনেছেন তো। হেন দিন নেই, যেদিন কারও-না-কারও চাকরি যাচ্ছে। আর মুখ কী খারাপ! থানায় যখন টুর-এ আসে, একেবারে থরহরিকম্প লাগিয়ে দেয়। ছোট নেই বড় নেই, সবার সম্মুখে গালাগালি দেয় থানার দারোগা কনস্টেবলদের।

দারোগাগিন্নীর খাওয়া-দাওয়া মাথায় চড়ল। হুঁকোয় টান মারতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মিনিট পনের বিশ পরে দারোগাজী যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আর তাঁকে প্রশ্ন করতে হল না। নিজ থেকেই বললেন। এখনই তাঁকে বার হতে হবে, নালিশটার সরেজমিনে তদারক করতে; ধড়াচুড়া পরতে যেটুকু দেরি—ভোখবাহার সাঁওতালটোলায়, একটা বাপ ছেলেকে কেটেছে কুড়ুল দিয়ে।

'অন্য কোনো গণ্ডগোল নেই তো এর মধ্যে?'

'মনে তো হচ্ছে না। তবে এখন কে বলতে পারে! কিছু বিশ্বাস নেই আজকালকার পুলিশসাহেবকে।'

সংক্ষেপে কথা। এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ বোধ হয় এ কথার মানে ধরতে পারবে না। নূতন পুলিশসাহেব দারোগাদের কর্মতৎপরতা পরীক্ষা করবার জন্য, নানা রকম ব্যবস্থা করছেন, এই রকম একটা গুজব রটেছে পুলিশমহলে।

—নিশ্চিন্দি আর নেই এই পুলিশসুপাবের জ্বালায়। আগেকার কালে যখন সদর থেকে থানায় আসবার পথঘাট খারাপ ছিল তখন দারোগাগিরি ছিল আরামের চাকরি। আগে থেকে খবর না দিয়ে সাহেবের আসবার উপায় ছিল না। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পিচের রাস্তা, মোটরগাড়ি,—মেমসাহেবকে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বার হবার খরচও গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে নেওয়া যায়, থানা 'ইন্সপেক্শন' করে! এ সাহেবটা আবার কাউকে বিশ্বাস করে না। এর বদ্ধমূল ধারণা যে প্রত্যেকটা দারোগা থানায় বসে বসে মিথ্যে ডায়েরি লেখে—পারতপক্ষে সরেজমিনে যেতে চায় না!

'জয় মহাবীরজী!'

সাইকেল নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বার হলেন রামভরোসা প্রসাদ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাতে খাওয়ার আগে তো ফিরবই; সে আর বলতে!'

বাড়ির আরামটুকুর উপর লোভই তাঁর চাকরিতে কাল হয়েছে। স্নানের

আগে তেল মাখিয়ে তাঁকে আধ ঘণ্টা ডলাই-মলাই পর্যন্ত করে দেন তাঁর স্ত্রী নিজ হাতে। তাঁর সততার কথাটাও যেমন তাঁর ডিপার্টমেন্ট-এর প্রত্যেকের জানা, তেমনি তাঁর আরামপ্রিয়তার কথাটাও।

গত মাসে পুলিশসুপার যখন তাঁর বিরুদ্ধে 'প্রসিডিংস্' এনেছিল, তখন স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, কুঁড়ে লোক সে পছন্দ করে না পুলিশ বিভাগে; তার চেয়ে নিজের কাজটি করে দু'পয়সা ঘুষ খাওয়া অনেক ভাল। পুলিশসুপার অবশ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করে এ মন্তব্য করেনি। তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন উপরওয়ালার কাছে।

—রাত্রিতে খেয়েদেয়ে শুয়েছেন সেদিনও; ভোখরাহা থেকে খবর এল খুন-জখমের 'কেস'-এর। খবর এনেছিল সহদেও সিং - ভোখরাহার পূরণ সিং-এর ছেলে। পূরণ সিং-এর নাম সব দারোগার জানা। এক কালের দাগী আসামী—এখন বলে চাষবাস করে খায়—কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে-কথা। কেননা খরচ অবস্থা অনুপাতে অনেক বেশি; আলাপ-পরিচয়ও চোর-ডাকাতের সঙ্গেই। নানা রকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে, কিন্তু খোলাখুলি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে লোকে ভয় পায়। সেই বুড়ো পূরণ সিং জখম হয়েছে—খবর এনেছিল তার ছেলে। কোথায় কোন গ্রামে একজন দাগী চোর জখম হয়েছে; তার জন্য এই অন্ধকার রাত্রিতে এগার মাইল সাইকেলে যাওয়া—এ জিনিস রামভরোসা দারোগার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেননি—বলে দিয়েছিলেন, পরের দিন যাবেন তদন্ত করতে। পরের দিন ভোখরাহাতে গিয়ে দেখেন যে, পুসিশসাহেব তাঁর আগেই হাজির হয়েছেন সেখানে। সহদেও সিং রাত্রিতেই থানা হয়ে সাহেবের কাছে গিয়েছিল। শুনে সাহেব নিজে ছুটে এসেছে। তাঁকে দেখে সাহেব গ্রামের লোকজনের সম্মুখেই স্বাগত সম্ভাষণ করেছিলেন, 'এতক্ষণে নবাবসাহেবের সময় হল?' তারপর নিজের গাড়িতে করে সংজ্ঞাহীন পূরণ সিংকে নিয়ে গেলেন সদর হাসপাতালে ভরতি করবার জন্য।

এর পরই হয়েছিল দারোগাজীর বিরুদ্ধে 'প্রসিডিংস্'। তখন তিনি জানতে পারেন যে, পূরণ সিং হচ্ছে পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের খাস বহাল করা গুপ্তচর। সব থানায় এ-রকম 'স্পাই' আছে। কী খবর দেয়, কত টাকা পায় সে শুধু জানে পুলিশসাহেব। থানার দারোগা-পুলিশ এদের নাম পর্যন্ত জানতে পারে না। এরা প্রায়ই চোর-ডাকাতদের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা লোক। তবে দারোগা-পুলিশের বিরুদ্ধে খবর কিছু কি আর দেয় না পুলিশ-

সাহেবের কাছে? তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হয় চোর-ডাকাতের কাছেও আজকাল,—কে জানে, কে আবার কিনি!--সাইকেলে যাবার সময় পথের দু'ধারের লোকরা দারোগাজীকে আদাব করছে; তিনি তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেও পারছেন না: এরা সবাই জেনে গিয়েছে যে পুলিশসাহেবের চোখে তাঁর কদর কানাকড়িও না। পূরণ সিং-এর পরিবারের খাতির সদরে দারোগাজীর চেয়েও বেশি। যতই ঢাকতে চেষ্টা করুন, একটা কুণ্ঠার ভাব এসে গিয়েছে তাঁর মনে, ওই পূরণ সিং-এর কাণ্ডটার পর থেকে।

ভোখরাহার কাছাকাছি এসে গেলেন এতক্ষণে। সারাটা পথ পূরণ সিং-এর কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছেন। গ্রামে ঢুকতে হয় রাজপুতটোলার মধ্যে দিয়ে। সাঁওতালটোলা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে—একটা মজা নদীর ধারে। রাজপুতটোলায় বেশ ঘনবসতি। সরু রাস্তার ধারে একটা সরকারী ইঁদারা। ইঁদারার জল পড়ে পড়ে সেখানকার রাস্তায় এক-হাঁটু কাদা-পাঁক জমেছে। এরই এক পাশের সরু শুকনো জায়গাটুকু দিয়ে তিনি সাবধানে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে গেলেন; ইঁদারাটার অন্যদিকে পূরণ সিং-এর বাড়ি। বাড়ির সম্মুখের অপরিসর জায়গাটাতে মাস-দেড়েক আগে—সেই কাণ্ডটার দিন—পুলিশসাহেব মোড়া পেতে বসেছিলেন। ওই জায়গাটাতেই দারোগাজীর মান-ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়েছে।—প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিকে না তাকিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। ভোখরাহাতে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে তাঁর সংকুচিত ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে 'আদাব হুজুর' করতে করতে।—বিদ্রূপ নয় তো?

সাঁওতালটুলিতে একটা বাড়িতে ভিড় দেখে সেখানে নামলেন দারোগাজী। সাঁওতালরা তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিরসা মাঝির বউ চিৎকার করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

'ও দারোগা, দেখ্ একবার কী করেছে। তিন মাসের দুধের ছেলে! আহা রে! কুড়ুল দিয়ে থেঁতলে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কী মেরেছে দেখ্, জানোয়ারটা!'

ঘরদুয়োর ঘুরে ঘুরে দেখলেন দারোগাজী। তকতকে নিকানো উঠান। চৌকিদারের কড়া হুকুমে সব যেখানে যেমন ছিল, তেমনি রাখা আছে। বারান্দায় শিশুর মৃতদেহটা! তাকানো যায় না। মাথার ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছে, মাছি ভনভন করছে সেদিকে, কালো জমা রক্তের উপর পিঁপড়ের সার। কুড়ুলখানা সেইখানেই পড়ে আছে। বেশ ভারী কুড়ুল। ঝকঝকে ধার। মাথার আঘাতটা কিন্তু কুড়ুলের ধারাল দিক দিয়ে লাগেনি। উঠোনের

এক জায়গায় কিছু জ্বালানী কাঠ, কিছু কাঁচা ডালপালা, আর একখানা দা পড়ে রয়েছে! উপস্থিত সাঁওতালরা অতি মনোযোগের সঙ্গে দারোগাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করছে। বিরসা মাঝি একদৃষ্টে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে—বেদনাভরা তার করুণ চাউনি। বিরসা আর বিরসার স্ত্রীর বয়স বেশি নয়। এইটিই বোধ হয় তাদের প্রথম সন্তান!

পরিবেশের ভয় আর বীভৎসতার গুমোট, খানিকটা কাটছে ছেলের মায়ের একটানা কাঁদুনি আর চিৎকারে।

'ও দারোগা, ঐ খুনেটাকে ধরে নিয়ে যা জেলখানা'। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দে, ওর মতলব খারাপ। এর পর একদিন আমাকেও কাটবে ওই কুড়ুল দিয়ে। নিশ্চয় কাটবে। আমার মন যে তাই বলছে। তখনও সূর্য ওঠেনি, দোয়েল ডেকেছে, কি না ডেকেছে, শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল—কী রে! চমকে উঠেছি। কানের কাছেই! ঘরের বাইরেই! ছেলেটার বাপ দেখি ঘরের পশ্চিমের ময়না গাছটা কাটছে। ওইখানে, ওই দেখ্ না দারোগা, কাটা গাছের গোড়াটা যেখানে রয়েছে। এই ডালপালাগুলো সব ওই গাছের।—দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছি আমি ও গাছটা তোর কী ক্ষতি করেছে? খেতে ভাল না হোক, তবু ময়নার ফল পাকলে খাওয়া তো চলে। বাড়ির একদিকে একটু আবরুরও তো দরকার। আমি বলি—তা কাটছিস কেন? বলে—কুড়ুলের বাঁট হবে। বাঁট তয়ের করবি তো একটা মোটা ডালই না-হয় কেটে নে; অত বড় গাছটা কি না কাটলে চলছে না? কে আমার কথায় কান দিচ্ছে! ছেলের বাপ তেড়ে জবাব দিল—উনানের জ্বালানি হবে। সে কী চোখ রাঙিয়ে কথা! ওই রেগে কথা বলা দেখেই আমি ওর মতলব বুঝে গিয়েছি।—'

দারোগাজীর কান খাড়া হয়ে ওঠে।

'ময়না গাছ কাটবার সময় রাগতে দেখে তুই বিরসার মতলব কী বুঝলি?'

একটু কেমন যেন হয় বিরসা মাঝির বউ। কান্না ও কথার স্রোত দুটোই এতক্ষণ একসঙ্গে সহজ ধারায় বইছিল। দারোগাজীর প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে, সেই কথা খোঁজবার চেষ্টায় কান্নার স্রোতও বাধা পড়ল।

কথা বলে বিরসার শ্বশুর। 'অত বড় বড় কাঁটা ডালে। ময়নার কাঁচা ডাল আবার লোকে কাটে নাকি জ্বালানি করবে বলে?'

'চোপ রও! দারোগাজী যখন তোকে জিজ্ঞাস করবেন, তখন কথা বলিস।'

কনস্টেবলের তাড়া খেয়ে বুড়ো থেমে গেল। কথা খুঁজে পেয়েছে বিরসার বউ। সে আরম্ভ করে অন্য কথা। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে খাওয়ার জল

নিয়ে আসতে হয়; তাই কলসী ভরতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। কচি ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে রেখে সে গিয়েছিল জল আনতে। ফিরতি পথে সে বিরসার চিৎকার শুনতে পায়। চেঁচানির ধরণ শুনেই তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দেখে এই কাণ্ড! অতটুকু বাচ্চা, কী-ই জানে, কী-ই বা বোঝে, ঘুমোচ্ছিল, বাপ হয়ে কী করে পারল! আহা রে! ওরে রাক্ষস, ও ছেলে কি আমার একার—ও ছেলে যে তোরও!…

দারোগাজী স্ত্রীলোকটির কথার স্রোত বন্ধ করতে চান না। এ আর এর স্বামী যা প্রাণে চায়, বলুক। এদের কথা থেকেই তাঁকে বুঝে নিতে হবে আসল ব্যাপারটা। নেশার ঝোঁকে করেনি তো কাণ্ডটা বিরসা মাঝি? তাঁর আগেকার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছে বিরসার স্ত্রী, এ কথা দারোগাজীর খেয়াল আছে।

এতক্ষণে বিরসা মুখ খুলল।

'না না দারোগা, বিশ্বাস করিস না ওর কথা। আমি ছেলেটিকে মারিনি, অমন সুন্দর ছেলেকে কি মারতে পারা যায়?'

তার গলার স্বর ও কথার ভঙ্গিতে দারোগাজী আশ্চর্য হলেন। একুশ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন, দোষ অস্বীকার করবার সময় অপরাধীর কণ্ঠস্বর কেমন হয়।—এ যে অন্য রকমের! এ যে সত্য কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে! মুখ-চোখের ভাবও মিথ্যা বলবার সময়ের মতো না! বহুবার জেলখাটা গুণ্ডাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্য বলবার নিখুঁত ভান করতে পারে, কিন্তু একজন সরল গ্রাম্য সাঁওতাল তা পারবে কী করে?

'না দারোগা, ও মিছে কথা বলছে ফাঁসিকাঠে ঝুলবার ভয়ে। ওই কুড়ুলখান দিয়ে—' নতুন-আসা কান্নার তোড়ে বিরসার স্ত্রীর বাকি কথাগুলো বোঝা গেল না।

'ফাঁসিতে আমি ভয় পাইনে রে—বুঝলি। মারলে পরে আমি নিজেই স্বীকার করতাম দারোগার কাছে। তোকে বলতে হবে কেন! আমি নিজে থেকে থানায় গিয়ে দারোগাকে বলতাম, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে দিতে। মরতে ভয় পাই না রে মরতে ভয় পাই না। এই কুড়ুল দিয়ে, আমি একা হাতে ভাল্লুকের সঙ্গে লড়েছি—বুঝলি! এ কুড়ুল আমার বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপের মুখে শুনেছি যে ঠাকুরদা তয়ের করিয়ে এনেছিল জংশন ইস্টিশানের নামকরা কামারের কাছ থেকে, রেল-লাইনের লোহা দিয়ে। এমন কুড়ুল এই ভোখরাহা গ্রামে আর কারও নেই। তিন পুরুষ হয়ে গেল—আজ পর্যন্ত কখনও দাঁত পড়েনি। তেঁতুল কাঠ কাটলেও এর ধার ভোঁতা

হয় না। জঙ্গলে কাঠ কাটবার সময় কুড়ুলটা কতবার বাঁচিয়েছে বাপকে, ঠাকুরদাকে, আমাকে—জন্তু-জানোয়ার, সাপখোপের হাত থেকে তার কি ঠিকঠিকানা আছে! ওই কুড়ুল দিয়েই যদি আমি ছেলেটাকে মারব, তবে ঘ্যাচ করে কোপ না বসিয়ে, ভোঁতা দিকটা দিয়ে মাথা থেঁতলে দেব কেন? আরে, ওই একরত্তি বাচ্চাকে মারতে আবার দা-কুড়ুল লাগে নাকি? পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মরে যাবে, আঙুল দিয়ে টিপে দিলে মরে যাবে, কিন্তু তা কি পারা যায়? ইচ্ছা থাকলেও তা কি পারা যায়?'

'ইচ্ছা থাকলেও' কথাটা কানে লাগে দারোগাজীর। এ কথাটা বলল কেন? এটা কি শুধু কথার মাত্রা?—

'না দারোগা, তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না। ও মেরেছে ঠিকই ছেলেটাকে—নিজ হাতে মেরেছে। ও আমাকেও ওই বাপের কুড়ুল দিয়েই কাটবে। সে আমি ময়না গাছ কাটা দেখেই টের পেয়েছি। ছেলের চেয়ে কখনও বউ আপন হয়? যে লোক ছেলেকে কাটতে পারে, সে কি আর বউকে রাখবে! কুড়ুলের প্রথম কোপটা যে আমার গর্দানে না পড়ে ময়না গাছে পড়েছে, সেই আমার ভাগ্যি!'

'ওর মনে গলদ আছে, তাই ও আমার বিরুদ্ধে বলছে তোর কাছে। নইলে কেউ কি নিজের মরদের বিরুদ্ধে দারোগার কাছে বলে? কুড়ুল গিয়ে লেগে ছেলেটা মরেছে ঠিকই। সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি? কিন্তু আমি মারিনি, আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে লেগেছে কুড়ুলটা আপনা থেকে। কাঁচা ছালছাড়ানো ময়নাডাল দিয়ে নতুন বাঁট লাগিয়েছিলাম কুড়ুলে। কাঠ কাটবার সময় পিছলে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। ছুটে গিয়ে লেগেছে একেবারে ওই কচি মাথাটায়। ময়না গাছটাই বোধ হয় শোধ নিল আমার উপর, অমন করে সেটাকে গোড়া থেকে কাটলাম বলে। গাছে ওরকম শোধ নেয়। গাছ কাটতে কাটতে চাপা পড়ে লোক মরতে দেখিসনি? গাছের ডাল কাটতে কাটতে, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙতে দেখিসনি? আঁধার রাতে একলা পেলে গাছকে ভয় দেখাতে দেখিসনি? ময়না গাছটা বুঝি আগে থেকেই ছিল আমার বিরুদ্ধে। নইলে ময়নাডালের বাঁটটা অমন পিছল হয়ে উঠবে কেন হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে?'

দারোগাজী কাঠ কাটবার জায়গাটা থেকে ছেলে শোয়াবার জায়গার দূরত্ব ইত্যাদি একটা আন্দাজ করে নিচ্ছেন মনে মনে। মাপজোখ পরে হবে। এখন তিনি এদের কথার মধ্যে বাধা দিতে চান না। বুঝছেন যে, আসল কথাটা এখনও বার হয়নি। বিরসার স্ত্রী বোধ হয় ভাবল যে, তার স্বামীর

কথাগুলো দারোগাজীর মনে বসেছে; সেইজন্য সে আগের চেয়েও বেশি চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে, 'না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আমায় সন্দেহ করে। কিছুদিন থেকে দেখছি সোনাই সা'র দোকানে সওদা করতে গেলে বিরক্ত হয়। বলেনি আমায় কিছু, কিন্তু বোঝা তো যায়। একটু চোখে চোখে রাখছে ও আমায় দিনকতক থেকে। এমন তো ও ছিল না। আমি কি বুঝি না। ছেলেটার রং একটু ফরসা হয়েছে বলে সোনাই সা'র উপর ওর সন্দেহ।'

'এ যদি সত্য না হবে, তবে তুই জানলি কী করে যে আমি সোনাই সা'কে সন্দেহ করি? জবাব দে আমার কথার। শোন্ দারোগা, কোনো কথা আমি তোর কাছে লুকোব না। সোনাই সা লোকটা ভাল না। খুব খারাপ। কাল রাতে শয়তানটাকে আমি খুঁজেছিলাম। ধরতে পারলে আমি ওটাকে এই কুড়ুল দিয়েই সাবাড় করে দিতাম। বংশের ইজ্জত রাখতে গেলে ঠাকুরদার কুড়ুল দিয়ে ওটাকে খতম করা উচিত। ধরতে পারিনি। ছিল না বাড়িতে। পালিয়ে ছিল। আঁচ পেয়েছিল বুঝি আগে থেকে।'

এতক্ষণে দারোগাজী শাঁসালো খবর পেতে আরম্ভ করেছেন। সফল হয়েছে তাঁর এতক্ষণকার ধৈর্য।

'দারোগা, শুনেছিস তো ওর কথা! কাল রাতে ও গিয়েছিল সোনাই সা'র খোঁজে। কাল সকালেই ও বলেছে যে, যত বড় হচ্ছে ততই বাচ্চাটা দেখতে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বাঁকা লাগল। শুনেই বুঝেছি। বোঝা তো যায়!'

'তোর মনে ভয় রয়েছে, তাই তুই বুঝেছিস! আমি ময়না গাছটা কেন কাটলাম তাও তুই না বলতেই বুঝেছিস! ভাবিস যে তোদের শয়তানি আমি ধরতে পারি না! তুই যে খানিক আগে দারোগাকে বললি,—ভোরে গাছ কাটার শব্দে তোর ঘুম ভেঙে গেল,—মিছে কথা—এত মিছে কথাও তয়ের করে বলতে পারিস! ঘুমিয়ে ছিলি না আরও কত! যত বোকা আমাকে ভাবিস, তত বোকা আমি নই, বুঝলি!'

বিরসার বউ চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে বাপরে। তুই আমাকে বাঁচা! নইলে ও আমাকে মেরে ফেলে দেবে এখনই! তুই থানার রাজা। তুই আমার মা-বাপ। তুই আমাকে বাঁচা! এখনও খাটিয়ায় বসে বসে দেখছিস কী? ওর মাথায় খুন সওয়ার রয়েছে। হাতকড়ি দিচ্ছিস না কেন এখনও? বাপরে বাপ!—'

বিরসার বউ ছুটে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল এখান থেকে। কনস্টেবল্ দুজন

তাকে ধরে, তাড়া দিয়ে আবার বসাল। 'থানার রাজা' কথাটা দারোগাজীর কানে খুব মিষ্টি লাগে, এই গোলমালের মধ্যেও।

'খুন সওয়ার হয়েছিল কালকে, বুঝলি! কাল যদি তোদের দুজনকে একসঙ্গে পেতাম তাহলে এই কুড়ুল দিয়ে কাটতাম, ঠিকই। বাপের কাছ থেকে পাওয়া কুড়ুল—বাপের বংশের ইজ্জত বাঁচাবার ঠিকা আমারও যেমন, ওই কুড়ুলখানারও তেমনি। আমার চেয়েও বোধ হয় কুড়ুলখানার বেশি। দেখছিস না? নইলে ছিটকে অমন করে হাত থেকে বেরিয়ে যাবে কেন নিজের কাজ সারতে? চোখের নিমেষে, বোঝবার আগেই একেবারে উড়ে চলে গেল হাত থেকে; সাপে যেমন করে ছোবল মারে, বাঘে যেমন করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম করে। সত্যি বলছি দারোগা, বিশ্বাস কর; ছেলেটাকে আমি মারিনি। আমার যে ইচ্ছা হয়নি একবারও তা নয়; মিছে বলব না তোর কাছে—ছেলেটাকে শেষ করে দেবার কথা আমি কালকেও ভেবেছি। আমার বাপ-ঠাকুরদার মুখে কালি দিচ্ছে ওই ছেলেটা এ কথা আজ কাঠ কাটবার সময়েও ভাবছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদারা উপর থেকে দেখছে, চোখে আঙুল দিয়ে ছেলেটাকে দেখাচ্ছে, ওটাকে শেষ করে দেবার কথা মনে পড়াচ্ছে—এইসব কথা কুড়ুলটা হাত থেকে ফসকে যাবার আগের মুহূর্তেও আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমি মারিনি। এত কথা তোর কাছে স্বীকার করছি, আর মারলে পরে সেই কথাটা তোর কাছে কবুল করতাম না? একেবারে বাচ্চা যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর হাসে যে! মায়ের নাক খামচে নেয় যে! ওকে কি মারতে পারা যায়। কী-ই বা জানে, কী-ই বা বোঝে, অতটুকু রক্তের দলাটা! তা কি পারা যায়! কিন্তু আমি না পারলে কী হবে! কুড়ুলটা শুনবে কেন? ওটা যে চলে আমার বাপ-ঠাকুরদার হুকুমে। আমার মনের চেয়েও এগিয়ে চলে। বললে বিশ্বাস করবি না, হাতের মধ্যে বেঁচে উঠে কুড়ুলটা শিঙ্গি মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল হু-উ-ই দূরে। কাঠ কাটছিলাম উঠোনে ওখানে। ওখান থেকে এখানে ছুটে এল কুড়ুল, কী হচ্ছে বোঝবার আগেই। আমি নিজেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছি। এ কী হল! দেখতে না দেখতে! কুড়ুলটা হাত থেকে পালাবার মুহূর্তেই আমি বুঝে গিয়েছি সেটার মতলব। জেনে গিয়েছি সেটা কোথায় যাচ্ছে; কিন্তু জানলে কী হবে। তার উপর আমার যে কোনো হাত নেই। মানুষের সঙ্গে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়; কিন্তু জিনিস একবার খেপলে কি তাকে সামলানো যায়! অবিশ্বাস করিস না আমার কথা দারোগা। তীরধনুকে আমার হাতের নিশানা ভাল; কিন্তু হাজার নিশানা

করেও ওই কাঠ কাটবার জায়গা থেকে কুড়ুল ছুঁড়ে এই বারান্দার বিড়ালের গায়ে আমি লাগাতে পারব না। আর লাগবি তো লাগ, একেবারে ঠিক মাথায়! একটা কথাও লুকাচ্ছি না রে। সে সাহস আমার ছিল না। বাঘ-ভাল্লুক মারবার চাইতেও অনেক বেশি বুকের পাটার দরকার হয় অতটুকু একটা দুধের বাচ্চাকে মারতে। সে বুকের পাটা আমার নেই।—'

বিরসার বউ সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। যত শুনছে তত তার ভয় বাড়ছে। চোখদুটো বড বড় হয়ে উঠেছে। ময়না গাছটাকে কাটতে দেখেই বুঝেছিল যে সে ধরা পড়ে গিয়েছে স্বামীর কাছে। কিন্তু এতটা সে ভাবেনি। নিজেকে ভাবত খুব চালাক। বিরসার মাথায় যে খুন চড়ে আছে তা সে আঁচ করতে পারেনি আজ সকালেও।—আর রক্ষা নেই তার বিরসার হাত থেকে! মরা ছেলেটার চেয়েও নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্নটা বড হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে দারোগার কাছে নিজে সব দোষ স্বীকার করে—সোনাই সা'র সব কথা বলে। কিন্তু সমাজের সব লোক যে সম্মুখে বসে! বাধো-বাধো ঠেকছে। তাছাড়া বিরসা কতটুকু জানে তাদের আশনাই সম্বন্ধে সেটা জানতে পারলে সুবিধা হত। দোষ স্বীকার করবার লোভ ছেড়ে সে তার পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলে।

'না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আগাগোড়া মিছে কথা বলছে।—'

'থাবড়ে মুখ ভেঙে দেব! বারবার ওই একই কথা, একই কথা কী শোনাচ্ছিস দারোগাকে! মিছে কথা কি? সোনাই সা'র কথাটা মিথ্যা? ময়নাগাছটা কাটলাম মিছামিছি? আমি কি পাগল নাকি? তবে হ্যাঁ, ময়নাগাছটা আমি কেটেছি রাগ করে। মিছে বলব না তোর কাছে দারোগা। নইলে অন্য গাছের ডাল দিয়ে কি আর কুড়ুলের হাতল হত না? বুনো গাছ ঠিকই; কিন্তু ছাগলটা বাঁধতেও তো গাছটা কাজে লাগত! এই যে এতগুলো লোক উঠোনে রোদ্দুরে বসে রয়েছে, ময়নাগাছটা থাকলে এরা কি একটু ছায়া পেত না? বুঝি তো; কিন্তু ও গাছটা না কাটলে যে সাঙাই চলছিল না। আর এখন সে কথা লুকিয়ে কি লাভ, ও ওই গাছটার উপর কাচা কাপড় শুকতে দিত মাঝে মাঝে। দেখাদেখি একদিন আমিও কাপড় শুকোতে দিলাম ময়নাগাছের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দেখি ও আমার ধুতিখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় মেলে দিল।

—কেন রে? তুললি কেন? বেশ তো রোদ্দুর আছে এখনও ওখানে?

—পাতায় বড় ধুলো রে আজ। যা জোর হাওয়া গিয়েছে কাল! কাচা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।

নে বাবা, যা ভাল বুঝিস তাই কর!

আবার আর একদিন ওই ব্যাপার।

—কেন রে? তুললি কেন?

—আজ হাওয়া দেখছিস না; যেন ঝড় বইছে। এই হাওয়ার মধ্যে ময়নাগাছের কাঁটায় কি আর তোর ধুতি আস্ত থাকবে!

বেশ। যা বুঝোস তাই বুঝি! ভাবি, মেয়েমানুষের খেয়াল। তখন বুঝতে পারিনি।'

'না না দারোগা, এসব ওর বানানো কথা। আরও কত বলবে বানিয়ে বানিয়ে। বিশ্বাস করিস না একটা কথাও।—'

'দারোগা, তুই আগে সবটুকু শুনে নে। তারপর বুঝে দেখিস, এ আমার বানানো গল্প, না আমি সত্যি কথা বলছি।—আর-এক দিনও দেখি ময়নাগাছের উপর কাপড় শুকোতে দিল। এক প্রহর বেলা তখন—গাছের দিকটায় রোদ্দুর নেই। এখানে-ওখানে, বেড়ার উপর, দাওয়ার বাঁশে, ঘরের ছাঁচতলায়, চারিদিকে ভরা রোদ্দুর! তবু কাপড় শুকোতে দিচ্ছে ছায়ায়। ভাবলাম বলি; কিন্তু বলি-বলি করেও বললাম না। খটকা লাগল। সেই রাত্রেই প্রথম সন্দেহ হয়। সোনাই সা'র সঙ্গে ওর আলাপ দরকারের চেয়েও একটু বেশি, এ কথাটা খেয়াল হল সেদিন। সোনাই সা'টা যে লোক ভাল না; আমাদের টোলার এত লোক তো এখানে রয়েছে; এরা সবাই বলবে এ কথা। এসব গত বছরের কথা। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছিলাম। ময়নাগাছে কাপড় শুকোতে রোজ দেয় না। আবার ঝড়ের দিনেও ডালের সঙ্গে গেরো বেঁধে দেয়; পাতায় ধুলো জমে থাকলেও দেয়; রোদ না থাকলেও দেয়। দেখি। ভাবি। বোঝবার চেষ্টা করি। লক্ষ্য রাখি। মনে হয় যেন বুঝতে পারছি, অথচ ধরতে পারি না ঠিক, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। কালও দেখি কাপড় শুকোতে দিয়েছে, গাছটার উপর অনেক কাল পরে। দিনে কাজে মন বসল না। রাতে ভাবতে ভাবতে ঘুম এল না। সারা রাত জেগে থাকব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ওটাও বুঝতে পারছি জেগে রয়েছে। পাশে শুয়ে। উশখুশ করছে। একবার আমার নাকের কাছে আঙুল রেখে বোঝবার চেষ্টা করল আমি জেগে আছি কি না। আঙুলে তেলের গন্ধ পেয়েই আমি বুঝেছি সাঁঝের বেলা চুলে তেল মেখেছে। কত বড় শয়তান। মটকা মেরে পড়ে

আছি ; কিন্তু কান খাড়া রেখেছি।—হঠাৎ ময়নাগাছতলায় শুকনো পাতার উপর শব্দ হল। পায়ের শব্দ। জন্তু-জানোয়ারের নয়। তাহলে খরখর করে শব্দ হত। শুনেই বোঝা যায়। এ শব্দ মানুষের পায়ের—চাপা, কাটা-কাটা শব্দ। সাবধানে টিপে টিপে পা ফেলবার শব্দ। চুলে-তেল-মাখা শয়তানটা তখন পাশে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে। বেশি চালাক কিনা! বুঝেছে আমি জেগে। নাক ডাকানোর মানে, ও শুনেছে পায়ের শব্দটা। কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে ঘরের ঝাঁপ খুলতেই নাকডাকানী মেয়েটা কাশল। বোধ হয় সড় ছিল আগে থেকে যে কাশির শব্দ শুনলেই পালাতে হবে ; কেননা আমি ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই ময়নাতলার লোকটা ছুটে পালাল। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাইনি ; কিন্তু দুড়দুড় করে পায়ের শব্দ হল—স্পষ্ট শুনলাম। আগে থেকে সড় না থাকলে লোকটাই বা অন্ধকারে বুঝল কী করে ঝাঁপ খুলে কে বার হচ্ছে—আমি, না যার বার হবার কথা, সে। আমিও শব্দটার পিছু-পিছু ছুটেছিলাম ; কিন্তু সেও ওই শালা ময়নার কাঁটা পায়ে ফোটায় দৌড়ে পারলাম না লোকটার সঙ্গে। এই দেখ, এখনও সেই কাঁটা ফুটে রয়েছে পায়ে। ও গাছের কাঁটাটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।—সোজা গেলাম মুদির দোকানে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখি, আলো জ্বলছে মিটমিট করে ; সোনাই সা নেই। ফেরেনি। দোকানে সোনাই সা একাই থাকে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তার জন্য। শেষকালে ভোর-রাত্রেও ফিরল না দেখে, বাড়ি ফিরি। ঘরের মধ্যে ঢুকিনি। দাওয়ায় বসে বসে কত কী ভাবি। যদি লোকটা সোনাই সা না হয়!—একটু ফরসা হতেই গেলাম ময়নাগাছতলায়। ঠিক যা ভেবেছি! রবারের জুতোর দাগ! দোকানদার মানুষ ; জুতো পরে কিনা—রবারের জুতো। মাথা গরম হয়ে উঠল। দিলাম ময়না-গাছটাকে কেটে সাবাড় করে তখনই! আমাকে জেল দে, ফাঁসি দে, যা ইচ্ছা তাই কর ; কিন্তু ছেলেটাকে আমি মারিনি।'

'না-না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না!—'

বিরসার স্ত্রী ওই একই কথা বারবার বলে চলেছে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। কিন্তু কথার পিছনে প্রাণ নেই। গলার স্বর মিইয়ে এসেছে ; কথার ঝাঁজ মরেছে।

দারোগাজীই পড়েছেন মুশকিলে। তাঁর মনে হচ্ছে যে বিরসা মিথ্যা কথা বলছে না ; নিজেকে বাঁচিয়ে কথা বলবার চেষ্টা তার নেই। তবু মনে খটকা থেকে যাচ্ছে ; একটা বিষয়ে ; আর সেইটাই এই তদন্তের মুখ্য বিষয়। বিরসা ছেলেটাকে ইচ্ছা করে মেরেছে, না এটা একটা দৈবাৎ-ঘটে-যাওয়া

দুর্ঘটনা মাত্র। বিরসার কথার এই অংশটা একটু কেমন-কেমন যেন ঠেকে। এও কি সম্ভব? অসম্ভব অবশ্য পৃথিবীতে কিছু নেই। কিন্তু উপরওয়ালা তো তা শুনবে না। তিনি নিজে চিরকাল এসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছেন। পুলিশসাহেব তাঁর উপর যত বিরূপই থাকুক, এখনও তিনি নির্ভীকভাবে নিজের বিবেক অনুযায়ীই কাজ করতে চান। তাঁর মন যা বলছে, যুক্তি বিবেচনা বলছে ঠিক তার উলটো। বিরসার কণ্ঠস্বর আর চোখমুখের ব্যঞ্জনা ছাড়া আর-সব তথ্য-প্রমাণই তার বিরুদ্ধে। ঘটনাপরম্পরা এমনভাবে সাজানো যে, তাকে নির্দোষ বলে ভাবতে বাধে। হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে যাওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সেটা গিয়ে কি একেবারে ওই ছেলেটার মাথাতেই লাগবে! আর ও নিজেই স্বীকার করছে যে, ও ছেলেটাকে মারবার কথা ভাবছিল তখন।...এতগুলো যোগাযোগ কি সম্ভব? ...না-না, লোকটা সত্যি কথা বলছে এই ধারণাটুকু ছাড়া আর-কিছুই নেই তার সপক্ষে। এই ক্ষীণ ধারণাটুকুর উপর নির্ভর করে কি কখনও পরিষ্কার বিবেকে, এটাকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার কেস বলে রিপোর্ট করা যায়?...

'না-না দারোগা, ওর আজগুবি গল্প একটুও বিশ্বাস করিস না। আগে হাতকড়ি লাগিয়ে দে ওর হাতে; তারপর ওর কথা শুনিস।—'

দারোগাজী মন স্থির করতে পারেন না। চৌকিদারকে হুকুম দিলেন সোনাই সা'র খোঁজ করতে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে থেকে কে-একজন যেন বলল যে, সোনাই সা পালিয়েছে; আজ ওর মুদিখানার দোকান খোলেনি।

এতক্ষণে দারোগাজী বাইরে লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রাজপুতটোলার লোকরাও এসে জুটেছে। যে লোকটা কথা বলল, সে পূরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। ঝুঁকে নমস্কার করে সে দারোগাজীকে। ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি। মন খারাপ হয়ে গেল। ওই নমস্কার আর হাসির মধ্যে দিয়ে বোধ হয় সহদেও সিং সকলকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে দারোগাজীর নগণ্যতার কথাটা।—লোক-দেখানো নমস্কার! ও বোঝাতে চাচ্ছে যে, পূরণ সিং-এর স্থান থানার মধ্যে দারোগাজীর চেয়েও উঁচুতে!—ঠোঁটের কোণের হাসিটা তাচ্ছিল্যে ভরা!—

বেশ এতক্ষণ কর্তব্যের মধ্যে ডুবে ছিলেন। আর এখন পূরণ সিং-এর কথাটা ভুলে থাকবার জো নেই! হাজার কাজে ডুবে থাকলেও। সহদেও সিং মনে পড়িয়ে দিয়েছে সেইদিনকার অপমানের কথাটা। ভোখরাহা গ্রামের এইসব লোকজনের চোখে সেইদিন থেকে তিনি কত ছোট হয়ে

গিয়েছেন। সংকোচে তিনি রাজপুতটোলার লোকের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি লেখাপড়া, মাপাজোখা, সাক্ষ্যপ্রমাণে মনোনিবেশ করলেন।

তদন্তের কাজ শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সাক্ষ্যপ্রমাণ সব বিরসার বিরুদ্ধে। মনের সংশয়টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। কুড়ুলটা হাত ফসকে অমনভাবে ছেলের মাথায় লাগার কথাটা সত্যি বলে ভাবতে পারলে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

এত দেরি হবে এখানে তা তিনি ভাবেননি। এগারো মাইল পথ তাঁকে যেতে হবে সাইকেলে, অন্ধকারের মধ্যে। এই মেদবহুল শরীর নিয়ে, এত পরিশ্রম আর আজকাল পোষায় না ; কিন্তু পরের চাকর যে! যাক, তবু ভাল যে রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার সময়টাতে তিনি বাড়ি পৌঁছে যাবেন। এখানে আর তিনি এক মিনিটও দেরি করতে চান না। শবদেহ আর আসামীকে নিয়ে যাবার ভার কনস্টেবলদের উপর দিয়ে তিনি উঠলেন।

গ্রামের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে সকলেই তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়। এতক্ষণ তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন—এখন তাঁর অবসর—মাতব্বরেরা সকলেই চায় থানার মালিকের সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত পরিচয় করে নিতে। ঝুঁকে সেলাম করছে; দারোগাজী শুধু একবার তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের ধন্য করুন! সবচেয়ে আগে দাঁড়িয়ে পূরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। গ্রামের লোকে খাতির করে তাকে দারোগাজীর সবচেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার দিয়েছে। পুলিশসাহেব যাকে মোটরগাড়িতে নিজের পাশে বসতে দেয়, গ্রামের মধ্যে তার খাতিরই আলাদা। সে হেসে এগিয়ে এল।

'দারোগাজী এখনই চললেন? এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিলে হত না! অনেকটা পথ যেতে হবে; কখন পৌঁছবেন, যদি একটু জলটল খেয়ে যেতেন—!'

'না-না! এ সময় জল-খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই!'

'আমার বাবা আপনাকে দেখলে খুশী হতেন। আজ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন আপনাদের আশীর্বাদে। তবে হাতের ব্যাণ্ডেজটা এখনও খুলে দেয়নি। একটু দেখা করে গেলে হত না?'

পূরণ সিং! ফিরে এসেছে? সহদেও সিং বুক ফুলিয়ে এসে নিমন্ত্রণ করবার ছলে, তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেইদিনকার কথাটা। লোকগুলো নিশ্চয়ই মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! এদের সম্মুখে সাহেব সেদিন তাঁকে নবাবসাহেব বলে গালাগালি দিয়েছিল! মনের নিচে থিতিয়ে পড়া অপমানের

গ্লানিটুকু ঘেঁটে উঠেছে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে। এখান থেকে কোনো রকমে বার হতে পারলে তিনি বাঁচেন।—

'না-না! অনর্থক রাত করে লাভ কী?'

দরকারের চেয়েও কড়া হয়ে গেল কথাটা। মনের আলোড়ন চাপবার চেষ্টায় তাঁর খেয়ালও নেই যে অকারণে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন তিনি। বিরসার স্ত্রীর চিৎকার, এতগুলি লোকের 'আদাব', 'সেলাম', 'প্রণাম', 'নমস্তে'র ঘটা কিছুই কানে যাচ্ছে না তাঁর। পূরণ সিং-এর কথাটাই সারা মন জুড়ে রয়েছে। অন্ধকারে সাইকে'লের সম্মুখের তিন-চার হাতের বেশি দূরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। একরকম আন্দাজে সাইকেল চালানো। খানা-ডোবায় ভরা গ্রামের রাস্তায় অনবরত হোঁচট খাচ্ছেন। একেবারে প্রাণ হাতে করে চলা। তবু তিনি জোরে জোরে সাইকেল চালাচ্ছেন। দুঃসহ ভোখরাহা গ্রামটাকে তিনি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে চান। তারপর না-হয় সাইকেলের গতি কমিয়ে দেবেন। পূরণ সিং তাঁর জীবনটাকে দুর্বহ করে তুলেছে। পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার কোন্‌দিন তার আদরের দুলালকে দেখতে না চলে আসে হট করে। এলে নিশ্চয়ই বিরসা মাঝির কেসটা সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিয়ে যাবে; একটু সতর্ক থাকা দরকার। শোনা গিয়েছিল পূরণ সিংকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হবে।—এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেল কী করে? কী পরমায়ু বুড়োটার। মরেও না! ওর দলের লোকেই ওকে খুন করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা এখনও ফেরার রয়েছে, তারা কি আবার একবার ওকে মারবার চেষ্টা করবে না? সুযোগ-সুবিধা পেলে করবে ঠিকই। এবার থেকে সে আর সহদেও সিং পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে থানার দারোগার বিরুদ্ধে কত রকম খবর দেবে, তার ঠিক কী। কিন্তু তাই বলে কি চোরডাকাতের মন জুগিয়ে চলতে হবে না কি? তেমন বান্দা রামভরোসা দারোগাকে পাওনি। একবার বাগে পেলে হয় পূরণ সিংকে! তার বিরুদ্ধে কিছু পেলে তিনি ছাড়বেন না! নিচে থেকে জোর কলমে লিখে চালান তো করে দেবেন সদরে; তারপর উপরওয়ালারা যা ইচ্ছা হয় করুকগে! এ থানা থেকে বদলি হবার আগেই তিনি একবার পূরণ সিংকে দেখে নেবেন।

এ কী! হঠাৎ খেয়াল হল। এতদূর এসে পড়েছেন! রাজপুতটোলার ইঁদারাটাই হবে বোধ হয়! অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না—একহাঁটু পাঁক রাস্তার উপর। ডান দিকের অপরিসর শুকনো জায়গাটার উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হবে। সাদা-কাপড়-পরা কে যেন সম্মুখে!—দুজন

স্ত্রীলোক—কলসী নিয়ে!—তিনি আগে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাননি। স্ত্রীলোক ছুটির ওখান থেকে সরে যাবার উপায় নেই আর। তিনি এক ঝাঁকি দিয়ে আচমকা বাঁ দিকে সাইকেল ঘোরালেন। ইঁদারাটার বাঁ দিক দিয়ে তিনি চলে যেতে চান। মুহূর্তের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল—অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না—কিসের সঙ্গে যেন জোরে ধাক্কা লাগল সাইকেলের। ছিটকে পড়ে গেলেন দারোগাজী সাইকেল থেকে। আরও কী একটা যেন ছিটকে পড়ল মাটিতে। ভারী জিনিস! মানুষ!—

'বাপরে বাপ! মেরে ফেলল রে!'

লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে। পূরণ সিংয়ের গলা! আলো নিয়ে কে একজন ছুটে আসছে।—আরও একজন স্ত্রীলোক ছুটে এল।—আরও একজন। চেঁচামেচি।—হট্টগোল। পাড়ার মেয়েরা ভয় পেয়েছে—পূরণ সিংকে দলের লোকেরা আবার জখম করল নাকি?—রাজপুতটোলার পুরুষ-মানুষরা ফিরছিল বিরসা মাঝির বাড়ি থেকে। তারা দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে। আসছি, আসছি!—তাদেরই মধ্যে থেকে কেউ বুঝি একটা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল। গ্রামে ডাকাত পড়লে এই করাই নিয়ম; দূর গ্রামের লোকেরা জানতে পারে; সারা গ্রাম আলো হয়ে যায়। রাজপুতটোলার লোকদের লাঠির জোর আছে—ডাকাতকে ভয় পায় না। তারা ছুটে আসছে লাঠি বাগিয়ে। ভর সন্ধ্যাবেলা—দারোগা কনস্টেবল গ্রামে—এরই মধ্যে এসেছে পূরণ সিংকে মারতে!—বুকের পাটা কম নয়! তারা যখন এসে পৌঁছল তখন দারোগাজী বুড়ো পূরণ সিংকে কোলপাঁজা করে তুলে, দড়ির খাটিয়াখানার উপর আবার শুইয়ে দিচ্ছেন। আঘাত গুরুতর নয় তাই রক্ষা। নইলে রাজপুতটোলা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া শক্ত হত।

—কী করে এ জিনিস সম্ভব হল? সেই কুড়ুলখানার মতো তাঁর সাইকেলখানাও কি মনিবের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করল নাকি? কে জানে! ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না।

—অনেক রাত্রিতে যখন রামভরোসা দারোগা বাড়ি ফিরলেন, তখন তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে, বিরসা মাঝির কেসটাতে আকস্মিক দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবেন।

## চরণদাস এম, এল, এ

মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণ দাস। একসময় লোকে ভালবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারী দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণ দাস, এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজী জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে: আর যাদের ইংরাজী জানবার কোনরকম দাবি নাই তারা ডাকে মায়লে-জী বলে। এই উচ্চারণ-বিকৃতি কোন রকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।

সেই মায়লেজী এসেছেন তাঁর পুরনো অফিসে। পার্টি অফিস। তাঁর সেকালকার কর্মকেন্দ্র। বছর চারেক পরে এই এলেন স্টেশন থেকে, রিকশাতে করে।

ফ্যাসাদ! লটারির টিকিট না কিনলে লটারিতে টাকা পাবার উপায় নাই; ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নাই!

আর এম-এল-এ না হতে পারলে? সে কথা বলে কাজ কী!

যখন পৌঁছলেন তখন সবে ভোর হয়েছে।

'নমস্তে লখনলালজী!'

'আরে! ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব যে! নমস্তে!'

'সব ভালতো?'

'হাঁ। আপনার কুশল বলুন! একেবারে কোন খবর না দিয়ে যে?'

'এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।'

'তা বেশ করেছেন। আসাই তো উচিত। 'হায়-কমাণ্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি?'

এম-এল-এ সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। লখনলাল ধরেছে ঠিকই। 'হাইকম্যাণ্ড' নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি ভয় করেন। সেই 'হাইকম্যাণ্ড' নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছেন ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নরনারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছে বার আর এম-এল-এ করা হবে না। শুনেই ছুটে এসেছেন তিনি নকল ভগবান ছেড়ে আসল ভগবানের শরণে। লখনলাল

একসময় ছিল তাঁর শাগরেদ ; এখন প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটা করে টাকা নেয় এবং প্রতিদিন তাঁর ইয়েমিয়েলিয়েগিরি ঘোচাবার হুমকি দেখায়। তাঁর অপরাধ তিনি দশ-বারো বছর থেকে সপরিবারে রাজধানীতে থাকেন ; এখানে আসেন কম। এখানকার যেসব কর্মীদের তিনি এক সময় নিজ হাতে গড়েপিটে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাদের সবগুলোর আজ পাখা গজিয়েছে। সবগুলোর ওই একই ধুয়ো—তিনি নাকি এম-এল-এ হবার পর থেকে এখানকার ভোটারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। এরা সবাই মাসে বিশ দিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাজধানীতে 'এম-এল-এ কোয়ার্টার্স'এ তাঁর অন্ন ধ্বংস করে, হাইকোর্টে নিজেদের মোকদ্দমা তদ্বির করে, আর সরকারী দপ্তর থেকে নানারকম অন্যান্য সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে মারে। এর পরিবর্তে পান চুন খসলে শাসানি তাঁর প্রাপ্য! তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে অষ্টপ্রহর! ঘেন্না ধরে গেল একেবারে! কিন্তু উপায় কি!

এরই নাম পরিস্থিতি। তাঁদের অভিধানের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। মত বদলাবার অজুহাত হিসাবে কাজে লাগে কিনা কথাটা।

ঝোলা আর কম্বলটা রিকশা থেকে নামিয়ে, রিক্শাওয়ালাকে আট আনা পয়সা দিতেই সে 'জয় গুরু' বলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। লখনলালজী হাসছেন।

'আর চার আনা পয়সা দিয়ে দেন ওকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব। আজকাল বারোআনা করে রেট হয়ে গিয়েছে। আপনি সেই চার বছর আগেকার রেটই জানেন কিনা।'

অপ্রস্তুত হয়ে এম-এল-এ সাহেব আর চার আনা পয়সা বার করে দিলেন। পয়সা নিয়ে রিকশাওয়ালা 'জয় গুরু' বলে চলে গেল।

লখনলাল তার ঝোলা আর কম্বল তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছিল।

'আহা করেন কী লখনলালজী। ভারী তো জিনিস।'

এম-এল-এ সাহেব তার হাত থেকে নিজের জিনিসগুলো কেড়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে রাখলেন।

'জন-সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামে আসবার সময় হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেস না এনে ঠিকই করেছেন ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব।'

তার চোখে দুষ্টুমির হাসি। সে বোঝে সব। সাধে কি আর তাকে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়।

'যে কাজে এসেছি সে কাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকজনের

সম্মুখে আমাকে বারবার এম-এল-এ সাহেব বলে না ডাকাই ভাল, তাই না? আপনাদের কাছে তো আমি সেই পুরনো চরণ দাসই আছি এখনও।'

'শুধু চরণ দাস নয়। আপনি এখন এসেছেন ভোটারদের চরণে আশ্রয় নেবার জন্য। আপনার নাম এখন হওয়া উচিত ভোটার-চরণ-দাস। বোলো একবার ভোটার-চরণ দাসজীকী জয়!'

চীৎকারে আর উচ্চহাসিতে ঘরের সকলের ঘুম ভাঙল। কে একজন যেন 'জয় গুরু' বলে চোখের পাতা খুলল। পাশের বালিশে লোকটি তার মুখ চেপে ধরেছে—'আমাদের সেক্যুলার সংবিধান'—এই কথা বলে হাসতে হাসতে।

বচ্কন্ মহতো লাফিয়ে উঠেছে খাটিয়া ছেড়ে।

'আরে মায়লেজী যে! নমস্তে! কখন? কবে? কোথায় উঠেছেন? সার্কিট হাউসে না ডাকবাংলায়?'

চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেন নি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দুইবার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দুই দিনের জন্য, তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউস-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।

বললে, 'এখানেই এসে উঠলাম।'

'কেন? বাড়ী ভাড়া আদায় করতে নাকি?'

খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে জানে না এরা। তাঁর এখানকার পৈতৃক বসতবাড়ীটা তিনি গভর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক হল। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখেনি জিনিসটাকে। কোন জিনিস তলিয়ে দেখে না এরা। রাজধানীতে পরিবার নিয়ে থাকেন; ছেলেমেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছে। যা আয় তাতে দুই জায়গায় বাড়ির খরচ চালানো শক্ত, সেইজন্য এখানকার বাড়ী গভর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে। এই সামান্য কথাটা বুঝবে না এরা।

'না, এমনি আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে এলাম।'

'ক' দিনের প্রোগ্রাম মায়লেজীর?'

'দেখি তো।'

'এক আধদিনের বেশী কি আর থাকতে পারবেন এখানে!'

'কি যে বলেন!'

ব্যথা পান এম-এল-এ সাহেব। এরা ভাবে তিনি ইচ্ছা করে এখানে আসেন না। ভুল ধারণা। ইচ্ছা থাকে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। কতবার ঠিক করেছেন আসবেন; কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। বারো বছর বড় শহরে থাকবার পর ছেলেমেয়েরা আর এখানে ফিরে আসতে চায় না। ছোটছেলেটার জন্ম রাজধানীতে; এখানকার শিয়ালের ডাকে রাত্রিতে ভয় করবে, এই হচ্ছে তার মায়ের ধারণা। স্ত্রীর পুরনো অম্বলের ব্যাধিটাও রাজধানীতে গিয়ে সেরেছে। এইসব নানা কারণে মিলিয়ে এখানে আসা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগে যে সেখানকার শহুরে সমাজের বন্ধুবান্ধবরা আজও তাঁকে পাড়াগেঁয়ে ভাবে, আর এখানকার লোকে অপবাদ দেয় যে তিনি আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে গিয়েছেন; তাঁর দশ বছরের মেয়েটার পর্যন্ত রাজধানীতে জন্মাবার অধিকারে, বান্ধবীদের সম্মুখে বাবার গ্রাম্য আচরণে, লজ্জা লজ্জা করে।

'আচ্ছা, পরে সব কথা হবে; এখন মুখ হাত ধুয়ে নিন, মায়লেজী। দাঁতন তো আপনার দরকার নাই?'

প্রশ্নের উত্তর দিল লখনলাল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁতনের দরকার বইকি। উনি দাঁত মাজবার বুরুশ আনলেও এখানে ব্যবহার করবেন না। এ যাত্রায় উনি একেবারে পুরনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণ-দাসজী।'

বাগে পেলে, রেখে ঢেকে কথা বলতে এরা জানে না। বাধ্য হয়ে এ রসিকতায় এম-এল-এ সাহেবকেও হাসতে হয় এদের সঙ্গে সঙ্গে।

'আচ্ছা আমি আসছি একটু এদিক ওদিক ঘুরে।'

দাঁতন নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে তিনি বার হলেন অফিস থেকে।

বচ্‌কন্‌ মহতো রসিকতা করে—'আরম্ভ হয়ে গেল মায়লেজীর জনসম্পর্ক স্থাপনার প্রোগ্রাম।'

লখনলালজী ফোড়ন দেয়—'সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার-চরণ-দাসজী কী জয়।'

ভোরবেলায় দাঁতন করতে করতে এম-এল-এ সাহেব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে মেলামেশা করে নিতে চান। ইচ্ছা করলেও কি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যায়। নাড়ীর টান যে। গায়ের ময়লা নয় যে ইচ্ছা হলেই ডলে ফেলে দেবে!

ও কে আসছে—সুন্‌রা না? খুব হন হন করে চলছে সে।

'নমস্তে সুন্দরলালজী।'

'জয়গুরু! আরে আপনি! আমি চিনতেই পারিনি।'

'খবর সব ভাল ত?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। জয় গুরু!'

তেমনি হন হন করেই সুন্‌রা চলে গেল। ব্যস্ত এবং একটু অন্যমনস্ক ভাব তার। এম-এল-এ সাহেব ভেবেছিলেন যে তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নেবেন পাড়ায় এখন কে অসুস্থ আছে। তার পর কিছু ভাল পথ্য কিনে নিয়ে অন্য সময় রুগীর বাড়ীতে যাবেন। কিন্তু কথা ব'লবার সুযোগ পাওয়া গেল না সুনরার সঙ্গে, একটু ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ঠিক এরকমটা আশা করেন নি। লখনলালের দল রাজধানীতে তাঁর কাছে প্রায়ই বলত যে এখানকার পরিস্থিতি বদলেছে; রাজনীতিক মিটিং-এ লোকজন হয় না, লীডাররা গেলে তাঁদের মালার জন্য গৃহস্থবাড়ী থেকে গাঁদা ফুল পাওয়া পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসব কথা বিশ্বাস করতেন না; ভাবতেন লখনলালরা বোধহয় তাঁকে মোচড দিয়ে আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করতে চায়। সুন্‌রার এখনকার হাবভাবে মনে হ'ল যে কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

একটি ছোট ছেলে ছুটছে। মনে মনে ঠিক করা ছিল যে ছোট ছেলে দেখলেই গাল টিপে আদর করবেন; আর তার চেয়ে ছোট হলে কোলে নিয়ে লজেনস্ খেতে দেবেন। পকেট ভরতি করে তিনি লজেনস্ টফি নিয়েছেন। হেসে ছেলেটাকে ডাকলেন। সে ফিরেও তাকাল না। ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে। একটু হতাশ হলেন।

বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধুলো-কাঁকরের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাঙ্গা কাচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। 'হুক্-ওঅর্ম'-এর ভয় সেকালে কখনও হয়নি। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন। লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিলেন। বিরসা আসছে এগিয়ে। তাঁকে চেনবার চেষ্টা করল; অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়। বিড়বিড় করে কি একটা স্তোত্র বলছে সে।

'নমস্তে বৃহস্পতিজী!'

'জয় গুরু! মায়লেজী? আমি চিনতেই পারছিলাম না। খালি গায়ে খালি পায়ে আপনাকে দেখব ভাবিনি কি না।'

'খবর ভাল ত সব ?'

'হ্যাঁ! আচ্ছা এখন আসি। জয় গুরু!'

বিড় বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে সে চলে গেল। অল্পেতে মুষড়ে পড়বার লোক তিনি নন। তবু বর্তমান পরিস্থিতির খারাপ দিকটা মনে না এনে পারলেন না। এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি। পরের জীবনটুকু ভেবেছিলেন সেই পুঁজি ভাঙ্গিয়েই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর বোধহয় তাঁর কপালে নাই! সন্দেহ হল, লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা প্রচার করেনি তো, এখানকার লোকজনের মধ্যে ? কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছা থাকতে পারে এই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্য দাঁড়াবার! হাই-কম্যাণ্ডের কাছেও চুপি চুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায় নি তো কিছু? ভগবান জানেন!

একজন বর্ষীয়সী মহিলা হাতে একটা পাতার ঠোঙ্গায় কি যেন নিয়ে ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

চরণদাসজী চশমাটা খুলে রেখে এসেছেন; তাই দূরের জিনিস দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তিরথার মা বলেই মনে হচ্ছে যেন ওঁকে। হ্যাঁ, ঠিকই তাই।

'ও চাচী! কোথায় এই সকালে এত তাড়াতাড়ি ?'

বৃদ্ধাটি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

'ও চাচী! তীর্থানন্দের খবর ভাল তো? নাতিপুতিরা সব ভাল তো? চিনতে পারছেন না? আমি চরণা।'

কী বুঝলেন, না বুঝলেন তিনিই জানেন। দেখা গেল তাঁর গতি দ্রুততর হয়েছে। পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফুলের সাজি হাতে করে একটি মহিলা 'জয় গুরু' বলে তাঁকে অভিবাদন করায় তিনিও 'জয় গুরু' বলে মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন। কি যেন কথা হ'ল। দুইজনেই একবার চরণদাসজীর দিকে তাকালেন। তারপর দুই জনেই একই পথে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সত্যই চিন্তান্বিত হলেন এম-এল-এ সাহেব। জনসম্পর্ক স্থাপনার কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে চথুরি চলেছে। সে এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক চিরকাল। একটু ইতস্তত করে তাকে ডাকলেন তিনি। ছেলেবেলায় লোকটা তাঁদের বাড়ির মোষ চরাত। সে দাঁড়াল—একটু অবাক হয়ে।

'জয় গুরু! ও আপনি! চিনতে পারিনি। রাজধানীর জল দেখছি খুব ভাল। গুরুদেবের কৃপায় আপনার গায়ে বেশ মাংস লেগেছে। লাগবারই তো কথা। ভোরে উঠে দাঁতন করতে করতে খালি পায়ে বেড়াবার পুরনো অভ্যাস এখনও আপনি রেখেছেন দেখছি। সেও ভাল।'

'আরে চথুরি, মানুষ কি আর বদলায়। যে যেমন ছিল তেমনিই থাকে।'

'এ কী কথা বলছেন আপনি মায়লেজী। মানুষ বদলায় না? কত রত্নাকর ডাকাত বদলে মুনি ঋষি হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সেই রকম গুরুর মত গুরুর কৃপা চাই। এ কথা আমার গুরুদেবের মুখে কতদিন শুনেছি। আমাদের গুরুদেব তো মানুষ নন—তিনি দেবতা—ঠাকুর—ভগবান! জয় গুরু!'

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে চলে গেল, তাঁকে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে। বোঝা গেল যে গল্প করে নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে এখন নাই। সে দাঁড়িয়েছিল শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। মানুষ যে বদলায় সে কথা আর এম-এল-এ-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আর যিনি চথুরির মুখে গুরুমাহাত্ম্যের বুলি ফোটাতে পারেন, তিনি যে মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

আরও যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম্ বোমা, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা—প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নাই?—ছেলের চাকরি, 'বাস' চালাবার অনুমতি পত্র, রাস্তায় মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারী লোন, সিমেন্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি? 'ইলেকশন'-এর বছরে নির্বাচনপ্রার্থীর কাছ থেকে কিছুই চাইবার নাই? ঠিক করে এসেছিলেন, যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার। কেউ কিছু চায়নি। তবে কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারী মহলে কোন ফল হয় না! যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের উপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নাই। তাঁর এই চালাকি কি এরা ধরে ফেলেছে? লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারী অফিসাররাও আজকাল এম-এল-এ'দের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না।

আশকারা পাচ্ছে উপর থেকে? গত কয়বছরের মধ্যে সত্যিই এখানকার জীবনের স্বাভাবিক মন্থর গতি, আগেকার তুলনায় দ্রুততর হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এইটুকুই আশার কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ, তাদের সম্মুখে সুবিধামত এই দৃষ্টান্তটা তুলে ধরতে হবে, ভোটের মরসুমের বক্তৃতায়।

নিজের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্রের লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা আশানুরূপ না হওয়ায়, একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অফিসে ফিরে এলেন। নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধে অফিসের কর্মীদের কাছে। না বলতেই বুঝে নিয়েছে, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতো।

"ঘাবড়াবার দরকার নাই ইয়েমিয়েলি সাহাব। সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে। জলখাবার খাওয়ার সময় সবাই মিলে বসে কেমনভাবে এগুতে হবে তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। আপনি শুধু বার্কারদের (ওয়ার্কার) উপর বিশ্বাস রাখুন।"

"আর একটা কথা মায়লেজী—আসরে নেমে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাহলে আসছে বছর ভূতপূর্ব মায়লে হয়ে যাবেন নির্ঘাত দেখে নেবেন।"

এদের সব কথা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

সেকালকার মত সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ছোলাভাজা, চিড়াভাজা ও পিঁয়াজের বড়ার জলখাবার খেতে বসলেন। আজ তিনি উদার হস্ত; জলখাবারের খরচটা আজ তাঁরই! আরম্ভ হয়ে গেল, খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে কাজের কথা।

ভোটার। ভোটার। ভোটার। কেবল ভোটারদের কথা। কটর্‌ মটর করে ছোলা চিবুবার শব্দ এই গল্পের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে। সাব্যস্ত হয়ে গেল—পাবলিক অবুঝ, জনতা খামখেয়ালী, জনসাধারণ নিমকহারাম। ভোটারদের তালিকায় যাদের নাম আছে তারা শুধু মানুষ; বাকি সকলে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে।

স্ত্রী-ভোটারদের লখনলালজী বলে ভোটারী। এই ভোটারীদের নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ বাধল লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতোর মধ্যে। বোঝা গেল, জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করবার পথেও বাধা প্রচুর।

এম-এল-এ-সাহেবের ধৈর্যের পুঁজি তার চেয়েও বেশী। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন—

"মোষের গলার ঘণ্টার এই আওয়াজটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বহু বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল দৈবক্রমে। এখানকার ভোটার ভোটারীদের মনের চাবিকাঠির সন্ধানও পাওয়া গেল এই অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

"মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ? বলছেন কী আপনি! দশ বছর রাজধানীতে থেকে আপনি একেবারে পরদেশী হয়ে গিয়েছেন। এ যে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ভাল করে শুনুন। বুঝতে পারছেন না?"

"হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের চেঁচামেচির মধ্যে আগে এত ভাল করে শুনতে পাইনি। পুজোটুজো আছে নাকি কোথাও?"

'তা জানেন না?'

'এর কথাই তো আপনাকে বলে আসছি তিন বছর থেকে।'

'সকালের আরতি।'

'অষ্টপ্রহর মচ্ছব। সকাল বিকাল নাই এর মধ্যে।'

'প্র্যাকটিশ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী তিন বছরের মধ্যে।'

'যাঁকে দশজনে ভক্তি করে, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।'

'ঠাট্টা করছি কই? যাঁর গা দিয়ে ভক্তরা জ্যোতি বার হতে দেখে, তাঁকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি?'

'তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে।'

'আর উপরের গবাক্ষ দিয়ে ধোঁয়া বার হয়।'

'গোলমেলে ধোঁয়া নয়। নির্দোষ ধোঁয়া। অম্বুরী তামাকের গন্ধওয়ালা ধোঁয়া।'

'ভক্তরা সেই ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্য বাইরে কাতারে কাতারে বসে থাকে।'

'সুগন্ধি রেচক ও কুম্ভক। যোগ-সাধনার সৌরভ।'

সহকর্মীদের মধ্যে এই সব কথা-কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। এম-এল-এ সাহেব একটাও কথা বলেননি এর মধ্যে। শুধু শুনছেন ও পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

সব শুনে মনে হল, এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যে সব খবর দিয়েছিল, সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। জগদগুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ এবং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যই সকলে উঠতে বসতে 'জয় গুরু' বলে, এই জন্যই রাজনৈতিক দলের

নেতারা এখানে এসে ফুলের মালা পান না; এই জন্যই খানিক আগে সকলে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটছিল। জিলাপির লোভে ছুটছিল ছেলেপিলেরা, গুরুদেবের দর্শন পাবার লোভে ছুটছিল বয়স্করা। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয় আর সন্ধ্যাবেলায় হয় কীর্তন। স্বামীজী নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তিনি ফল-মূল ছাড়া আর কিছু খান না, এবং টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। তাঁর নামে সবাই পাগল এবং তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে না এমন লোক এখানে নাই। তিনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়। তাঁর বাকসিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও নাকি পৌঁছেছে। এ ছাড়া সিদ্ধ-পুরুষের অন্যান্য বিভূতিও তাঁর আছে।

এই সব জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র করবার পর চরণদাসজী বসলেন সহকর্মীদের সঙ্গে ভোটারদের স্বপক্ষে টানবার কৌশল ঠিক করবার জন্য। হঠাৎ জমাট আলোচনায় বাধা পড়ল।

'আসুন মৌলবী-সাহেব।'

'আদাব! আদাব ভাইসাহেব!'

এখানে এই প্রথম লোকের সঙ্গে দেখা হল, যিনি 'জয়গুরু' বললেন না। একটু আশ্বস্ত হলেন চরণ দাসজী।

বেশ ভারিক্কে গোছের দাড়ি-সম্বলিত, ভারিক্কে প্রকৃতির লোক মৌলবী-সাহেব। চাকরি করেন। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। থাকেন মৌলবীটোলা নামক পাড়ায়। এখন তিনি এখানে এসেছেন, সামান্য একটু কষ্ট দেবার জন্য পার্টি অফিসের লোকজনদের।

মৌলবীসাহেবের হাবভাব কথাবার্তা বেশ কেতাদুরস্ত! অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে পার্টি অফিসের লোকজনদের সময়ের মূল্য তিনি জানেন। সেই বহুমূল্য সময় নষ্টের হেতু হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি সরকারী চাকরির কল্যাণে। তিনি এসেছেন সরকারী লোক-গণনার কাজে।

'না না, চিড়ে ভাজা আনবার দরকার নাই। আপনারা খান। সকালে নাস্তা করে তবে আমি বেরিয়েছি বাসা থেকে।'

এখানকার অফিসের স্থায়ী লোকজনের নাম ধাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ গুছিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে ছাপা 'ফর্ম'গুলো ভরলেন। কাজের শৃঙ্খলা আছে তাঁর।

তারপর এম এল এ সাহেবকে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?'

অতি নির্দোষ প্রশ্ন, কিন্তু চরণদাস এম এল এ-র মনের এক অতি স্পর্শাতুর

জায়গায় আঘাত লাগে। সহকর্মীদের সহস্র বিদ্রূপ তিনি সহ্য করতে রাজী আছেন, কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র তিনি নন।

'এখানে লেখা হবে না তো, আবার কোথা থেকে লেখা হবে!'

'আপনি এখন আর এখানে থাকেন না তো; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম হুজুরের কাছে!'

'আমার ঘর-বাড়ি সব এখানে। আমি এখানকার বাসিন্দা নই?'

'আপনার বাড়িটা ভাড়া দিয়েছেন কিনা; তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা।'

'বসতবাড়ি ভাড়া দিয়েছি বলে ভোটারতালিকায় নাম থাকবে না আমার?'

'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর; ভোটার-তালিকার সঙ্গে আদম শুমারির কোন সম্বন্ধ নাই।'

'আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আইনচঞ্চুমশাই, এবার থামুন আপনি! সরকারী নিয়ম-কানুন আর শেখাতে হবে না আমাকে, আপনার!'

'তোবা! তোবা! হুজুরকে কানুন শেখাব আমি? আমরা হুকুমের চাকর মাত্র; আপনারাই তো কানুন তৈরী করেন। আপনি যদি এখানকার আদম-শুমারির মধ্যে নাম দিতে চান, তবে তাই হবে। যেখানে ইচ্ছা আপনি নাম দিতে পারেন।'

এম-এল-এ সাহেবের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগে। মৌলবীসাহেবটি তাঁর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের লোক নয়তো।

'তবে এতক্ষণে এত আইন-কানুন ঝাড়ছিলেন কেন। তিন পয়সা মাইনের চাকরি, আর লম্বা লম্বা কথা।'

'আপনি গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলা উচিত আপনার।'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি! আমাকে অভদ্র বলা! এখানকার সেন্সাস অফিসার কে? তোমার চাকরি আমি খাব—এই বলে রাখলাম! সরকারী মহলে সে প্রতিপত্তিটুকু আমি রাখি, বুঝলে!'

'সব বুঝেছি; আর বোঝাতে হবে না। এখন বলুন আপনার নাম!'

কলম হাতে নিয়ে 'ফর্ম' সম্মুখে রেখে, উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন মৌলবী-সাহেব। এম-এল-এ সাহেব নিরুত্তর, লোকটির ধৃষ্টতা দেখে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছে—যেন জানে না।

'জীবিকা?'

এম-এল-এ নিরুত্তর।

'বিবাহিত না অবিবাহিত ?'

উত্তর দিলেন না চরণদাসজী।

'বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাকি ? বৈজ্ঞানিকদের আলাদা কার্ড আছে।'

আর থাকতে পারলেন না চরণদাস এম-এল-এ।

'বেয়াদব লোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ।'

আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলল।

মৌলবীসাহেব ধীর কণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন; অপমান করেছেন; মারধরের হুমকি দেখিয়েছেন; চাকরী খাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। শুধু নাম-ধাম বলতেই অস্বীকার করেননি—একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর আইন-সঙ্গত সরকারী কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।'

'নালিশ দায়ের করবার হুমকি দেখায়! জনসাধারণের প্রতিনিধিকে! ছাড় তোমরা, ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছি এখনই!'

তাঁর আস্ফালনে কান না দিয়ে সহকর্মীরা এম-এল-এ সাহেবকে জাপটে ধরে রেখেছে।

মৌলবীসাহেব ধীরেসুস্থে নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে, গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখমুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট।

এম-এল-এ সাহেবের দাপাদাপি তখনও থামেনি। ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করছেন—'ভেবেছেন আমি আপনাকে চিনিনি। পুলিসে খবর দেবো আমিও!'

লখনলাল বলে—'করছেন কি আপনি ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব! সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মেজাজ দেখাচ্ছেন। ভোটার-ভোটারীরা মনে করবে কী!'

দুই একটা চিন্তার রেখা যেন পড়ল তাঁর কপালে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দাপাদাপি সব বন্ধ হয়ে গেল। চাপা গলায় বচ্‌কন্‌ মহতোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—'ইলেক্‌শানটা একবার হয়ে যেতে দাও। তারপর এই মৌলবীটাকে নাকখত দিইয়ে ছাড়ব।'

তারপর আবার সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন ভোটারদের

মন পাবার আশু উপায় সম্বন্ধে। আলোচনা যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল, ঠিক তারপর থেকে আরম্ভ হল। অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসঙ্গ থেকে। সর্ববাদি-সম্মতভাবে স্থির হয়ে গেল যে 'স্লোগান' পালটাতে হবে। স্বামী সহস্রানন্দকে লক্ষ্য করেই এগোতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। ভোটারচরণদাসকে হতে হবে গুরুচরণদাস। এইবার স্নানাহারের জন্য উঠতে হয়। লখনলালজী জয়ধ্বনি দিল—'বলো একবার গুরুচরণদাসজীকী জয়।' সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে—Don't ঘাবড়াও গুরুচরণদাসজী।'

বিকালের দিকে এম-এল-এ সাহেব, লখনলাল, আর বচ্‌কন্‌ মহতো, ফলমূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে।

আজ বোধহয় আশ্রমে কোন এক বিশেষ পর্বের দিন। গেটের দুই পাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সম্মুখের রাস্তা, কম্পাউণ্ড, বারান্দা লোকে-লোকারণ্য। ভক্ত স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা, দর্শক, প্রার্থীর ভিড় ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকা শক্ত। কিন্তু আনন্দ-উৎসবের দিনের লোকজনের সেই প্রাণবন্ত লীলা-চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। গুরুদেবের সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে বলে কি এখানে কথাবার্তা বলা বারণ? প্রশ্নভরা চাউনি নিয়ে এম-এল-এ সাহেব তাকালেন নিজের সঙ্গীদের দিকে। লখনলালজীও তাঁরই মত বিস্মিত হয়েছে। তার কাছেও জিনিসটা অপ্রত্যাশিত। অঘটন কিছু ঘটল নাকি? বিষাদের ছায়া? স্বামীজী কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন? সকলের মুখ-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ কেন? আজকে এখানে আসাই বুঝি ব্যর্থ হল! এখানকার প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই যে তাঁর ভোটার। সকলেই তাঁর পরিচিত; তারাও নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে; কারও মুখে সে পরিচিতির সাড়া নাই। কিছু জানবার কৌতূহলটুকুও যেন এরা হারিয়েছে। এ-রকম পীঠস্থানে কারো কাছ থেকে কোন রকম সম্মান পাবার আশা নিয়ে তিনি আসেননি। তবু হেসে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, নিরুত্তর থেকে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকানো, এ জিনিস তাঁর কল্পনারও বাইরের। সম্মুখের এই ভদ্রলোকের মেজ ছেলেটি—তাঁর চেষ্টাতেই গত বছর মেডিকেল কলেজে ভরতি হতে পেরেছে। পাশেই এই যে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একে দুই বছর আগে তিনি 'কণ্ট্রোল'-এর গমের দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন। যারা চোখ বুঁজে, হাত জোড় করে বসে রয়েছে, তারা না হয় দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরা তো দেখতে পাচ্ছে তাঁকে। দেখেও না দেখবার ভান করছে কেন এরা? লোক চরিয়েই খান তিনি। রাজনীতিক জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় প্রত্যহ।

কেউ হাঁ করবার আগেই তিনি বুঝে যান লোকটা কী বলবে। কিন্তু এখানকার এতগুলি 'ভোটার' 'ভোটারী'র হঠাৎ কী হল, সেইটা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছেন না; সবাই মিলে তাকে একঘরে করে, তার সঙ্গে কথা বন্ধ করবার পণ করেছে নাকি? বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা আচমকা আঘাতে এরা সকলে যেন থ হয়ে গিয়েছে। নইলে এরাও তো দেখা যাচ্ছে তাঁরই মত ফল-মূল মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছিল। কারো কারো হাতে আবার টিফিন-কেরিয়ার! রান্না করা জিনিস নাকি ওর মধ্যে? স্বামীজী তো শুধু ফল-মূল খান! ওগুলো বোধ হয় তাহলে তাঁর সঙ্গীদের জন্য।

অবস্থা প্রতিকূল দেখে পিছপা হবার লোক তিনি নন। চোখ বুঁজে দরাজ গলায় 'জয় গুরুদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল। আচম্বিতে দৈববাণী হলেই এক বোধহয় এখানকার ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ এরকমভাবে হঠাৎ জেগে উঠতে পারত। মূক ভক্তবৃন্দ হঠাৎ যেন তাদের কণ্ঠস্বর আর মনের বল ফিরে পেল। সমবেত কণ্ঠস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। 'ভোটারী'দের মিহিগলা সুর মেলাচ্ছে 'ভোটার'দের মোটা গলার সঙ্গে। জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবেশ-লাগা এই সামূহিক কণ্ঠস্বর, এম-এল-এ সাহেবের অতি পরিচিত।

নিদারুণ সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্তবৃন্দ হঠাৎ একটা আঁকড়ে ধরবার মত ধ্বনির আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছে।

পবন অনুকূল। ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস-দৃষ্টি চরণদাসজী অনুভব করতে পারছেন তাঁর সর্বশরীরে। বিমল আনন্দের উদ্ভাস লেগেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন। সত্যিই সবাই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস আবার জেগেছে। সকলে যেন এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে, এখনকার মহামান্য ইয়েমিয়েলিয়েসাহাব বলে। তাদের গোষ্ঠীরই একজন। গুরুভাই। আপনার জন। বড় ভাই। ইয়েমিয়েলিয়ে-ভাইয়া! এঁর সঙ্গে প্রাণ-খুলে কথা বলা চলে।

চরণদাসজী বললেন—'জয় গুরু!'

মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির পিতা 'জয় গুরু' বলে প্রত্যভিবাদন করে, আরও কাছে ঘেঁষে এলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

চরণদাসজীরা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে, এখানে এসেই নাটকীয়ভাবে সহস্রানন্দ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখানে পৌছবার পর, স্বামীজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন।

ভদ্রলোকটি এম-এল-এ সাহেবকে বললেন—'ফল-মূল মিষ্টিগুলো আপনি ওই সম্মুখের বারান্দায় রেখে দিন। কোনও জিনিস গোলমাল হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে।'

'দর্শন পাওয়া যাবে না এখন ?'

'সন্দেহ। কথা আছে এর মধ্যে। শোনেননি আপনি এখনও ?'

'না তো।'

কন্ট্রোলের দোকানধারী লোকটি এরই মধ্যে কখন যেন তাঁর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে একটি কথা বলতে পাবার লোভে।

'মায়লে-ভাই, বিপদে পড়ে আপনার কথা' আমাদের মনে পড়ছিল এতক্ষণ।'

'আমার কথা ? মায়লে আমি ঠিকই ; পথের ময়লা ; ড্রেনের ময়লা। অতি নগণ্য মায়লে আমি। আমাকে আপনারা স্মরণ করতে পারেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আদেশ করুন। সামান্য কাঠবেড়ালিও শ্রীরামচন্দ্রজীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। এই নগণ্য মায়লেও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ফলাফল গুরুদেবের হাতে। জয় গুরুদেব !'

সকলে বলল, 'জয় গুরুদেব।'

তারপর মায়লেভাই এঁদের মুখে সব শুনলেন। উৎকট পরিস্থিতি। সমূহ বিপদ। সব বুঝি যায়। ত্রিভুবন রসাতলে গেল বুঝি এইবার ! তাঁর দরকার নাই, দরকার আমাদের। নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা ভগবানকে আঁকড়ে থাকি। নররূপ নিয়েছেন বলেই কি আমরা ভগবানকে নিয়ে যা নয় তাই করতে পারি ? আমাদের চোখের সম্মুখে ভগবানকে টেনে পাঁকে ফেলা হবে ; আর আমরা তাই পুটপুট করে তাকিয়ে দেখবো কেবল ? যশ, মান, ধর্ম, কর্ম, ভাল মন্দ সব কিছুরই ভার মায়লে-ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ভেবেছিলাম পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকব, কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে এখানে এ কী অনর্থ ! সঙ্কটে পড়লে আমরা সকলে গুরুদেবের স্মরণ নিতে অভ্যস্ত। একমাত্র সেইখানেই প্রাণ খুলে নিজের সব কথা বলা যায় ; বলে বুকের বোঝা হাল্কা করা যায়। তারপর তাঁর আদেশমত চলে, বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে উপায় যে নাই। এ কথা যে তাঁর কাছে তুলতে বাধে। গুরুদেবের কাছে কিছু বলতে বাধা উচিত নয়—তবু বাধে, দুর্বল মানুষ আমরা। অবশ্য তিনি জানতে পারেন সব ; হয়ত তিনিই আমাদের দিয়ে এ-কথা আপনাকে বলাচ্ছেন। নিদ্রায় জাগরণে সব সময় যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমাদের উপর। এই কৃপাটুকু না থাকলে কি আমরা

বাঁচি! আপনি তো শুধু এখানকার মায়লে নন আপনি যে ব্যথার ব্যথী। আপনি যে ভক্ত লোক, সে কথা আর কে জানে না দাদা!'

'আমাকে আর ভক্ত বলে লজ্জা দিও না ভাই। ভক্ত হওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। না আছে সে মন, না আছে সে সময়। সাধে কি লোকে আমাদের মায়লে বলে।'

মায়লে ভাই তারপর সব শুনলেন। এদের বিপদের যথার্থ প্রকৃতিটা বুঝতে একটু সময় লাগল, তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকেরও। বোঝবার পর স্তম্ভিত হলেন। এতো শুধু ভক্তের অনুরোধ নয়; এযে 'ভোটার' 'ভোটারী'দের আদেশ! বললেন—'এতো কারও একার বিপদ নয়? বিপদ যে সমগ্র গোষ্ঠীর! এ বিপদ আমার, আপনার, সকলকার। সমাজের বিপদ; দেশের বিপদ। আমি তো সমাজের বাইরের লোক নই—আমি যে আপনাদেরই একজন। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি, এ-কথা আপনাদের মুখে শোনবার পর?'

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মায়লে ভাইয়ের কাছে আসতে চায়, সকলে তাঁর মুখের আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সকলে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে যে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তিনি আশ্বাস দিলেন—'চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না। এর জন্য দিল্লী পর্যন্ত যদি যেতে হয় তা আমি যাব।'

লখনলাল ভরসা দিল—'সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আমরা লড়ব।'

বচ্‌কন্ মহতো চেঁচিয়ে বলল—'দরকার হলে অনশন করব আমরা সেন্সাস অফিসারের বাড়ির দোরগোড়ায়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দেবো সেন্‌সাস্ অফিসে। আরও কত কি আমরা করতে পারি। চাই শুধু আপনাদের নৈতিক সমর্থন। আপনাদের চোখে আজ যে আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুন আমরা ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে।'

পায়ের ঠোকর মেরে তাকে থামাতে হয়। বক্তৃতা একবার আরম্ভ করলে সে থামতে জানে না।

লখনলাল জয়ধ্বনি দিল—'বোলো একবার শ্রীসহজানন্দ স্বামীজিকী জয়।'

বচ্‌কন্ মহতো হাত তুলে লাফিয়ে উঠে ইনকিলাব জিন্দাবাদের ধরনে চেঁচাল—'ঔর ভী একবার বোলো গুরু মহারাজকী জয়!'

লখনলাল বলল, 'এ সম্বন্ধে এখন একটা কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়?'

বচ্‌কন্ মহতো এ কথায় সায় দিল। 'প্যারে ভাইয়ো আওর বহিনো। আমি প্রস্তাব করছি যে আপনারা সকলে যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন।

তারপর পাঁচ মিনিট শ্রীগুরুজী ভগবানের ধ্যান করুন, চোখ বুঁজে। আমরা ততক্ষণ একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলি। আপনাদের ধ্যানের একাগ্রতার উপরই আমাদের প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করবে।'

'ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব আর আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।'

'শান্তি! শান্তি!'

সকলে চোখ বুঁজে বসেছে। সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা মনে হ'ল যেন ইঞ্চিখানেক ফাঁক হ'ল। ধোঁয়া বার হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিতচক্ষু-ভক্তবৃন্দ আসন্ন সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস পাচ্ছে প্রতিবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই সৌরভ বুকে টেনে নেবার সময়।

ফিস ফিস করে পরামর্শ হচ্ছে নূতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। পরিস্থিতি বদলেছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ নাই। 'স্লোগান পালটাতে হবে ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব।'

চরণদাসজী বললেন—'গুড দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিতে ওষুধ ব্যবহার করবার দরকার কি!'

লখনলাল বলে—'গুরুচরণদাসজীকে এবার হতে হবে মৌলভীচরণদাস। এ না করে উপায় নাই।' সর্ববাদিসম্মতভাবে প্রোগ্রাম স্বীকৃত হয়ে গেল। বচ্‌কন্‌ মহতো চেঁচাল—'বোলো একবার—'।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে দিল লখনলাল—'গুরু-চরণ-কমলো কী জয়!'

এই জয়-ধ্বনি ভক্তদের ধ্যান ভাঙাবার নোটিস। রেডি! আর দেরী করবার সময় নাই মোটেই! সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে! শুধু 'বোলো একবার—সহস্রানন্দ স্বামীজী কী জয়!'

অগণিত নরনারীর মিছিল বার হ'ল সহস্রানন্দ স্বামীর আশ্রমের গেট থেকে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছেন চরণদাসজী। সকলেই চিন্তাভারাক্রান্ত; শুধু লখনলালজী ও বচ্‌কন্‌ মহতো বাদে। তাদের আশ্বাসে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সকলে গুরুদেবের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছে। এ সংসারে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু যে হবার উপায় নাই! আর ভরসা, মায়লে ভাইয়া (মায়লেদা)!

মায়লে-ভাইয়া নিজে কিন্তু মোটেই ভরসা পাচ্ছেন না। মৌলবীটোলার কাছে গিয়ে এক গাছতলায় এই নীরব শোক-মিছিলকে থামতে বলল লখনলাল।

'এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব একাই যাবেন সেই বদ মৌলবীটার বাড়িতে।'

'প্যারে ভাইয়ো ঔর বহিনো! মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেজন্ত আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি। জয় গুরু, জয় গুরু; মায়লেজী আর দেরী করবেন না আপনি।'

বহু রকম বিষয়ের তদ্বির এম-এল-এ সাহেব জীবনে করেছেন। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই। চরণদাসজীর পা কাঁপছে। হাইকম্যাণ্ডের নাম স্মরণ করেও মনে বল পাচ্ছেন না তিনি! মৌলবীসাহেব বাড়ির বারান্দায় গড়গড়া টানছিলেন। দা-কাটা তামাকের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন মৌলবীসাহেব।

'আসুন, আসুন, এম-এল-এ সাহেব। সেলামালেকুম।'

ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার আগেই, চরণদাসজী গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের উপর। বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামা সম্বলিত পা তুখানা। 'করেন কি, করেন কি, এম-এল-এ সাহেব!'

তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না— যতক্ষণ না মৌলবীসাহেব কথা দিচ্ছেন যে তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন।

'না না, আপনি আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন, তাতেই হয়ে গিয়েছে। সে পুরনো কথা আর তোলবার দরকার নেই। ছাড়ুন! উঠুন উঠুন। এই চেয়ারে বসুন!'

'না, আপনি আগে কথা দেন।'

'বলছি তো। আপনি এসেছেন সেই যথেষ্ট। আর মাপ চাইতে হবে না। রাগের মাথায় লোকে কত সময় কত কি বলে ফেলে। সে সব কথা কি ভদ্রলোকে মনের মধ্যে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?'

'আপনি কথা দেন, আগে।'

'কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন বারবার। যা হবার হয়ে গিয়েছে। পা ছাড়ুন!'

কথা আদায় করে চরণদাসজী উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন—'এখানকার সকলে আজ অতি বিচলিত। এত বড় বিপদ তাদের জীবনে কখনও আসেনি। এ বিপদ থেকে সকলের উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র আপনি। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।'

'আমি?' 'হ্যাঁ, আপনি।'

'খোদা হাফেজ! বলেন কী!'

সন্দিগ্ধ মৌলবীসাহেব জোরে জোরে নিশ্বাস টানলেন দুইবার, এম-এল-এ সাহেবের মুখ থেকে কোনরকম গোলমেলে গন্ধ বার হচ্ছে কিনা তাই পরখ করবার জন্ম। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশী।

'বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি। এক কথায় বলবার মত নয় ব্যাপারটা। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আজ আপনি সামান্য ব্যক্তি নন। এতগুলি লোকের জীবন-মরণ স্বর্গ-নরক নির্ভর করছে আপনার কলমের এক খোঁচার উপর। সবাই আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে।'

'বলুন না, কি করতে হবে।'

এতক্ষণে চরণদাসজী আসল কাজের কথাটা পাড়লেন। গলার স্বর কাঁপছে। মৌলবীসাহেবের বিবেকে বাধতে পারে; সেইটাই তাঁর আসল ভয়।

'মৌলবীসাহেব, আজ সকালে আপনি স্বামী সহজানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন লোক গণনার কাজে। সেই সম্বন্ধেই কথাটা। সেখানে আশ্রমের বাসিন্দাদের গোনবার সময় স্বামীজীকেও গুণে ফেলেছেন। আপনার ফাইলে মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর নামটা কেটে দিতে হবে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান।'

মৌলবীসাহেবের অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

## দাম্পত্য সীমান্তে

মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোষ্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পার্সেল, বিলি না হয়ে ফেরত যায়, এই পোষ্টাফিস থেকে।

সত্যই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোষ্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসে। এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে যায়; মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্যরকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারী কোটে, পুলিসের লোক দেখলে ভয় পায় না; আবগারী-বিভাগের লোক দেখলে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এইরকম আবহাওয়াই নিবারণ পোষ্টমাষ্টারের পছন্দ।

অসীমার পছন্দ নয়; কিন্তু উপায় কি। যেমন মানুষের হাতে মা বাপ তাকে সঁপে দিয়েছে। ছোটবেলায় ঠাকুমা নাতনীকে ঠাট্টা করে

বলতেন—দেখিস, তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেবো যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তোকে লাঠিপেটা করবে। অসীমা বলত—'ইস্! ঝাঁটা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো না!' তার কপালে ঠাকমার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত! বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। অমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষে আবার মদ খায়!

তারপর গত সাত বছরে আরও কত কি জেনেছে, কত কি শিখেছে, কত কি করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশী, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর না-ই থাক।

এখানকার লোকে পোষ্টমাষ্টারকে মাষ্টার-সাহাব বলে। সেইজন্যই বোধহয় সে প্রথম রাত্রিতেই স্ত্রীর উপর মাষ্টারি ফলিয়েছিল, শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে একটু চালাক-চতুর করে নেবার সদুদ্দেশ্যে। বলেছিল, 'হাবাতেদের সঙ্গে খবরদার আলাপ কর না! আলাপ পরিচয় করতে হয় ত বড়লোকের সঙ্গে। যার হাতে কিছু আছে, তার হাত থেকেই না কিছু আসতে পারে! আমল না পেলেও বড়লোকের বাড়ির আড্ডার এক কোণায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি প্রত্যহ, খবরের কাগজের উপর মুখ গুঁজে। সময়ে কাজে লেগেছে।'

তখনই অসীমার মনে হয়েছিল—এমন কার্তিকের মত যার চেহারা, স্বভাব তার এমন কেন? আগে থেকে এত মতলব কেঁদে কি সবাই কাজ করতে পারে?

যে স্বামী প্রথম রাত্রিতেই এই কথা বলে, সে যে শুধু মুখের উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, এ জানা কথা। এখানে আসবার পরই নেপাল বাজারের শেঠজীকে একদিন বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সঙ্গে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর।

উপরওয়ালা 'ইন্সপেকশন' এ এলে, তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা।

এ স্বামীকে চিনতে কি কারও দেরি লাগে। সবচেয়ে খারাপ লাগে তার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিস্পৃহতার ভাব। সে দেখতে সুরূপা নয়। সেই জন্যই বোধহয় তার মনের এই দিকটা আরও বেশী স্পর্শাতুর। তবে নিবারণ রাত্রিতে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এত দুঃখের মধ্যেও এইটাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ হল কি?

সমীর ঠাকুরপো সেই সাড়ে সাতটা থেকে যাই যাই করছে। সে বলেছে—'বস না। এত কি বাড়ি যাবার জন্য তাড়া পড়েছে! তবুতো এখনও বিয়ে করনি। তোমার দাদাকে আসতে দাও, তারপর যেও।'

বেশ লাগে তার সমীর ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে। রেলস্টেশনের মালবাবুর ভাই। আই কম পাস করে চাকরির চেষ্টা করছে। রোজ আসে। রান্নাঘরে বসে বউদির সঙ্গে গল্প করে।

আটটা বাজল, নটা বাজল। তবু নিবারণের ফেরবার নাম নেই। অসীমা জানে যে নিবারণ আজ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কিছু কাঁচা পয়সা সে হাতে পাবে। সেইজন্যই দেরি হচ্ছে না তো? ছ বছরের ছেলে ফনটে; সে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন। খাওয়া হলে, সবাই এল শোবার ঘরে। ঘরের কোণায় স্বামীর খাবার ঢেকে রেখে আবার তারা বসল সুখ দুঃখের গল্প করতে। জিমি কুকুরটা অনবরত ডাকছে।

দশটা বাজল। তবু নিবারণ আসে না। মশারির ভিতর কেন যেন ফনটের ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই।

'কটায় খাও তুমি রোজ ঠাকুরপো?'

'ঘরে রুটি ঢাকা থাকে, যখন খুশি খাই।'

'তবে আর এত উসখুস করছ কেন, যাবার জন্য?'

'না, অনেক রাত হল। দাদার আজ হল কি?'

'কে জানে! কোথাও কোন ড্রেনেটেনে পড়ে রয়েছে বোধহয়!'

কথার মধ্যে বিরক্তি সুস্পষ্ট। নিবারণের মদ খাওয়ার কথা এখানে সবাই জানে। একথা বলতে সমীর ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা নাই। পাছে আবার সমীর নিবারণের বাইরে রাত কাটানর অন্য অর্থ করে নেয়, সেইজন্যই অসীমা মদ খাওয়ার দিকটার উপর জোর দিয়ে কথাটা বলল। স্বামী বাইরে রাত কাটায়, একথার জানাজানিতে শুধু বাইরের লোকের কাছেই লজ্জা নয়, নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ অসীমার খেয়াল হল যে, ফনটের সম্মুখে তার বাপের মদ খাওয়ার গল্প করাটা ঠিক নয়। 'চল ঠাকুরপো, আমরা গিয়ে বসি। কিরে ফনটে তোর ভয় করবে না তো আমরা ওঘরে গিয়ে বসলে? মাঝের দরজা তো খোলাই থাকল।'

মাঝের দরজা খুলে তারা গিয়ে বসল পোস্টাফিসের ঘরে। 'জিমি! চুপ করলি না! জ্বালাতন!'

এই মানসিক অবস্থা; এমন দরদী শ্রোতা; নিজের দুঃখের কথা বলবার

সময় অসীমার চোখের জল বাধ মানেনি। এগারটার পর সে নিজে থেকেই সমীরকে চলে যেতে বলেছিল। যাবার সময় সমীর আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল—'দাদা রাত্রিতে আসবেন ঠিকই। বারোটা, একটা হতে পারে।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

বলেই নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল কথাটা। এত জোর দিয়ে ওকথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমীরকে কেন, নিজের মনকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। নিজেকে স্তোক দেবার জন্য ঘরের আলোটা শোবার আগে নেবাল না। নেবানর অর্থ হত, নিবারণ যে আজ আসবেও না, খাবেও না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।……খাটের তলায় ইঁদুর খুটখুট করে। ডাকঘরে ঘড়ি বাজে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবে; আর চোখের জলে বালিশ ভেজে সারারাত। পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত তার কি আর কোন দামই নাই স্বামীর চোখে?…

স্বামী সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মদ। তারপর টাকা। কিন্তু তারপর?

জিমিটারও আজ হল কি? সেও সারারাত ডেকে ডেকে সারা।

শেষ রাত্রিতে চোখের পাতা কখন যেন বুজে এসেছিল। ঘুম ভাঙল হঠাৎ। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। ফনটে হাত দিয়ে ঠেলছে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। মনের তিক্ততা ঘুমিয়েও কাটেনি। কড়ানাড়ার শব্দের অধীর রূঢ়তা, মেজাজ আরও খারাপ করে দেয় অসীমার।

'জেগে রয়েছিস—উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারিস না! বুড়ো ধাড়ি ছেলে!'

চুল ধরে টানাটা এত অপ্রত্যাশিত এই ভোরবেলাতে যে ফনটে কাঁদতে ভুলে গেল।

—রামদেনীর মা কড়া নাড়লে এর আগেওতো কতদিন মাকে ডেকে তুলে দিয়েছে। তারজন্য কোনদিন তো মাকে রাগ করতে দেখেনি।——মশারি থেকে বেরিয়ে, দুমদুম করে পা ফেলে মা দরজা খুলে দিতে গেল। খটাং করে শব্দ হল। রাগ করে খিল খুললে ওই রকম শব্দ হয়। জিমিটা নিশ্চয় ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকি! মা এমন দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকলো কেন? বিড়াল আসেনি তো।—মা খপ করে একখান পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। ঢাকা তুলে বাবার জন্য রাখা ভাতগুলোকে খবরের কাগজের উপর ঢালছে। খবরের কাগজে আবার ভাত রাখে নাকি লোকে? জিমির জন্য নিশ্চয়ই। মা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

মা মিছামিছি ভয় পাচ্ছে, জিমি বুঝি এখনই ঘরে ঢুকে ওই ভাত খেয়ে নেবে। জিমি যে চলে গিয়েছে বাইরে।

মশারির ভিতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মার কাণ্ডকারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

——একমুঠো ভাত মা আবার থালায় রাখল। ডাল তরকারী দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচ্ছে। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেও তাকাল। ওকি! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে; এই সাতসকালে। বাসিমুখে। ভুল দেখছে নাকি সে? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার ওপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচ্ছে। এরকম সময় মার দিকে তাকাতে নাই; লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানলার দিকে। রামদেনীর মা আসছে জানলার দিকে।

অসীমা সত্যিই তাকিয়েছিল মশারির দিকে। সে দেখছিল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নাকি, এখন মশারির ভিতর কে আছে, না আছে। না। যাক। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে কোথায় অসীমা। মুহূর্তের মধ্যে সে কতদিক সামলাবে। তার মত অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই জানে। সে বুঝতে পারেনি যে দরজার কড়া নাড়ছিল রামদেনীর মা। ভেবেছিল বুঝি ফনটের বাবা। হঠাৎ ঘুম ভাঙবার পর ঠাহর পায়নি। ভাগ্যে ঠিকেঝি রামদেনীর মা কোনদিনই শোবারঘরে ঢোকে না।

জল খানিকটা মেঝেতে ফেলে, ডালতরকারি-মাখানো হাতটা ডুবিয়ে ধুয়ে নিল গ্লাসের মধ্যে অসীমা। রামদেনীর মা দোর-গোড়ায়। এঁটো থালা-বাসনগুলো তার হাতে দেবার সময় অসীমা চোখ নামিয়ে নেয়। কুয়াতলায় মুখ ধুতে যাবার আগে শোবার-ঘরের দরজা আবজে দিতে ভোলে না। স্বামী রাত্রিতে ফেরেনি এই কথাটা ঝিকে জানতে দিতে চায় না সে।

বীরবাহাদুর নেপালী বাইরে থেকে ডাকে 'মাইজী!'

এই ডাকঘরের ঠিকানায় নেপাল এলাকার যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে, সেগুলোকে ঘরোয়া ব্যবস্থায় বিলি করবার জন্য বীরবাহাদুর প্রত্যহ নিয়ে যায়। তার কাঁধে ডাকের ঝুলি। জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে তার গায়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। রামদেনীর মা কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরকে বলে গেল—'আজ বোধহয় একটু দেরি হবে মাস্টারসাহেবের। এখনও

ঘুমুচ্ছে। কাল রাতে বোধ হয় চলেছে খুব।' বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অসীমা এসে দাঁড়িয়েছে।

'বীরবাহাদুর, তুই একটু ঘুরে ঘেরে আয়।'

ঠোঁটের কোণায় হাসি এনে চোখের ইশারায় বীরবাহাদুর বুঝিয়ে দিল যে রামদেনীর মা বহুদূরে চলে গিয়েছে; অত সাবধান হয়ে কথা বলবার দরকার আর নাই।

'মাষ্টারসাহেবের কথাতেই তাড়াতাড়ি এলাম সাইকেলে। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। হেঁটে আসছেন কিনা।'

কেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে সেকথার কোন মূল্য নাই অসীমার কাছে।

'দেখা হল কোথায়, মাস্টারসাহেবের সঙ্গে?' জিজ্ঞাসা করবার সময় কুণ্ঠায় বীরবাহাদুরের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

'আমার বাড়িতেই তো তিনি সারারাত।'

মনটা হালকা হালকা লাগে।

'সারা-রাত?'

বীরবাহাদুর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মাথায় তার গুরুদায়িত্ব। ডাকের থলে থেকে একটা পার্সেল বার করতে করতে বলে—'এটাকে দেবার জন্য কাল রাতেও একবার এসেছিলাম।'

'রাত্রিতে? ক'টার সময়? কেন? খুব দরকারী নাকি?'

'দরকারী না হলে কি আর অত রাতে নিয়ে এসেছিলাম! মাস্টারসাহেব তখন নেশায় চুর। উনি কি তখন আসতে পারেন।'

'তবে রাত্রিতে দিলি না কেন?'

একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সে বলল—'দেখলাম ডাকঘরের মধ্যে আপনি আর মালবাবুর ভাই গল্প করছেন। বাইরের লোকের সম্মুখে তো জিনিসটা দিতে পারি না আপনার হাতে। রাতদুপুরে পোস্টাফিসের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ আছে। তাই চলে যেতে হল। গিয়ে মাস্টারসাহেবকে বলতেই তিনি চটে আগুন মালবাবুর ভাইয়ের উপর। ওই নেশার মধ্যেও, জ্ঞান টনটনে। বলে ভোজালি লে আও বীরবাহাদুর। অভী লে আও! খুন করব ছোঁড়াটাকে আমি! কী চীৎকার! সে কি সামলান যায়!'

শিহর খেলে গেল অসীমার সারাদেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ

অনাস্বাদিত একটা জিনিসের স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।

ভয়ের অভিনয় করে সে বলে—'তাই নাকি! ওরে বাবারে! তাহলে কী হবে! তাহলে আমি কী করি! তখনই আসছিল নাকি ভোজালি নিয়ে?'

বীরবাহাদুর ও প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। 'না না, কিছু ভাববেন না, মাইজী। নেশায় যে মানুষ হাঁটতে পারছে না, সে মানুষ তখন আসছে ভোজালি নিয়ে মারতে! আপনিও যেমন!'

'না না বীরবাহাদুর। যত নেশাই করুক, জ্ঞান মাস্টারসাহেবের টনটনে থাকে। জানিতো তাকে।'

'থাকে তো থাকে!'

তাড়া দিয়ে উঠেছে বীরবাহাদুর। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাজে গল্প করা ছাড়বে না এই মেয়েমানুষের জাতটা! সে কাজের কথা পাড়ে।

'এই নিন মাইজী পার্সেলটা। সব ঠিক করা আছে। আপনি শুধু সেলাইটা করে রেখে দিন। এখনই। একটুও দেরী করবেন না। মাস্টারসাহেব এই এলেন বলে। এসেই সেলাইয়ের উপরের গালা মোহরগুলো ঠিক করে বসিয়ে দেবেন। শেঠজী রাত দশটার সময় মাস্টারসাহেবের কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যই না এত তাড়া।'

জরুরী খবর? আর বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে অসীমা বুঝে গিয়েছে খবরটা কিসের। কেনই বা বীরবাহাদুরকে নিবারণ তখনই পাঠিয়েছিল। আসবার মত অবস্থা থাকলে নিজেই আসত। ইনস্পেকশন অফিসের ডাকঘর খুলবার সময়ের আগে বোধ হয় আসবেন না। অফিসারদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, সব অসীমার জানা। পার্সেলটা সেলাই করতে আধঘণ্টাও সময় লাগবে না।

'ফনটে, জামাজুতো পরেনে! বীরবাহাদুর ফনটেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাতো।'

অসীমা ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়ে শাড়ি বদলে নিতে। চায়ের জল একটু পরে চড়ালেই হবে।

কিন্তু সময় আর পাওয়া গেল না। সবে সেলাই করতে বসেছে পার্সেলটা— মোটর গাড়ি এসে থামল পোস্টাফিসের সম্মুখে। একখানা ছোট, একখানা বড় গাড়ি। এতো কেবল 'ইন্সপেকশন'-এর উপরওয়ালা নয়। এ যে অনেক লোক! ডাকবিভাগের অফিসার; আবগারী বিভাগের অফিসার; পুলিসের অফিসার; নিবারণ নিজে; পুলিস কনস্টেবল। পথে দেখা

হয়ে গিয়ে থাকবে নিবারণের সঙ্গে। তাহলে তো স্বামীর সমূহ বিপদ। এত বড় বিপদের মুখে অসীমা কোনদিন পড়েনি। হে মা কালী, বাঁচাও। ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। পার্সেলের ভিতরের গাঁজার পুঁটলিটাকে সে কয়লাগাদার নীচে রাখে। পার্সেলের উপরের ন্যাকড়ার মোড়কটাকে উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। হে মা কালী, গালা আর ন্যাকড়াপোড়া গন্ধটা যেন হাওয়ায় পোস্টাফিসের উলটো দিকে উড়ে যায়! এখন একবার নিবারণের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারলে সুবিধা হত। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। গুটি গুটি লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে। নিবারণ অফিসারদের বলছে—অফিসের চাবি বাড়িতেই আছে; সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাবার সময়; বাড়ির ভিতর দিয়েও পোস্টাফিসের ঘরে ঢোকবার আর একটা দরজা আছে; বাড়িতে আছে স্ত্রী আর একটি ছয় বছরের ছেলে; আর বাইরের লোকের মধ্যে আসে ঠিকেঝি রামদেনীর মা। পুলিস এখন স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণকে দেখা করতে দিতে রাজী নয়। একজন এসে অসীমার কাছ থেকে পোস্টাফিসের চাবি চেয়ে নিয়ে গেল।

ডাকঘরে টেবিলে দুটি চায়ের কাপ। 'এ আবার এখানে কোত্থেকে এল।' বলেই নিবারণ কাপ দুটোকে টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল। অফিসাররা পার্সেল সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখতে চাইলেন।

'কালকের তারিখে, এই যে এত নম্বরের পার্সেল সম্বন্ধে লিখেছেন—এই নামের কোন ব্যক্তি ওখানে নাই—এটা আজ কলকাতায় ফেরত পাঠান হবে প্রেরককে—দেখি সেই পার্সেলটা।'

সিন্দুক থেকে সেটাকে বার করে দিতে গেল নিবারণ। শেষকালে মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে থেকে অসীমা সব শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ নিজেই প্রথম কথা তুলল—নিশ্চয়ই পার্সেলটা কেউ চুরি করেছে। তার মনে আছে যে সে কাল পার্সেলটা সিন্দুকে রেখেছিল। তারপর সারারাত সে বাড়িতে ছিল না। বাইরের তালা যখন ভাঙা নয়, তখন চোর নিশ্চয়ই ঢুকেছে বাড়ির ভিতর দিক দিয়ে।

বীরবাহাদুরের কাছ থেকে স্বামীর সম্বন্ধে নতুন একটা খবর পাবার পর থেকে, অসীমার মনে নতুন নেশা লেগেছে। আসন্ন বিপদের মুখেও সে নেশার আমেজ কাটেনি। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে নিবারণের চোখ মুখের ভাব সে একবার দেখে নিল। মনে হল যেন ঈর্ষার রেশের সন্ধান পাচ্ছে সেখানে। বাড়ির হাটে তার নিজের ফেলা নিজের মূল্যের প্রথম স্বীকৃতি।

অফিসাররা এইবার বাড়ির ভিতর ঢুকলেন অসীমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তার বেশভূষার আড়ম্বর প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কাল বিকালের পর থেকে পোস্টাফিসের ঘরে কেউ ঢুকেছিল ?'

'না।'

স্বামীর চোখের লেখা দেখবার নেশা তখন অসীমাকে পেয়ে বসেছে।

হাঁ হাঁ করে উঠেছে নিবারণ, কি বলতে হবে, স্ত্রীকে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য।

'মেয়েমানুষ। ভয়ে মিছে কথা বলছে হুজুর।'

'মিছে কেন হতে যাবে। কেউ ঢোকেনি ওঘরে।'

'কেউ ঢোকেনি তো দুটো চায়ের কাপ কেন ছিল টেবিলের উপর ?'

চটে উঠেছে নিবারণ।

'ও কালকে দুপুরের। তুমি যে দুপেয়ালা চা খেয়েছিলে একসঙ্গে।'

ঘরের বাক্স পেঁটরা সার্চ করা হল। অফিসার শুধু বললেন—'নতুন নতুন জরিদার বেনারসী শাড়ী আপনার অনেকগুলো দেখছি।'

'হ্যাঁ, ওগুলো বিয়ের সময় পাওয়া।'

এছাড়া আর কোন কথা বার করা গেল না অসীমার মুখ থেকে। ফনটেকে ডাকা হল।

টফি, লজেঞ্চুস খেয়ে, সে বলল যে সমীর-কাকা কালরাত্রিতে মার সঙ্গে ওঘরে গল্প করছিল, আর মা মাতালের ভয়ে কাঁদছিল। বাসিমুখে ডাঁটা চিবুবার কথা যে বলতে নাই তা সে জানে। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে রাম-দেনীর মা বলল যে, কাল রাত্রিতে সমীর এখানে ছিল।

'তাহলে আপনাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকেই থানায় যেতে হয় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

ফনটেকে অফিসার গাড়ীর সম্মুখে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। অসীমা আর নিবারণ বসল ভ্যানের পিছন দিকে। পথ থেকে পুলিস সমীরকেও ভ্যানে তুলে নিল। সে বসল একা অন্যদিককার বেঞ্চে। সবাই নির্বাক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। সে ধুলো খেতে খেতে মালবাবু সাইকেল চালিয়ে আসছেন গাড়ির পিছনে পিছনে। সমীর গাড়ীর বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেঞ্চের দিকটায় ছায়া; আর অসীমাদের বেঞ্চের দিকটায় রোদ্দুর পড়ছে। হঠাৎ অসীমা উঠে সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। ভাবে মনে হল যে সে রোদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বসবার সময় অসীমা স্থির

লক্ষ্য রেখেছে নিবারণের চোখের উপর। নিবারণও তার দিকে তাকিয়ে। যাতে পুলিসরা না দেখতে পায় সেইজন্য সে হাতখানা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে স্ত্রীকে ইশারা করল সমীরের দিকে আরও ঘেঁষে বসতে। স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসাসূচক ব্যঞ্জনাও তার চোখমুখে নির্লজ্জ ছাপ ফেলেছে। ঈর্ষার চিহ্নও নাই সেখানে।

যা ভাবতে ভাল লাগে, সেইটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল এতক্ষণ অসীমা। এতক্ষণে মিষ্টিভুলের নেশা কাটে। চূড়ান্ত অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

'কেন, ওর কাছে ঘেঁষে বসব কেন। 'হুকুম?' অসীমা এসে ধপ করে বসল নিবারণের পাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল গাড়ীর পার্টিশনের লোহার জাফরি ধরে।

'শুনছেন পুলিসসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে—এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর, আর নেপালবাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাতজন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ী, টাকা, আরও কত কি। যেমন এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে এরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা। যে গাঁজার দাম নেপালে চার পয়সা, তার দাম কলকাতায় দেড় টাকা। কলকাতা থেকে যে মিথ্যা পার্সেল পাঠায় সে-ই আবার গাঁজাভরা পার্সেল ফেরত পায়। অনেক দিন থেকে এই করে আসছে এরা। আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে দিয়ে গাঁজা ভরা পার্সেল সেলাই করায়। যাদের হাতে এত লোকজন, যারা সিলমোহর বাঁচিয়ে সেলাই কাটতে জানে, তারা কি আর সেলাই করবার একটা লোক পেত না ইচ্ছা করলে। শুধু আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমায় রেশমী শাড়ী দিয়েছে। লোকটা কি কম বদমাইস! তিন বছর পরে কি করবে সেসব ওর আজকে থেকে ছককাটা থাকে। একটা কথাও লুকবো না আমি হুজুর। গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা বাপ! বিয়ে না ছাই! ইচ্ছা করে যেখানে দুচোখ যায় চলে যেতে! পারিনি শুধু ফনটেটার মুখ চেয়ে। জেলে ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন পুলিসসাহেব! তা'হলেই আমি সব সত্যি কথা বলব।'…

এতক্ষণে নিবারণ কথা বলল।

'কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা। নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।' তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

## অলোকদৃষ্টি

'কে? বড় খোকা?' কথাগুলো জড়ানো জড়ানো।

কেউ সাড়া দিল না।

'দরজার আড়ালে কে তুই? সাড়া দিচ্ছিস না যে? জিলিপির গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুই। কি যেন তোর নাম?'

ঠাকুমাকে চটাতে খুব ভাল লাগে অজয়ের। যতক্ষণ তার নাম ধরে না ডাকছেন, ততক্ষণ সে কিছুতেই উত্তর দেবে না।

'এই জিলিপিখেগো! কথা কানে যাচ্ছে না? কি নাম যেন তোর? কিছুতেই মনে থাকে না তোর নামটা।'

অজয়ের মা চেঁচালেন ওধর থেকে, 'হচ্ছে কি অজয়! তোর ঠাকুমা কি বলছেন শুনতে পাচ্ছিস না? দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে!'

'অজয়, অজয়। এই দেখ মনে পড়ল এতক্ষণে। কেবল ভুলে যাই। পুরনো কালের নাম-ধাম সব কথা মনে থাকে, অথচ আজকালকার কথা ভুলে যাই। হ্যাঁ রে, কিসের জিলিপি? ত্রিকূটের নাকি? ত্রিকূট কাকে বলে জানিস তো? পানিফলের আটা দিয়ে যে জিলিপি তয়ের করা হয়, তাকে বলে ত্রিকূটের জিলিপি।'

'এর চেয়ে আমাদের ওখানকার অমৃতি খেতে অনেক ভাল।'

'বললেই হল আর কি! ত্রিকূটের জিলিপির গন্ধই আলাদা। আমার খুব ভাল লাগে গন্ধটা। হ্যাঁ রে, এই সকালে জিলিপি ভাজছে কে?'

'মা।'

'একটুখানি ভেঙে আমার সম্মুখের জানলার উপরে রাখ্ তো।'

'না, মা বকবে তোমার ঘরে এঁটো জিলিপি নিয়ে গেলে।'

'তোর মা বড়, না ঠাকুমা বড়? তোর বাবাকে আমি পেটে ধরেছি বুঝলি! আর আজ তুইও আমাকে হেনস্তা করিস। সবই আমার কপাল! বেশী দিন বাঁচলে এ-ই হয়! মরতে তো আমি চাই। মরবার জন্যই তো ত্রিশ বছর আগে কাশীতে এসেছিলাম। কিন্তু মরণ আমার হয় কই।'…

মরবার কথা একবার আরম্ভ হলে ঠাকুমা থামতে জানে না। এ এখন চলবে বহুক্ষণ ; তাই অজয় সেখান থেকে উঠে পালাল।

'ওরে, বড়খোকা উঠেছে ?'

কথার কেউ উত্তর না দেওয়ায় বৃদ্ধা মোটা কাচের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে। পালিয়েছে ছোঁড়াটা।

'কি বলছেন মা ?'

ছোটবউমা এসে দাঁড়িয়েছেন দোড়গোড়ায়।

'বড়খোকা কোথায় ?'

'বঠ্‌ঠাকুর এখনও ওঠেন নি। তাঁকে ডেকে দিতে বলব ?'

'এখনও ওঠে নি ! আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার কাছে রোদ এসে পড়েছে ; এখনও ওঠে নি ? চিরকাল একই রকম থেকে গেল ছেলেটা ! স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে !'

'বঠ্‌ঠাকুরকে ডেকে দিতে বলব নাকি ?'

'না না, দেখি কতক্ষণ ঘুমোতে পারে !'

'কিছু বলবেন মা ?'

'তোমাকে ? না তোমাকে কি জন্য বলতে যাব ? নিজের পেটের ছেলেদের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি ; তার আবার তোমরা ! আর এখন মায়ের কদর নেই। বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি, ও হয়েছে তাই। মায়ের কাজ ফুরিয়েছে। যেতে তো চাই ; কিন্তু যমে যে নেয় না। কত লোক দেখি কাশীতে এল আর চোখ বুঁজল। কত যাত্রী দেখি এখানে কলেরায় মরে, মায়ের কৃপায় মরে, গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে মরে, আরতির ভিড়ে পিষে মরে, কিন্তু সে কপাল নিয়ে তো আমি আসি নি কাশীতে। তোমরাও চাও আমি যাই ; আমারও আর বাঁচবার সাধ নেই একদিনের জন্যও। কিন্তু যম ফিরে তাকালে তবে তো ! ওকি ছোটবউমা, চলে যাচ্ছ ? শোন। ছোটখোকার চা খাওয়া হয়েছে ?'

'এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি।'

'এখনও ফেরে নি ! দেরি করে বেরিয়েছিল নাকি আজ বাড়ি থেকে ?'

'না।'

'তবে ? তা হলে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কিছু বলে-টলে যায় নি তো ?'

'না, বাড়ি থেকে বার হবার সময় আমি দেখি নি।'

'তা দেখবে কেন। কোন্‌ রাজকার্য করছিলে তখন ? তোমার ওই

ছেলেটাকে বলো, একবার গলিতে বেরিয়ে দেখুক। বামুনঠাকরুণও যাক না একবার একটু খোঁজ নিতে।'

'বামুনঠাকরুণ স্নান করে এখনও ফেরে নি।'

'এখনও ফেরে নি? আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার উপর রোদ্দুর পড়েছে, এখনও তাঁর ঘাট থেকে ফেরবার সময় হল না! তোমরা দুই জায়ে রান্নাঘরে ঢোকো বলে সে মাগী হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও; ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবো আজ! কাজের সময় ডাকলে যে মানুষকে পাওয়া যায় না, তাকে মাইনে দিয়ে রাখব কেন? ভাবছে যে আমি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছি, কাশীতে থাকতে গেলে ওর উপর নির্ভর করতেই হবে। তাই এত বাড়! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? এখান থেকে এখানে তো ঘাট! যেতে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? আমি নিজে আজ চার বছরের মধ্যে গঙ্গাস্নান করি নি, আর বামুনঠাকরুণ গঙ্গাস্নান করে প্রত্যহ দু-বেলা। কপাল! যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে! নইলে আমি না মরে এমন ভাবে অপারগ হয়ে পড়ে থাকব কেন। দুবার তো অসুখে পড়ে মরব মরব হয়েছিলাম। কিন্তু মরণ কপালে থাকে, তবে তো। দুবারই বড়খোকা, ছোটখোকা ছুটি নিয়ে এসেছিল তাদের বউ-ছেলেপিলেদের সঙ্গে নিয়ে। দুবারই তাদের হতাশ করে, অসুখ থেকে সেরে উঠেছিলাম। মুখ চুন করে তারা ফিরে গিয়েছিল কাশী থেকে। স্বামী স্বর্গে গেছেন ষাট বছর আগে। এই ষাট বছর ধরে আমি বেঁচে রয়েছি শুধু ছেলে-বউদের জ্বালাতন করবার জন্য। মরণ তো কারও হাতধরা নয়। ইচ্ছামৃত্যু হয় শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের। আমি বেঁচে আছি কেবল সকলের অভিসম্পাত কুড়োবার জন্য!'

বৃদ্ধা হাউহাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিধবা হবার পর, কত কষ্ট করে বড়খোকা আর ছোটখোকাকে মানুষ করেছিলেন। ছেলেরাও চিরদিন মা বলতে পাগল। বউরাও ভাল; কাশীতে আসবার আগে কয়েক-বছর তাদের নিয়ে ঘর করেছিলেন তো; ভাল করেই জানেন তাদের। তবে কেন এমন হল? এমন ভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া সহস্রগুণে ভাল!...

ছোটবউমা কখন সেখান থেকে চলে গিয়েছেন সেকথা তাঁর খেয়াল নাই। তিনি আপন মনে বকে চলেছেন।

বউমারা কেউ শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করেন না। তিনি যা মুখে আসে বলে যান; কিন্তু কেউ সে-কথা গায়ে মাখে না। সকলে ভাবে, কী মানুষ ছিলেন—আর কী হয়েছেন আজ! ব্যারামে ভুগে ভুগে ইদানীং মাথায়ও

একটু ছিট হয়েছে। বিশ্বাস পান না কাউকে। যাদের সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন তাদেরই উপর অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশী।

'ও কী! কিসের শব্দ? বড় বউমা!'

'কি বলছেন মা?'

'কিছু পড়ল-টড়ল নাকি তোমার ঘরে?'

'না, ও কিছু না।'

'কিছু না আবার কি। শব্দ শুনলাম, তবু বলবে কিছু না! হলেই বা তুমি বাড়ির গিন্নী, আমাকে বললে কি সংসারের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে? এখনও আমি মরি নি, বুঝলে। মরতে পারলেই তো বাঁচতাম; কিন্তু যমের অরুচি যে আমি।'……

আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর বকুনি।

কানের পাশে বাক্সর ডালা পড়বার শব্দতে বড়খোকারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই সাত-সকালে বাক্স গোছাবার কী দরকার পড়েছিল? মার একটানা বকুনির আওয়াজ কানে আসছে। ওঘরে যাবার আগে একবার চোখেমুখে জল দিয়ে নেওয়া দরকার। নইলে মা বিরক্ত হন।

'কে রে? ছোটখোকা?'

'হ্যাঁ।'

ছোটখোকা এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। মাথার চুল পাকা। দাড়ি-গোঁফ কামানো।

'বেড়িয়ে ফিরছিস? এত দেরি হল কেন রে আজ? রাস্তায় চা-বিস্কুট হেঁকে যাবার আগে থেকে আমি উঠে বসে আছি, তুই কখন বেরিয়ে গেলি বুঝতে পারলাম না তো। হাত-পা ধুয়েছিস? হাতে ও কি রে? কি কিনে আনলি?'

জবাব না দিয়ে উপায় নাই।

'কাঠের খেলনা।'

'খেলনা কি হবে?'

'নাতনীর জন্য কিনে রাখলাম।'

বড়বউমা ডাকলেন ওঘর থেকে, 'ঠাকুরপো, চা খেয়ে যাও।'

'আসছি।'

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছোটখোকা চলে গেলেন সেখান থেকে।

মা বোঝেন, যে কেউ তাঁর সঙ্গে দরকারের চেয়ে বেশী কথা বলতে চায় না আজকাল। সময়ের অভাব নাই কারও; তবু তাদের কথা বলবার গরজ

যাই। রাগও হয়, দুঃখও হয়। ছোটবউমা, বড়বউমা দিনে দুবার করে তাঁর গায়ে মহামাষতেল মালিশ করে দেয়। সে সময় দুটো কথাও তো বলতে পারে। কিন্তু বলবে কেন? আমি যে মরে গিয়েছি! ঘাটের-মড়ার সঙ্গে কেউ কথা বলে?

বড়খোকা এসে ঘরে ঢুকলেন। সৌম্য চেহারা। গোঁফদাড়ি সাদা।

'মা, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়েছিল?'

'ঘুম হলেই বা কি, না হলেই বা কি।'

'জপ সারা হয়েছে তো?'

'জপতপ সব চুলোর দুয়ারে গিয়াছে।'

'করলে মন ভাল থাকে।'

'সে কি আর আমি জানি না। ও-কথা তুই শেখাবি আমাকে? তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি? কাশীতে আসবার পর পঁচিশ বছর তো বেশ পুজোআর্চা নিয়ে কাটিয়েছিলাম। ভাগবত, কথকতা, যাগ-যজ্ঞ, গঙ্গার ঘাটের ভজন-কীর্তন, কোথায় না আমি যেতাম প্রত্যহ। এই প্রমীলাঠাকরুণ না থাকলে, এখানকার যে কোন ধর্মকর্মের আসর খালিখালি লাগত পাড়ার লোকের। কীর্তনীয়া আমার চোখে জল দেখলে, তবে তার গাওয়া সার্থক মনে করত। কাশীবাস করতে এসে নতুন লোকরা প্রথম এই প্রমীলাঠাকরুণের কাছেই সলাপরামর্শ নিতে আসত। কোন্ পাণ্ডা বদ, কোথাকার ঠাকুর ভাল, কোন্ মহিলার দলের সঙ্গে বদরিকাশ্রম যাওয়া নিরাপদ, কোন্ সত্রে কি খেতে দেয়, এসব খবর জানবার জন্য মেয়েরা চার বছর আগে পর্যন্ত আমার কাছেই ছুটে আসত। এখন আর কেউ এই ঘাটের-মড়ার ছায়াও মাড়ায় না! কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! বাবা বিশ্বনাথের কাছে আমি দিনরাত্রি বলি—আমার প্রাণটা তাড়াতাড়ি বার করে দাও ঠাকুর; আর কিছু চাই না তোমার কাছে! কিন্তু সে-কথা কি তাঁর কানে যাচ্ছে? কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখে এ শাস্তি দিচ্ছেন, তিনিই জানেন!'

'মা, মাথায় একটু মধ্যমনারায়ণ তেল দিয়ে দি?'

'দে। তোর মত করে দিতে কেউ পারে না। ছোটখোকাও না, বউমারাও না। তেল দিতে দিতে আরামে একেবারে চোখ বুঁজে আসে।'

বোঁজা চোখ খুলতে হল পায়ের শব্দ পেয়ে।

'কে বামুনঠাকরুণ?'

ধরা পড়ে গেল বামুনঠাকরুণ।

'হ্যাঁ।'

'চৌকাঠে রোদ এসে গেল ; এত বেলা হল স্নান করে ফিরতে? হাতে ও কী?'

'বাজার থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এলাম।'

'জিনিসটা কী—সেই কথাটাই তো জিজ্ঞাসা করছি।'

বড়খোকা পিছন থেকে ইশারা করছেন বামুনঠাকরুণকে চলে যেতে।

'একটু জর্দা আর পাথরের বাটি গোটাকয়েক!'

'ছোটবউমার বুঝি? পাথরের বাটি আবার কেন?'

বামুনঠাকরুণ কোন উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

'বামুনঠাকরুণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না পারত-পক্ষে। বেঁচে থাকতেই এই খোয়ার! মরলে পরে শ্মশানঘাটে না নিয়ে গিয়ে, পথের উপর টেনে ফেলে দেবে নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি নাই। মরবার পর যা ইচ্ছা হয়, তাই করো তোমরা; কিন্তু মরবার আগে যেন আমাকে ব্যাসকাশীতে নিয়ে গিয়ে ফেলো না! তা হলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়! শত্রু, শত্রু! দুধকলা দিয়ে যাদের পুষেছ, তারাই এখন উলটে ছোবল মারতে আসে! এ বাঁচা কি আর বাঁচা! কিন্তু এ বিড়ালের-প্রাণ যায় কই! বেঁচে, বেঁচে, একেবারে ঘেন্না ধরে গেল নিজের উপর। কাশীতে বাস করে চার বছরের মধ্যে একদিন গঙ্গাস্নান করি নি।'......

'মা, গঙ্গাস্নান করতে যাবে?'

'ছাখ্ বড়খোকা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে আর দিস না। ঠাট্টা করছিস আমার সঙ্গে?'

'ঠাট্টা কেন হতে যাবে। সত্যি বলছি।'

'আমি নড়ে এঘর থেকে ওঘরে যেতে পারি না, আমি যাব গঙ্গাস্নান করতে! সে যাব একেবারে তোদের কাঁধে চড়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে! কিন্তু সেদিন আসছে কোথায়। যমের দয়া হয়, তবে তো।'

'আমি নিয়ে যাব তোমাকে গঙ্গাস্নান করাতে।'

'কাঁধে করে?'

'সে যেমন করেই হোক না; তোমার তা দিয়ে কি দরকার, তোমার তো স্নান করা নিয়ে কথা। ছোটখোকা!'

'কি বলছ দাদা?'

'মাকে একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে হবে। রিকশায় সুবিধা হবে না, কি বলিস?'

'মা কি পারবে ? ডুলি, পালকি যে আজকাল উঠে গিয়েছে।'

বামুনঠাকরুণ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল যে ওই মন্দিরের সম্মুখে ডুলি, পালকি এখনও ভাড়া পাওয়া যায়।

সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। মা গঙ্গাস্নানে যাবেন ; যত বেশী লোক সঙ্গে থাকে ততই ভাল। বড়বউ, ছোটবউ সবাইকে যেতে হবে। গঙ্গাস্নানের নামে মা-ও বেশ উত্তেজিত হয়েছেন। অনর্গল অবান্তর কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন পালকি এসেছে শুনে।

তাঁর এই বাকসংযমে সকলে আশ্চর্য হল। চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছে, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায়। বোধহয় যেতে অনিচ্ছা, কিন্তু এ বোধটুকু এখনও আছে যে পুণ্যসঞ্চয় করতে রাজী না হওয়াটা দেখাবে অত্যন্ত খারাপ।

ছোটখোকা মা'র চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিজের কাছে রাখলেন। কোলপাঁজা করে তুলে তাঁকে পালকিতে শোয়ান হল। চোখ বুঁজে পড়ে থাকলেন তিনি।

'এই যে, নমস্কার !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। আমরা বড় ব্যস্ত এখন। দেখছেন তো মাকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

এমন সময়ে সব আসে ! সকলে বিরক্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

বাড়িওয়ালা বললেন, 'এঁদের নিয়ে এসেছিলাম ঘর দেখাবার জন্য।'

ছোটখোকা বললেন, 'আর সময় পেলেন না ?'

বড়খোকা ওষ্ঠের উপর তর্জনী রেখে সকলকে সঙ্কেত করলেন চুপ করবার জন্য।

বাড়িওয়ালা নাছোড়বান্দা। তিনি বড়খোকাকে গলির মধ্যে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকেই যাওয়া ঠিক তো ?'

যাতে ওঁদের কথাবার্তা মায়ের কানে না যায়, সেইজন্য ছোটখোকা পালকি-বেহারাদের সঙ্গে জোরে জোরে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছেন। দুই জায়েও নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন কোন্ ঘাটে স্নানের সুবিধা, সেই সম্বন্ধে।

বড়খোকা অনুচ্চ স্বরে বাড়িওয়ালাকে জানালেন যে আজই তাঁদের যাবার ইচ্ছা ; তবে এখনও সঠিক বলা যায় না। এই অনিশ্চয়তার জন্যই পুরোমাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হয়েছে।

ঘড়েল বাড়িওয়ালা অপ্রস্তুতের একশেষ হবার ভাব দেখালেন। 'না না, ভাববেন না যে আমার তর সইছে না। বাড়ি খালি করবার জন্য তাগিদ

দিতে আমি আসি নি। আমি এসেছিলাম প্রমীলাঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য। এতকালকার ভাড়াটে আমাদের।'

'না না, মার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওঁর শরীরের কথা জানেনই তো।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন বাড়িওয়ালা।

'কোন্ ঘাটে স্নান করবে মা?'

মা নীরব।

'অহল্যাবাঈ ঘাটে?'

বৃদ্ধা নিরুত্তর।

'তবে দশাশ্বমেধে যাই?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রয়েছেন তিনি। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সকলে এ ওর দিকে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন। মা কেন এমন ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে কাঠের তক্তার মত পড়ে রয়েছেন?

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর একেবারে জলের কাছে তাঁকে পালকি থেকে বার করা হল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন তখন তিনি। ছেলে আর পুত্রবধূরা মিলে তাঁকে ধরলেন জলে নামাবার জন্য।

এতক্ষণে বৃদ্ধা কথা বলেছেন।

'তোমরা সব সরে যাও! তোমাদের স্নান করিয়ে দেবার দরকার নাই। স্নান করিয়ে দেবে, যারা পালকি বয়ে এনেছে তারা।'

বিশ্বাস পাচ্ছেন না তিনি ছেলেদের।

ছেলে আর বউরা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্নানপর্ব কোন রকমে শেষ হল।

বাড়িতে ফিরে, বৃদ্ধাকে সবে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, অজয় এসে খবর দিল জ্যাঠামশাইকে দুজন ভদ্রলোক বাইরে ডাকছেন।

নাছোড়বান্দা বাড়িওয়ালা আবার এসেছেন একজন হবুভাড়াটেকে সঙ্গে করে।

'আবার কি?'

'এই ইনি……'

'একটু আস্তে কথা বলুন!'

'ইনি ছাড়লেন না কিছুতেই। আমি বলছি যে আপনারা এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছেন; আজ চলে যাবেন কিনা সেকথা জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনই অধিকার নেই। তবু উনি শুনবেন না কিছুতেই।

আচ্ছা, আজ যাওয়া কি সত্যিই অনিশ্চিত; না আমি এঁদের কথা দিতে পারি?'

'বিশ্বাস করুন আমাদের কথা; আমরা চাই যেতে; কিন্তু হবে কিনা বলতে পারি না। এই অনিশ্চয়তার উপর আমাদের কোন হাত নাই। এর কারণ আপনাকে বলবার মত নয়। বললেও সেকথা আপনার ওই হিসাবে-ভরা মাথায় প্রবেশ করবে না। সেইজন্য হাতজোড় করে বলছি যে আর জ্বালাতন করতে আসবেন না আমাদের!'

দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বড়খোকা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন।

'কে এসেছিল রে বড়খোকা?'

'ওরাই দুজন আবার এসেছিল।'

'কারা?'

আর মিথ্যা না বলে উপায় নাই।

'পালকি-বেয়ারারা।'

'কেন?'

'একটা আধুলি বদলে নিয়ে গেল। মা, এবার তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

'এখনই?'

'স্নানের পর তো তুমি না খেয়ে থাকতে পার না আজকাল।'

'কে বলল, পারি না? বউমারা লাগিয়েছে বুঝি?'

'না না, বউমারা কেন লাগবে।'

বৃদ্ধার খাওয়ার উপর লোভ ষোল আনা; কিন্তু খেতে ভয় পান। বিশ্বাস পান না বাড়ির লোকদের। ত্রিকূটের জিলিপি ভাজবার গন্ধ তাঁর নাকে আসছে। বুঝতে পারছেন তাঁরই জন্য ভাজা হচ্ছে। এইটাই তাঁর সব চেয়ে প্রিয় খাবার; কিন্তু আজকাল দাঁত না থাকায় চুষে চুষে খেতে হয়।

এখনও ঠাকুরকে উৎসর্গ না করে মা কিছু খান না। তাই সব জিনিস তাঁকে সাজিয়ে দিতে হয়; বারে বারে দেবার উপায় নাই।

মাকে খেতে দেওয়া হল।

এর পর কি ঘটবে সেকথা সকলের জানা।

আজকাল দুই-বেলা এই কাণ্ড খাওয়ার সময়।

বড়খোকা, ছোটখোকা, বড়বউ, ছোটবউ সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বড়খোকা, ছোটখোকা তোরা তো খেলি না?'

'তুমি খেয়ে নাও আগে; তোমার শরীর খারাপ।'

'তোদের না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি। অন্তত একটু একটু খা।'

এর ব্যথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবার নয়। বাতিক আর পাগলামি বলে মার এই আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু কথাটা বুকে বাজে ছেলেদের। সেই মা। এখনও সেইরকমই ভালবাসেন ছেলেদের। তবু নিজের খাবার থেকে ছেলেদের একটু একটু খাইয়ে, আগে পরীক্ষা করে নিতে চান, খাবারে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা। তিনি যে ওদের বোঝা!

এই ব্যথা ছেলেদের গা-সওয়া হয়ে এসেছে। মায়ের জন্য অনেক রুটিন-বাঁধা কাজ করতে হয় প্রত্যহ। তার মধ্যে এটাও একটা।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা আর একটু আলাদা। অষ্টপ্রহর যিনি যমের দুয়ারে মাথা কোটেন, খাবার সময় কেন তিনি মৃত্যুভয়ে পাগল, শাশুড়ীর আচরণের এই অসঙ্গতি নিত্য বউদের হাসির খোরাক জোটাত। আজ তারা গম্ভীর। সাহস নাই শাশুড়ীর ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে তাকাবার।

বড়খোকা, ছোটখোকা দুইজনেই চাকরি থেকে পেন্‌সন্ নিয়েছেন। ছেলেমেয়ে অনেক। কাশীতে একটা, আর বাড়িতে একটা, দু জায়গায় দুটো সংসার চালিয়ে যাবার মত আর্থিক সঙ্গতি আর তাঁদের এখন নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে কাশী থেকে নিয়ে যাবার মনস্থ করেছেন তাঁরা।

'বড়বউমা, পাথরের বাটি দুটো এনেছ? দাও। এদিকে নিয়ে এস। সব জিনিস একটু একটু করে দিই তোদের। বড়খোকা, ছোটখোকা তোরা খা!'

বড়খোকা, ছোটখোকা দুজনই তাকিয়ে মেঝের দিকে। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই বউ। চারজনের মুখচোখেই একটা সন্ত্রস্ত, উদ্বেগবিহ্বল ভাব।

অপরাধ-চেতনার ক্ষীণদীপিকায় একটা জিনিস অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁরা। যেটাকে নিছক পাগলামি বলে মনে হত, তার মধ্যে সত্যের এক কণা লুকানো ছিল। পাগলামি নয়, অলোকদৃষ্টি।

ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়া, মাকে কাশী থেকে সরানো সম্ভব নয়। আজকের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'খা! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি!'

চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এই স্বভেনির পুস্তিকা ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইল।

ইহাকে কেহ যেন ওই কোম্পানীর ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বলিয়া না ভাবেন। কারণ পুণ্যস্মৃতি স্থাপয়িতাদের স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে লিখিত বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। লোকের মুখে মুখেই আমাদের সংগ্রহের বিপত্তারিণী লেখনীগুলির অলৌকিক কীর্তিকাহিনী স্বতঃপ্রচারিত। যাঁহাদের দরকার, তাঁহারা ঠিক খোঁজ রাখেন। গত বৎসরের আই এ এস পরীক্ষার এক সফল পরীক্ষার্থী দ্বারা ব্যবহৃত যে কলমটি আমরা সম্প্রতি আমাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছি, ইহারই মধ্যে ছাত্রমহলে সেটির চাহিদার অন্ত নাই। এই সহযোগিতার জন্য জনসাধারণ আমাদের ধন্যবাদভাজন। তাঁহাদের আনুকূল্যে আমরা গর্বিত; কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, আমাদের সাহায্যপ্রার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখেন না। ত্রুটি অবশ্য আমাদেরই। এই রজতজয়ন্তী পুস্তিকা আমাদের সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস মাত্র।

কোম্পানীর আদি প্রতিষ্ঠাতা দুইজন আজ স্বর্গত। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধ বয়সে, অদম্য উৎসাহে নূতন ব্যবসায়ের বন্ধুর ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস তাঁহাদের ছিল। ব্যবসায় নির্বাচনের প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ। হাতে-কলমে তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে কারবারে পুঁজি কম লাগে, বিপন্নকে সেবার ভাব বজায় থাকে, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় না, সেইরূপ কারবারই মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে উপযোগী। পথিকৃৎ হিসাবে 'হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এবং 'কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়' এই দুই কর্মবীরের নাম বাঙালীর ব্যবসায়িক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

ওই দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ কি করিয়া একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল তাহা এক অতি বিচিত্র কাহিনী। জড়াইবার কথা নয়। দুইজনের নিবাস দুই জায়গায়। সরকারী চাকরি করিতেন বটে দুইজনই, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে। শুধু এক শুভক্ষণে চাকরিতে বদলির ফলে তাঁহারা

এই মহকুমা শহরে আসেন। এই সময়ই তাঁহাদের প্রথম পরিচয়। তাঁহাদের জীবন যে একই সূত্রে গাঁথা একথা তাঁহারা তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হারানচন্দ্র ছিলেন এক্‌সাইজ্‌-সাবইন্সপেক্টর, আর কৃষ্ণপদ ছিলেন ক্রিমিন্যাল কোর্টের নাজির। দুইজনেরই বয়স পঞ্চাশোর্ধে। চাকরিতে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ছাপোষা মানুষ। উপরি রোজগার ছিল বলিয়াই কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তখন অধিকাংশই ইংরাজ। এই মহকুমা শহরটির জল-হাওয়া ভাল। গ্রীষ্মকালে অন্য জায়গার তুলনায় গরম কম। নদীর ধারের ডাকবাংলাটিও সুন্দর। সেজন্য সাহেব অফিসাররা গরমের সময় সরকারী কাজের অজুহাতে যখন-তখন এখানে আসিতেন।

হারানবাবুর বড়সাহেব একসাইজ-কমিশনার একবার এখানে টুরে আসিয়াছিলেন। সেইদিনই ইন্সপেকশনের অছিলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এখানে আসিয়া হাজির। দুই সাহেব বিলাতে এক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। সেজন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। গরমের জন্য মেমসাহেবরা তখন শৈলনিবাসে। তাই দুই নামকরা তিরিক্ষি মেজাজের সাহেব আরও বদমেজাজী হইয়া উঠিয়াছেন। দেশীয় হাকিমরা পারতপক্ষে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে চাহেন না, নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেন অধস্তন কর্মচারীদের। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু করিতকর্মা, তাঁহারা আবার এই সুযোগে সাহেবকে নিজের নিজের কর্মপটুতা দেখাইতে সচেষ্ট।

হারানবাবুর উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরবাবু এই ধরনের অতিমাত্রায় কর্মতৎপর ব্যক্তি। একসাইজ-কমিশনার আসিবার দুইদিন আগে তিনি হঠাৎ স্থানীয় দিশী-মদের দোকান ইন্সপেকশনের ফলে আবিষ্কার করেন যে, সেখানে মদ ছাড়া, চোরাই গাঁজাও বিক্রয় করা হয়। সাংঘাতিক অপরাধ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপরে রিপোর্ট করেন যাহাতে ব্যাপারটা বড়সাহেবের নজরে পড়ে, ঠিক এখানে আসিবার সময়। শুনিয়া হারানবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; কারণ জবাবদিহি সম্পূর্ণ তাঁহার। সাবইন্সপেক্টরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁহার নাকের সম্মুখে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্য হইতে পারে না। কথা মিথ্যা নয়। এজন্য মদের দোকানদারের নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু বরাদ্দপ্রাপ্য ছিল। ইন্সপেক্টরবাবুও এই টাকার অংশীদার ছিলেন। সেই ইন্সপেক্টরবাবু যে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন তাহা হারানবাবু কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ডাকবাংলায় এক্সাইজ্-কমিশনার সাহেবের খানা-পিনার ব্যবস্থার ভার সাবইন্সপেক্টরবাবুর উপর। পয়সা অবশ্য খরচ করে মদের দোকানদার। কিন্তু দায়িত্ব সাবইন্সপেক্টরের। মাথার উপর বিপদ ; চাকরি লইয়া টানাটানি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এবারের ব্যবস্থা, অন্যবার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের ভার দেওয়া হইল কলিকাতার সাহেবী হোটেলের উপর। প্রচুর লটবহর লইয়া সেখান হইতে বাবুর্চি আসিল। মাননীয় অতিথি একে সাহেব ; তাহার উপর আবার আবগারী-বিভাগের মাথা। সুতরাং আহার্যের চেয়ে পানীয়ের ব্যবস্থা শতগুণ বেশী।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সাইজ-কমিশনার দুইজনের স্থান হইয়াছে ডাকবাংলার দুই পাশাপাশি ঘরে। সকাল হইতে বিয়ার পান চলিতেছে। মধ্যে একবার গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয় নাজিরের অফিস ইন্সপেকশন করিয়া আসিলেন। অফিসের কিছু খাতাপত্র আরদালী আনিয়া রাখিল তাঁহার ঘরের টেবিলের উপর ; রাত্রিতে কিংবা সকালে তিনি সময়মত এগুলিকে দেখিবেন। এখন এই নারকীয় গরমে বিয়ারই একমাত্র সান্ত্বনা।

ডাকবাংলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিলে তাঁহার দেখাশোনার ভার পড়ে স্থানীয় নাজিরবাবুর উপর। এই সূত্রেই ডাকবাংলা কম্পাউণ্ডে প্রাতঃকালে হারানবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাজিরবাবুর। সাহেবদের কখন কিসের দরকার পড়ে বলা যায় না ; সেজন্য উভয়েরই এইস্থান ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। ডাকবাংলার এক মোটর-গ্যারেজে উভয়ে আস্তানা লইয়াছেন। সেখান হইতে দেখা যায় না সাহেবরা ঘরের ভিতর কি করিতেছেন। সে খবর পাওয়া যাইতেছে বেয়ারাদের মারফত। অনবরত নূতন নূতন সমস্যা উঠিতেছে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধানের চেষ্টা করিতে হইতেছে। দশ মিনিট সুস্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। এক্সাইজ-কমিশনার সাহেবের খাস আরদালী পাঁচ টাকা লইবার পরও বড় জ্বালাতন করিতেছে। কখনও সে বলিতেছে ডিম তাজা নয়, কখনও বলিতেছে চায়ের দুধ গন্ধ। আরও দশটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দেওয়ার পর পচা ডিম তাজা হইয়া উঠিল, নষ্ট দুধ ভাল হইয়া গেল। একবার খবর আসিল সাহেবদের গরম লাগিতেছে। অমনি খসখসের পর্দায় অবিরাম জল ছিটাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হইল। দুইজন সাহেবের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বোধ হয় বেশী বদরাগী। কেননা, একবার দুঃসংবাদ পাওয়া গেল, পাংখা-পুলার ঢুলিবার অপরাধে তাঁহার নিকট প্রহার খাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নাজিরবাবু অফিসের দিকে ছুটিলেন,

পালা করিয়া পাখা টানিবার জন্য দুইজন অতিরিক্ত লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়া শুনিলেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাজিরের অফিস ইন্সপেকশন করিয়া গিয়াছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। লোহার সিন্দুকের স্টক খাতাপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং কিছু কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়াও গিয়াছেন। সকলের অনুমান, হয়ত তিনি পূর্বেই নাজিরবাবুর বিরুদ্ধে কোন বেনামী চিঠি পাইয়াছিলেন।

শুনিয়া নাজিরবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই আশঙ্কাই তিনি বহুদিন হইতে করিতেছিলেন। নাজারতের সিন্দুকে একটি সোনার গহনা বহুকাল হইতে পড়িয়াছিল। মোকদ্দমার সূত্রে হয়ত কোন সময় ইহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল। কোন দাবিদার না থাকিলে নাজিরের নিকট জমা করা বাজে জিনিসগুলি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা হয়। সোনার গহনা অবশ্য এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। কন্যার বিবাহের সময় অভাবগ্রস্ত নাজিরবাবু উপরোক্ত গহনার সোনাটুকু কাজে লাগাইয়াছিলেন। এই চুরি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

চিন্তান্বিত হইবারই কথা। ভারাক্রান্ত মনে নাজিরবাবু যখন ডাকবাংলার মোটর গ্যারেজে ফিরিলেন, তখন বেয়ারা সাব ইন্সপেক্টরবাবুকে সাহেবদের মানসিক আবহাওয়ার আধুনিকতম অবস্থার কথা জানাইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের ওষ্ঠের উপর একটি মাছি বসিয়াছিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইবার পর রাগে গরগর করিতেছেন তিনি। হঠাৎ হুঙ্কার শোনা গেল, 'সাবইন্সপেক্টর!' হারানবাবু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিলেন। এক্সাইজ-কমিশনার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ।

'মাছি মারবার ওষুধ একটু জোগাড় করতে পার?'

'ইয়েস সার।'

খট্ করিয়া জুতা ঠুকিয়া মিলিটারি কায়দায় হারানবাবু স্যালুট করিলেন। তাঁহার হাতে মশা-মাছির ওষুধ-ভরা পিচকারি।

ঘরে পিচকারি দিয়া ঔষধ দিবার সময় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু শুনিলেন, বারান্দায় সাহেব দুইজন বলাবলি করিতেছেন যে, অসৎ কর্মচারিগণ সাধারণত বেশ কর্মপটু হয়। বিশেষ উৎসাহিত হইবার মত প্রশংসা নয়। তবে এই খবর নাজিরবাবুকে দেওয়া মাত্র, তিনি যে কাঁদিয়া ফেলিবেন, একথা সাবইন্সপেক্টরবাবু আন্দাজ করিতে পারেন নাই। কান্না আর থামিতে চাহে না। কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি নিজের বিপদের কথা হারানবাবুকে জানাইলেন। তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে পথে

গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। নাজিরবাবুকে কী বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যায়, সাবইন্সপেক্টরবাবু তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

দুইজনে নীরবে মুখামুখি হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারা যায়। দুইজনই সমগোত্রের লোক। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। কথা বলিলে, তবু সেই সময়টুকুর জন্য বিপদের ভয়টা একটু চাপা থাকে। মনের বোঝা হালকা করিবার জন্য নিজের নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিতে হয়। দুইজনেরই আজ বাড়ী যাওয়া হয় নাই। বাড়ীর লোকরা কর্তাদের বিপদের কথা সম্ভবত জানেন না; তাঁহারা শুধু জানেন যে, বড়সাহেব আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ডাকবাংলা হইতে এক পা নড়িবার উপায় নাই। মুখে এই কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু উভয়ের মনে মনে ধারণা যে, এই বিষয় লইয়া এতক্ষণে পাড়ায় ঢিটিক্কার পড়িয়া গিয়াছে। হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীরা হয়ত এতক্ষণে সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিবেকবুদ্ধি যে ভদ্রলোকদের বেশী, তাঁহারা হয়ত উপদেশবাণী শুনাইবার জন্য ডাকবাংলায় আসিয়া হাজির হইবেন। আরও কত কথা। আসন্ন সঙ্কটের চাপে দুইটি মন খুব কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাবুর্চি একবার আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেল যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সাহেবরা ঠিক পথে চলিয়াছে। বহু সাহেব লইয়া সে প্রত্যহ ঘাঁটাঘাঁটি করে। নিজের অভিজ্ঞতায় সে বলিতে পারে যে, যে সকল সাহেব প্রাতঃকাল হইতে শরাব লইয়া বসে, তাহাদের খুশী করা খুব সহজ। সামলানো কঠিন, যাহারা দুই তিন পেগের অধিক পান করে না তাহাদের। এখানকার সাহেব দুইজন যে ভাবে মদ্য পান করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে, এত কষ্ট করিয়া রন্ধিত আহার্য দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত রহিয়া যাইবে।

এত আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও বাবুদের উদ্বেগের নিরসন হয় না। তাহাদের দুশ্চিন্তার কারণ যে আরও গভীরে, তাহা কলিকাতার বাবুর্চির জানা নাই।

তবে নাজিরবাবুর বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিবার পর হইতে, নিজের বিপদকে আর সে রকম বড় বলিয়া মনে হইতেছে না সাবইন্সপেক্টরবাবুর। নাজিরবাবুকে অবধারিত শ্রীঘর বাস করিতে হইবে। সে তুলনায় তাঁহার বিপদ আর কতটুকু।

বিকালের দিকে সম্মুখের মাঠে টেবিল-চেয়ার দিবার হুকুম হইল। এতক্ষণ চলিতেছিল মদ্যপানের ছেলেখেলা। এইবার আসল মদ খাওয়া আরম্ভ হইল। হাতপাখা দিয়া দুইজন লোক সাহেবদের পিছনে দাঁড়াইয়া অনবরত হাওয়া

করিতেছে। সাহেবরা কি যেন একটা মজার গল্প করিতেছেন। মোটর-গ্যারাজ হইতে দুই জোড়া চক্ষুর নিষ্পলক চাহনি সেইদিকে কেন্দ্রিত। সাহেবরা হাসিতেছেন; মেজাজ তাহা হইলে এখনও ভাল আছে। এইটুকু ভরসা।

কলিকাতার বাবুর্চির আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইল। সাহেবরা নৈশভোজন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ভাল জিনিসের কদর তাহারা বোঝেন।

একসাইজ্ কমিশনার হুঙ্কার ছাড়িলেন—'সাবইন্সপেক্টর!'

'ইয়েস সার।' ছুটিয়া গিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইয়াছেন হারানবাবু।

মুখে হাসি একসাইজ্ কমিশনার সাহেবের।

'এ সব ব্যবস্থা কে করেছে?'

'এই অধম সেবক, সার।'

'বেশ বেশ। উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।'

'আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু নাজিরবাবু।'

এতক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের টনক নড়িল। মুখের হাসি গিলিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার নাজির?'

'ইয়েস সার।'

'আপনার বন্ধু?'

'না সার, বন্ধু ঠিক নয়; তবে হ্যাঁ, বন্ধুও বলা চলে। ডাকব তাঁকে সার।'

না।'

হারানবাবু মোটরগ্যারেজে ফিরিয়া অপেক্ষমান নাজিরবাবুকে জানাইলেন যে, দুই সাহেবই খুব খুশী।

সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর মনের বল বাড়িয়েছে। মোটরগ্যারাজের বাহিরে চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিলেন। এতক্ষণ তাঁহার এ সাহস ছিল না। সেজন্য সরকারী ধড়াচূড়া পরিয়া ওই গরম ঘরের মধ্যে বসিয়া অনর্থক গলদঘর্ম হইতেছিলেন। নাজিরবাবু কিন্তু কিছুতেই বাহিরে আসিয়া বসিতে রাজী হইলেন না।

ডিনারের পরের পানীয়ের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। যে বেয়ারা মদ্য ঢালিয়া দিতেছে তাহার বিশ্রাম নাই। যে দুই ব্যক্তি হাতপাখা চালাইতেছে, তাহাদেরও না। সাহেবেরা শার্ট খুলিয়া শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বসিয়াছেন; তবু অসম্ভব গরম লাগিতেছে। কিন্তু মেজাজ ভাল আছে। হাসি গল্প

চলিতেছে। সম্ভবত রসের গল্প। অন্তত সরকারী কাজকর্মের যে নয়, এ কথা হাসির উচ্চরোল হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়!

এইবার সাহেবরা গেঞ্জি খুলিতেছেন। গ্লাসে গ্লাস ঠেকাইয়া আবার নূতন করিয়া আর এক দফা আরম্ভ হইল। গলার স্বর ক্রমে উচ্চ হইতেছে। দুইজনই হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার বাবুর্চি দুই প্লেট আহার্য ও একমুখ হাসি লইয়া মোটরগ্যারেজে উপস্থিত। সাহেবদের সে খুশী করিতে পারিয়াছে; এখন সে নিজের প্রশংসা বাবুদের নিকট হইতে শুনিতে চায়। সেই খবর দিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, খানা-পিনার জন্য নাজিরবাবু কত খরচ করিয়াছেন। সে বলিয়াছে একশ টাকা আর চারশ টাকা দিয়াছেন সাবইন্সপেক্টরবাবু। শতচেষ্টা করিয়াও সে নাজিরবাবুকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। হারানবাবুর দেখা গেল আহারে রুচি আছে; সামান্য পানীয়ের উপরও তিনি বীতস্পৃহ নহেন। যাইবার সময় বেয়ারা বলিয়া গেল যে, সাহেব দুইজনের ওতক্ষণে রঙ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

রঙ লাগুক আর নাই লাগুক গরম লাগিতেছিল ঠিকই। সাহেবেরা হাফপ্যাণ্ট খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আরদালী আসিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য নাজিরবাবু চোখ বুঁজিয়া ফেলিয়াছিলেন। চোখ খুলিলে দেখিলেন, আণ্ডার উইআর পরিহিত সাহেব দুইজন মাঠে পায়চারি করা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাহার পর ইংরাজী গানের এক কলি শুনিতে পাওয়া গেল। দুইজনে গলা মিলাইয়া গান গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজী কোন নৃত্যের ধরনে পদক্ষেপেরও চেষ্টা আছে। বাবুর্চি, আরদালী, বেয়ারা, পাংখাপুলার সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাছাকাছি রাস্তার কুকুরের দল পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করিল। ডাকবাংলার গেটের কাছে এত রাত্রিতেও জনকয়েক লোক জড়ো হইয়া গেল।

'সাবইন্সপেক্টর!'

আবার হুঙ্কার কেন? বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে হারানবাবুর।

'ইয়েস সার।'

'কুকুরদের এই উৎকট চীৎকার বন্ধ করতে পার না?'

'ইয়েস সার।'

ভাবিবার সময় নাই। কিছু বিহিত না করিতে পারিলে নিস্তার নাই। নাজিরবাবুকে পাঠান হইল থানায় একটা খবর দিতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের

নাম করিয়া বলিলে পাহারাওয়ালাদের যদি কুকুর তাড়াইবার হুকুম দেন দারোগাবাবু। থানার দারোগার এ লাইনে অভিজ্ঞতা অনেক কালের। তিনি বলিলেন, লাঠি হাতে পাহারাওয়ালাদের দেখিলে কুকুররা আরও বেশী করিয়া ডাকে।

'এখন উপায় ?'

ভগবানের নাম লওয়া ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা থানার দারোগার মনে পড়িল না।

সে রাত্রিতে ভগবানও বোধ হয় সজাগ ছিলেন। নাম স্মরণের ফল ফলিতে দেরী হইল না। খামখেয়ালী কুকুরগুলো যেমন হঠাৎ ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমন অকারণেই ডাক বন্ধ করিয়া দিল। ধড়ে প্রাণ আসিল।

'সাব-ইন্সপেক্টর!'

আবার কি হইল ? ধাবমান হারানবাবু নিজের হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন।

'উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার।'

'নো সার।'

'কী বললে তুমি ?'

'নো নো! ইয়েস সার।'

'উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার।'

'ইয়েস সার।'

'তবে কেন ইন্সপেক্টরটা তোমার দুর্নাম করবার চেষ্টা করে ?'

'জানি না সার।'

'জান না ? জানা উচিত। অবশ্য জানা উচিত।'

'ইয়েস সার।'

'আরদালী! টেবিলের উপর থেকে ফাইলটা নিয়ে এস।'

সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

'এই নাও। দেখ। পড়! জোরে জোরে পড়।'

হারানবাবু জোরে জোরে পড়িলেন ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট:

'পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।'

'ইন্সপেক্টর এখন কোথায় ?'

'এক্‌সাইজ্‌ ক্লাবে আছেন তিনি।'

'আমরা এখানে জেগে আছি, আর সে এক্সাইজ্ ক্লাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ? এখনই ডেকে আন তাকে !'

'ইয়েস সার।'

উর্দি পরিয়া, কাগজ-পত্র লইয়া ডাকবাংলায় আসিতে আসিতে, ইন্সপেক্টরের ঘণ্টাখানেক সময় লাগিয়া গেল। এ এক ঘণ্টা সাহেবেরা বৃথাই নষ্ট হইতে দেন নাই। তাঁহাদের নৃত্যের সুবিধার জন্য নাজিরবাবুকে ডাকবাংলার চাপরাসীর ভাঙ্গা গ্রামোফোনটি বাজাইতে হইয়াছে। প্রতি রেকর্ড শেষ হইবার পর, সাহেবরা একবার করিয়া তাঁহাদের পূর্ণ গ্লাস নিঃশেষ করিয়াছেন। কলিকাতার বাবুর্চি নাজিরবাবুর নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এরূপ একজোড়া কাবিল সাহেব দেখিবার সৌভাগ্য পূর্বে তাহার হয় নাই।

ইন্সপেক্টর যখন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন তখন সাহেবরা চেয়ারে উপবিষ্ট।

'তোমার মধুর-স্বপ্নে ব্যাঘাত করবার জন্য আমি দুঃখিত। এস এই নাও তোমার রিপোর্ট। পড় জোরে জোরে !'

'পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে ·...'

'কলম আছে তোমার কাছে ? নাই ?'

তাড়াতাড়িতে ইন্সপেক্টর কলম আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। হারানবাবু অতি কুণ্ঠার সহিত নিজের পকেট হইতে কলমটি বাহির করিয়া ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন।

এক্সাইজ-কমিশনার সাহেব তাড়া দিলেন ইন্সপেক্টরবাবুকে—'সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে না তুমি শহরের মদের দোকান দেখতে গিয়েছিলে ? অমন করে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন ? বুঝতে তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের এত দেরী হওয়া উচিত নয়। 'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া'—এই কথা কয়টি ঢুকিয়ে দাও, তোমার রিপোর্ট আরম্ভের জায়গাটায়। হ্যাঁ লেখ ! হল ! এবার পড় জোরে জোরে।'

ইন্সপেক্টর কম্পিত কণ্ঠে পড়িলেন—'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া, পনেরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।  '

'ঠিক আছে। ওতেই হবে। চোরাই গাঁজা বিক্রয়কারীকে ধরবার কৃতিত্ব তোমাদের দুইজনেরই সমান। ডিপার্টমেন্ট একথা মনে রাখবে। এখন তুমি যেতে পার।'

ইন্সপেক্টরকে নীরবে গেট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া হারানবাবু ফিরিতেছেন। হঠাৎ আবার হাঁক শোনা গেল—'সাব-ইন্সপেক্টর!'

'ইয়েস সার।'

'তোমার নাজিরকে ডাক।'

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবও চেয়ারে একটু যেন নড়িয়া বসিলেন।

'নাজির, এমন পরিপাটি ব্যবস্থার জন্য তোমাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানান উচিত।'

নাজিরবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

সাহেব তাড়া দিলেন।

'উঠে দাঁড়াও! আমার কথার সত্য জবাব দাও। সেই সোনার গহনাটা ফেরত দিতে পার?'

'সে টাকা আমি হুজুরের খানা-পিনায় খরচ করেছি আজ।'

'শুধু চোর নও; তুমি একটি মিথ্যাবাদীও!' আরদালীকে ডেকে সাহেব ঘরের টেবিলের উপর থেকে খাতাপত্রগুলো আনতে বললেন।

'নাজির বার কর সেই পাতাটা। পেয়েছ? পড় কি লেখা আছে।'

'Gold bangles—one pair'

'কলম আছে?'

হারানবাবু নিজের কলমটা এগিয়ে দিলেন নাজিরবাবুকে।

'গোল্ড-এর আগে রোল্ড কথাটা লিখে দেবে তুমি, বুঝেছ। রোল্ডগোল্ড জানতো? রোল্ড গোল্ড-এর জিনিস যদি তিন বছর নাজারতে পড়ে থাকে তাহলে সেটাকে নষ্ট করে দিলে কোন অপরাধ হয় না। রোল্ড কথাটার বানান জান? জান না? আর, ও, এল, এল, ই, ডি—রোল্ড। না না আমার চোখের সম্মুখে লিখতে হবে না। রেজিস্টারখানাকে তুমি ওই মোটর-গ্যারাজের মধ্যে নিয়ে যাও। রোল্ড গোল্ড কথাটা একখানা কাগজে আগে এক হাজারবার লিখবে ওই ঘরে বসে। এই হল তোমার শাস্তি। তারপর রেজিস্টারে লিখবে। তুমি একটি র‍্যাস্‌কাল! যাও! শীগগির যাও আমার সম্মুখ থেকে!'

হারানবাবু ও কৃষ্ণপদবাবু যে কলমটিকে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সময় ব্যবহার করেন, সেই কলমটিই চ্যাটার্জি এণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাথমিক পুঁজি।

উপরোক্ত ঘটনার পরই হারানবাবু স্বপ্নাদেশ পান, এই কলমটিকে

আর্তসেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য। তখন হইতে এই লেখনী বিপন্নের উদ্ধারকল্পে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

হারানচন্দ্র ও কৃষ্ণপদ উভয়েরই ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা উক্ত ধরনের সেবাকার্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাহার পরই আরম্ভ হয় পয়মন্ত লেখনী সংগ্রহের কাজ। এ কাজের ভার ছিল হারানচন্দ্রের উপর। কারণ এখান হইতে অন্যত্র বদলি হইবার হুকুম আসিবার পর, তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপদবাবু পেন্সন লইবার বয়স হওয়া পর্যন্ত চাকরি করিয়াছিলেন।

স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী অষ্টোত্তর শত সুলক্ষণা লেখনী সংগৃহীত হইবার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। ইহার পরের বিবরণ এই কোম্পানীর জয়-যাত্রার ইতিহাস। সে কাহিনী আপনাদের সকলের জানা।

## বয়োঃকনিষ্ঠ

অনেক দূর পর্যন্ত ভেবেচিন্তে আহ্লাদী কাজ করে। ছেলেকে জুতো পরে আসতে দেয় নি। সিধু এমনিতেই মায়ের খুব বাধ্য। তার উপর আবার কলকাতায় আসবার আগে মা সাবধান করে দিয়েছে যে মামাবাড়িতে থেকে এনজিনিয়ারিং পড়বার ইচ্ছা যদি থাকে, তবে যেন সে মামামাসীর সম্মুখে কোনরকম বেয়াড়াপনা না দেখায়। তাই বাড়ি থেকে খালি পায়ে বার হবার সময় সে কোন আপত্তি করে নি। এখন ফেরবার সময় পিচ্ গলানো-গরম রাস্তার উপর প্রথম প্রতিবাদ জানাল।

'রবারের স্যাণ্ডাল পায়ে থাকলে ঠাকুরের প্রসাদ কি করে যে অপবিত্র হ'ত বুঝি না।'

'যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন? পায়ের নীচে আমার ফোসকা পড়ছে না? রোদে গরমে আমার মত মোটা মানুষদের কষ্ট তোদের চেয়ে অনেক বেশী, বুঝলি?'

'আর মাথায় রোদ লাগছে কার বেশী?'

আহ্লাদী হাসল।

'আমিও একবার ছোটবেলায় মাথা নেড়া করেছিলুম।'

'কেন ?'

'উকুন হয়েছিল মাথায়।'

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা কিনা আজ, তাই এত যাত্রীদের ভিড়। অন্যদিন এলে এ ভিড় ঠেলতে হত না। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তির দিনই যে তার এখানে কাজ! কম ধকল যায়নি আজ আহ্লাদীর শরীরের উপর দিয়ে।

যাক, এতদিনে তবু কাজটা শেষ হল। ঠাকুরদেবতার কাছে কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারবার অশান্তি যে কী জিনিস, সে যার হয়েছে সেই জানে। কথাটা অষ্টপ্রহর মনের মধ্যে কিরকির করে বিঁধত এতদিন। আঠার বছর পরে মাথার উপর থেকে সে বোঝা নামল আজ। সিধুর জন্ম মাঘ মাসে; মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র—তিন মাস। সিধুর বয়স হল আঠার বছর তিন মাস। সে কি আজকের কথা! আহ্লাদীর ঠাকুমা তখন মৃত্যুশয্যায়।

তাড়াতাড়ি ন্যাতির মুখ দেখবার আশায় তিনি বাবা তারকনাথের কৃপাপ্রার্থিনী হয়েছিলেন। তিনিই নাতনীর কাছে মাদুলি পাঠিয়ে ছিলেন। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় সেই মাদুলি ধারণের সময়। প্রথম কিনা। এখন ভাবলেও হাসি আসে। সিধুর পর তার আরও সাতটি সন্তান হয়েছে।

'সিধু রুমালখান মাথায় বেঁধে নে না। দে প্রসাদের ঠোঙ্গাটা ততক্ষণ দে আমার হাতে।'

রুমাল বাঁধবার সময় আহ্লাদী বেশ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ছেলের মুখখান। যা বড় বড় দাড়ি গজিয়েছিল এই বয়সেই। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে এখন বেশ লাগছে দেখতে। সে-ই সিধুকে এতদিন দাড়ি গোঁফ ফেলতে দেয়নি। বাবা তারকনাথের কাছে ওর জট মানত ছিল। মাথার ছাঁটা চুল আঠার বছর থেকে এক থলের মধ্যে জমা করে রাখা হত। কিন্তু ছেলেমানুষের দাড়ি গোঁফের বেলা ও ব্যবস্থা, অচল। সিধুরই হয়েছিল মুশকিল। কতবার সে মাকে বলেছে একবার তারকেশ্বরে গিয়ে এ পর্ব শেষ করে দিতে; কিন্তু হয়ে ওঠেনি এতদিন। অভাবঅনটনের সংসার আহ্লাদীর। তার মত মানুষ কি ইচ্ছা হলেই সেই দূর দেশ থেকে তারকেশ্বরে আসতে পারে। তাছাড়া বাড়ির কর্তার এসব বিষয়ে চাড থাকে তবে তো। ছেলে-পিলের দায়িত্ব শুধু যেন একা মায়ের। এবার ছেলের 'হায়ার সেকেণ্ডারী' পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, আহ্লাদী সিধুকে সঙ্গে নিয়ে একরকম জোর করে চলে এসেছিল দমদমায় দাদার বাড়িতে। তারকেশ্বরের কাজটা ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। এই অন্য উদ্দেশ্যটাই আসল। সতর বছর পরে এসেছিল বাপের বাড়িতে, দ্বিধা সংকোচ দূরে ঠেলে। বাপের-বাড়ি মানে দাদার

বাড়ি। দাদা কখনও আসতে লেখেনি তাকে। দাদা বউদি চিঠি না লিখুক তাকে, সে কিন্তু কোন বছর বিজয়ার প্রণাম জানাতে ভোলেনি তাদের।

প্রসাদের ঠোঙাটা ছেলের হাতে আবার দিল আহ্লাদী।

'ঠোঙাটা বউদির হাতে দিবি কিন্তু নিধু। তারপর বউদিকে প্রণাম করতে ভুলিস না যেন।'

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছের গাছতলায় পৌঁছতে পেরে তারা বাঁচল। এখানেও বেশ লোকজনের ভিড়। বাড়ি ফেরবার আগে এই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির হাত থেকে নিস্তার নাই। তাদের লাইনের বাস পনর মিনিট পর পর ছাড়ে। আগেরখানায় জায়গা পায়নি তাই এর পরের বাসখানার জন্য অপেক্ষা করছে দুজনে আর অন্যমনস্কভাবে বিভিন্ন বাসের যাত্রীদের আনাগোনা দেখছে। হঠাৎ নজরে পড়ল। ও কে? ওই যে বাস থেকে নামছে। বৃদ্ধা বিধবাটির সঙ্গের বউটির মুখখানা যেন চেনাচেনা ঠেকছে। রোগা ক্ষয়াক্ষয়া চেহারা। অসীমার মত না?

বৃদ্ধার চোখমুখে বিরক্তির ভাব।

'আগে নামতে দিন আমাদের, তারপরে তো আপনারা গাড়িতে উঠবেন!'

বৃদ্ধাটি বেশ কড়া টাইপের।

অসীমার মতনই তো লাগছে।—'অসীমা না?'

'কে?'

দুইজনের বিস্ময়েভরা দৃষ্টি কেন্দ্রিত হল কথাটা যে বলেছে তার মুখের দিকে।

'কেগো তুমি বাছা'—এই কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধা সামলে নিলেন নিজেকে। এমন গিন্নিবান্নী গোছের মহিলার সঙ্গে একটু সমীহ করে কথা বলতে হয়।

'আমার বউমাকে চেনেন নাকি আপনি?'

আহ্লাদী হাসল।

'বাগবাজারে পাশাপাশি বাড়িতে আমরা যে কতকাল কাটিয়েছি এক সঙ্গে।'

'অনেকদিন পর দেখছেন বুঝি?'

অসীমা বলল—'তা অনেকদিন হ'ল বই কি।'

আহ্লাদী তাকিয়ে অসীমার মুখের দিকে। এ কি? অসীমার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? মাথার কাপড় টেনে দেবার কথাই বা তাকে দেখবামাত্র তার মনে পড়ল কেন? আহ্লাদীর দিক থেকে অমন সলজ্জভাবে

মাটির দিকে চোখই বা নামিয়ে নিল কেন ? একটু কেমন কেমন যেন লাগল আহ্লাদীর।

'চল বউমা। পৌঁছতে পৌঁছতেই তো বেলা উতরে গেল।'

'তা এত দেরী করে এলেন কেন আপনারা ?'

'দেরী করলুম কি আর ইচ্ছা করে। কথা ছিল, ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। হঠাৎ সকালে ফোন করে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপাল সাহেব। কি যেন কাজ পড়েছে। ছেলে এনজিনিয়ারিং কলেজে কাজ করে কিনা। এই আসছে এই আসছে করে তার জন্য বসে বসে, শেষকালে দেরী দেখে নিজেরাই বেরিয়ে পড়লুম। এখন তো আর সময় নেই। একদিন বরঞ্চ আমাদের বাসায় আসুন ; দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসে গল্প করে যাবেন। আচ্ছা চলি। আপনিও আসবেন।'

শেষের কথাটা বলা সিধুকে।

তাঁরা এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে গেলেন—'সাত নম্বর নগেন বারুইয়ের গলি, বনহুগলী।'

বাস-এ বসে আহ্লাদী বলে—'কে যাচ্ছে! হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, মিটে গেল।'

তার উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছে বাল্য-বন্ধুর হাবভাব দেখে। আঠার বছর পর দেখা। কোথায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে তা নয়, একেবারে লজ্জায় জড়সড় শাশুড়ীর সম্মুখে। যেন কনে বউটি! আধিক্যেতা না ? পঁয়ত্রিশ বছরের বুড়ী মাগী! হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই। তার চেয়েও পাঁচ মাসের বড়, একথা ছোটবেলায় চিরকাল শুনে এসেছে। দেখতে ওকে চিরদিনই অনেক ছোট লাগে বয়সের চেয়ে। বেঁটে আর ক্ষয়াক্ষয়া গোছের যাদের চেহারা তাদের বয়স বোঝা যায় না। কিন্তু তাই বলে বয়স তো বসে থাকবে না!

মায়ের ফেলে-আসা স্বর্গরাজ্য বাগবাজারের গলির কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে সিধুদের মুখস্থ। সেখানকার স্বাদ, গন্ধ, বাতাস, লোকজনের কথাবার্তা, বন্ধুবান্ধবের ব্যবহার, ফেরিওয়ালার হাঁক, কলতলার ঝগড়া, গোলাপী-ঝির চীৎকার, সব মনে হত অন্য এক জগতের জিনিস সিধুদের কাছে। তাদের চেনা জগতের সঙ্গে একটুও মেলে না। জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরা সেই কল্পরাজ্যের মধ্যমণি ছিলেন অমীমামাসী। কত গল্প আছে অমীমামাসীকে নিয়ে। একবার ট্যাপারি গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে মরবার যোগাড়! একসঙ্গে দুটো ট্যাপারি গিলে ফেলবার ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে হয়েছিল

এই কাণ্ড। তারপর থেকে মামারা ট্যাঁপারি বলে ডাকতেন অসীমামাসীকে।
সেই মানুষের সঙ্গে আজ চাক্ষুষ দেখা। কিন্তু ঠিক যেন ভাবী জিনিসটার সঙ্গে মিলল না। ওই পুচকে ঘোমটাটানা বউটাকে মায়ের সেই ছেলেবেলার বন্ধু বলে ভাবতে বাধে। মুখখানি কিন্তু বেশ কচি ঢলঢলে গোছের।

'আচ্ছা মা, ট্যাঁপারিমাসী তো তোমার সঙ্গে কথা বললেন না?'

'শাশুড়ী সঙ্গে ছিলেন কিনা।'

আহ্লাদী ভেবেছিল অসীমার ঔদাসীন্য বোধহয় ছেলের নজরে পড়েনি। ওই থাকে চুপ করে, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বোঝে সব।

'শাশুড়ী সঙ্গে থাকলে কি বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলতে নেই?'

'কে জানে! শাশুড়ী নিয়ে ঘরও করিনি কোনদিন; ওসব কথা জানিও না।

'বৃদ্ধার কথাবার্তা তো খারাপ না।'

'কেন, তোকে আপনি বলেছেন বলে?'

'ধুৎ!'

শেষ পর্যন্ত আহ্লাদীকে স্বীকার করতেই হ'ল।

'তুই ধরেছিস ঠিকই। চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ। আচ্ছা, যেতে দে এসব কথা। তুই কিন্তু নিয়ম করে দাদার ছেলেটাকে নিয়ে পড়াতে বসবি সন্ধ্যা বেলা আজ থেকে।'

ও আর বুঝিয়ে বলতে হবে না সিধুকে।

পরের দিন রবিবার। দাদার ছুটি। আহ্লাদী প্রথম দিন দাদার বাড়িতে ঢুকেই ছড়া কেটেছিল—'বাপ রাজা তো রাজার ঝি; ভাই রাজা তো বোনের কি?' তখনই কথাটা না বললে পারত আহ্লাদী। শুনে দাদা একটু দুঃখিত হয়েছিলেন। নিজের কর্তব্যচ্যুতি সম্বন্ধে একটু সজাগও হয়েছিলেন। তাই রবিবারের দিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাদের সেই বাগবাজারের পুরনো পাড়া দেখতে যাবি নাকি রে আহ্লাদী?'

নেচে ওঠে আহ্লাদী। তুমিও চল না কেন বউদি। এক ঘণ্টার তো ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা রইল তো কি হল। সিধু ওদের সামলাতে পারবে। তোমার তো মোটে তিনটি। আমি সেখানে আমার অতগুলো কাচ্চাবাচ্চাকে সিধুর উপর ফেলে দিয়ে কত সময় পাড়া বেড়াতে যাই। কত সময় ও আমার রান্না পর্যন্ত করে দেয়। গরীবের বাড়ির ছেলের সবরকমের কাজ নিজে হাতে না করতে শিখলে কি চলে।

তাদের পুরনো পাড়ায় গিয়ে আহ্লাদী চিনতেও পারে না কোথায়

তাদের বাড়িটা ছিল। সেখান দিয়ে এখন প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। ওই রাস্তাটা তয়ের হবার সময়ই ওদের এপাড়া ছেড়ে যেতে হয়। দাদা দেখিয়ে না দিলে সে ধরতেও পারত না তাদের বাড়িটা কোন জায়গায় ছিল। সে গলির চিহ্নমাত্র নাই।

'আর এইখানটাতে ছিল তোর সেই টঁ্যাপারিদের বাড়ি।'

'টঁ্যাপারি নামটা তোমার এখনও দেখছি মনে আছে দাদা। কাল যে ওর সঙ্গে দেখা হল তারকেশ্বরে। সঙ্গে ওর শাশুড়ীও ছিলেন।'

'মনে থাকবে না! এই তো তিন-চার বছর আগে ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম। কী মুসকিলেই পড়েছিলেন ওর মা মেয়ের বিয়ে নিয়ে। বিয়ে হয়ই না, হয়ই না। যাক তবু ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ট্যাপারির ছোটভাই ফটিকের কথা মনে আছে না?'

'মনে আবার থাকবে না কেন। অষ্টপ্রহর অসীমার কোলেকাঁখে থাকত ফটকেটা।'

'ফটিক বম্বেতে একটা চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। খোঁজখবর বোধহয় বিশেষ নিত না। কেন না অসীমার বিয়ের সময়ও তাকে দেখলুম না। শুনলুম ছুটি পায়নি।'

'ছেলেপিলে মানুষ হয়েই বা কি, তবু মা-বাপে চায় তাদের ছেলেটা মানুষ হোক। বিশেষ করে বড় ছেলে। বড় ছেলেটা কোনরকমে তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে উঠলে বুকের বল বাড়ে মায়ের।'

'দেখা হলে অসীমা তোকে কি বলল, সে কথা তো তুই বললি না ঠাকুরঝি।'

'ছাই! শাশুড়ীর সম্মুখে একেবারে ভয়ে জুজু। ছেলেবেলার বন্ধুর দিকেও চোখ মেলে তাকাতে লজ্জায় মরে যায়। মাথার কাপড় টেনে দেবার সে কী ঘটা! কথা বলবে কী; যেন আপদ বিদায় হলেই বাঁচে!'

'ঠাকুরঝি, জগতের ধারাই ওই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই তাই। এ তো পাতানো সম্পর্ক; রক্তের সম্বন্ধ যেখানে সেখানেও জগতের ধারা এই!' খোঁচাটা যথাস্থানে লেগেছে। কেন না বউদি দাদা দুজনই চুপ করে গেলেন এর পর।

মঙ্গলবারের দিন সময় বুঝে আহ্লাদী আসল কাজের কথাটা পাড়ল বউদির কাছে।

সিধুর বাবার ইচ্ছা ওকে এবার চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার। সিধুর ইচ্ছা এনজিনিয়ারিং পড়বার। আজকালকার সব ছেলেই চায় এনজিনিয়র হতে।

ওর অঙ্কে মাথা দেখে হেডমাষ্টারমশাইও ওকে এনজিনিয়ারিং পড়তে বলেছেন। বললেই তো হল না; তার জন্ম রেস্তর দরকার। আর এদিকে সংসারের অবস্থা তো জানই বউদি। নুন আনতে পান্তা ফুরয়। আর, তোমার সংসারের পাত কুড়িয়ে খেয়েও সিধুর মত দশটা ছেলে মানুষ হয়ে যেতে পারে। বউদি, তুমিও ছেলের মা। মায়ের দুঃখ-দরদ বোঝ। আপনজন বলতে তো এক তোমারই।...

'সে কথা তো ঠিকই ঠাকুরঝি।'

বউদি লোক ভাল।

এর পর জিজ্ঞাসা করতে হয় স্বয়ং দাদাকে। বউদির আপত্তি নেই; কাজেই দাদা রাজী।

ওই দূর থেকে মনে হয় ভাই পর করে দিয়েছে বোনকে। কিন্তু তা'ও কি সম্ভব। রক্তের সম্পর্ক যে। চিঠি না দিলে কি হয়; দাদা চিরকাল দাদাই থাকে।

মামা ভাগ্নেকে ডেকে বললেন—'স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে এনজিনিয়র হতে হলে। কাল থেকে সকালে ছাতে উঠে ডন-বৈঠক করবি বুঝলি? আর গুড়-ছোলাভিজে খাবি।'

চড়চড়ে রোদ জোছনার মত স্নিগ্ধ লাগল আহ্লাদীর। দমদমার হাওয়া বাতাসেও সেকালকার বাগবাজারের স্বর্গের স্বাদ গন্ধ।

খট্‌কা লাগল কলেজে ভরতি হবার কাগজপত্র আনবার পর। নিয়মাবলীর মধ্যে লেখা আছে যে, আবেদনকারীর নিম্নতম বয়স হওয়া উচিত সতর বছর। যার বয়স ষোল বছর এগার মাস উনত্রিশ দিন সেও দরখাস্ত দিতে পারবে না।

বাবা তারকনাথ সাক্ষী, সিধুর বয়স আঠার বছর তিন মাস। কিন্তু...

এই কিন্তু নিয়েই হয়েছে মুশকিল। সিধু বলছে যে, বাবা তারকনাথের সাক্ষ্য এনজিনিয়ারিং কলেজের কর্তারা মানেন না। তাঁরা দেখেন শুধু স্কুলে যে বয়সটা লেখান হয়েছে সেইটা। সেটা এখন মাত্র ষোল বছর।

স্কুলে ভরতি হবার সময় আর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তাব সময়, বয়স কমানোটাই নিয়ম। এরই জন্য ছেলেটা এনজিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হতে পারবে না? বয়স কমিয়ে লেখানর মধ্যে যে এমন মারাত্মক ব্যাপার থাকতে পারে একথা আহ্লাদী কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এখন উপায়? এত গুছিয়ে এনে শেষ মুহূর্তে এমনভাবে সব ভেস্তে গেল! তার সব রাগ গিয়ে পড়ে সিধুর বাবার উপর। মানুষটাই ওইরকম। কাজ করতে না

পারি, অকাজ করতে তো পারি—এ হয়েছে তাই! তখনই আহ্লাদীর মনে হয়েছিল, বাবা তারকনাথের দপ্তরে যে ছেলের বয়সের হিসাব লেখা-জোখা, তার বয়স কি কখনো কমাতে বাড়াতে আছে! কিন্তু সিধুর বাবার ভয়ে তখন সে কিছু বলেনি। এখন হল তো! তোমার আর কী হ'ল; যা কিছু হ'ল, ওই ছেলেটার! বাপ হয়েছ বলে কি এমনভাবে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার তোমার আছে?

আচ্ছা যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভুল শোধরাবার উপায়ও নিশ্চয়ই কিছু আছে।

'দাদা, তোমাদের তো অনেক কিছু জানাশোনা আছে। বলো এখন কি করা উচিত?'

দাদা হেসে আকুল।

'এতকাল সবাই চাইত বয়স কমাতে। এনজিনিয়ারিং কলেজগুলো দেখছি লোকের স্বভাব পালটে দেবে।'

আহ্লাদীর জীবন-মরণের প্রশ্ন আর দাদা হাসছে।

'না দাদা, তুমি অমনভাবে হেসে উড়িয়ে দিও না কথাটাকে।'

'হাসলুম আবার কোথায়। বয়স বাড়াবার উপায় থাকবে না কেন; হাজার গণ্ডা আছে। ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিয়ে অ্যাফিডেভিট করতে হবে যে আগে ভুল করে কম বয়স লেখানো হয়ে গিয়েছিল; এখন সঠিক বয়সটা জানতে পারায় বয়স এক বছর বাড়াবার দরকার পড়েছে। এই গেল নম্বর এক। দুই নম্বরের রাস্তা হচ্ছে, উপরে ধরাধরি করা। খুঁটির জোর থাকলে কোন কিছুতেই আটকায় না আজকালকার দিনে। কিন্তু সে খুঁটির জোর আমাদের নাই। তিন নম্বরের উপায় হচ্ছে, একখান নতুন ঠিকুজি তয়ের করিয়ে নেওয়া। বলিস তো আমি ওই মোড়ের জ্যোতিষীকে বলে দিতে পারি। এত সস্তায় মিথ্যা ঠিকুজি তয়ের করে দেবার লোক এ তল্লাটে আর একটিও পাবি না।'

'কোন বিপদ-আপদ নাই তো এতে?'

'না না, সে-সব কিছু ভয় নেই। মামলা-মোকদ্দমার জন্য দরকার পড়লে লোকে হরদম এই করে বয়স বাড়ায়-কমায়। তবে…'

'হ্যাঁ সেই তবেটাই ভাল করে বলো দেখি শুনি।'

'এখন কথা হচ্ছে যে কোর্টে যে জিনিস চলে, এনজিনিয়ারিং কলেজেও সে জিনিস চলে কি না। কলেজের সঙ্গে তো কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই ও সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলতে পারছি না।'

'তবে ?'

এই সংকটের সময় আহ্লাদীর মনে পড়ল অসীমার বরের কথা। সে তো এনজিনিয়ারিং কলেজে কাজ করে। ঠিকই তো। দাদারও মনে পড়ল অসীমার বিয়ে হয়েছিল এনজিনিয়ারিং কলেজের প্রোফেসারের সঙ্গে। তার সঙ্গে দেখা করলে সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে। সে কোন রাস্তা নিশ্চয় বাতলে দেবে। আপনার লোক বলে একটু সুপারিশও করে দিতে পারে প্রিন্সিপালের কাছে।

সহজ বড় ব্যাপারই। মনে পড়ে গেল যে সেদিন তারকেশ্বরে অসীমার শাশুড়ী তাঁদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন তাকে। তাঁর গলার স্বরে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। নেহাত শিষ্টাচার হলে, বাড়ির ঠিকানাটা দূর থেকে চেঁচিয়ে ডেকে অমনভাবে জানিয়ে যেতেন না। মানুষটি নিশ্চয়ই ভাল। কি যেন বলেছিল ঠিকানাটা। সিধু তোর মনে আছে নাকিরে ?

'সাত নম্বর নগেন বারুইএর গলি, বনহুগলী।' সিধুর মনে থাকবে না ? একবার যে বই পড়ে সে বই ওর মুখস্থ হয়ে যায়। এত মাথা ছেলেটার। কোন জিনিস থেকে যে কী হয় মানুষের, কেউ বলতে পারে না। এখন তার সংসারের ভবিষ্যৎ, তার ছেলের ভবিষ্যৎ, সব নির্ভর করছে অসীমার স্বামীর উপর। জয় বাবা তারকনাথ !

'বুঝলিরে সিধু, আমার আর অসীমার দু'জনেরই একই সময় মাথায় উকুন হয়েছিল। তাই দুই জনই এক সঙ্গে মাথা নেড়া করিয়েছিলাম। আমাদের সব কিছু ছিল এক সঙ্গে।'

'আগুপাছু শুধু বিয়ের বেলায়।' কথাটা বেসুরো লাগায় আহ্লাদী একবার আড়চোখে দেখে নিল ছেলের মুখখানা। বিরক্ত হচ্ছে সিধু। যার জন্য করি চুরি সে-ই বলে চোর! সিধুকে নিয়ে সেই সন্ধ্যায় আহ্লাদী গিয়ে হাজির অসীমার বাড়িতে।

দরজার পাশেই বসবার ঘর। অসীমার শাশুড়ী সিধুকে সেখানে বসিয়ে বললেন—'আমার ছেলে এখনই ফিরবে।'

অর্থাৎ সিধুকে একা একা বসে থাকতে হবে না বেশীক্ষণ।

তারপর আহ্লাদীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

'বউমা! দেখ কে এসেছেন। কত সৌভাগ্য আমার, যে তোমার আহ্লাদীদিদির পায়ের ধুলো পড়েছে এ বাড়িতে।'

দিদি! আহ্লাদী একবার ভাবল বলে—দিদি আবার হলুম কবে থেকে।

কিন্তু সে এসেছে নিজের গরজে। এখন বুড়ো মানুষের সামান্য একটা কথার প্রতিবাদ করে লাভ নাই।

'কী মা?'

অসীমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর এক পা দু'পা করে আড়ষ্টভাবে এগিয়ে এল আহ্লাদীর দিকে।

আহ্লাদী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল যে অসীমা তার আসায় খুশী হয় নি। তারকেশ্বরে প্রথম দেখা হবার সময় বন্ধুর মনের ভাব সম্বন্ধে একটু খটকা লেগেছিল। আর সংশয়ের অবকাশ নাই।

'বউমা তোমার আহ্লাদীদিদিকে সঙ্গে করে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি আসছি একটু পরে।'

অর্থাৎ তিনি একটু জলখাবারের যোগাড় করবেন ততক্ষণ।

'বাপরে বাপ! মা বাবা শাশুড়ী তোর অসীমা! নে, এইবার মাথার কাপড় ফেল। দেখি ভাল করে কেমন চেহারা হয়েছে তোর। বর গেছে কোথায়? তোর বর দেখতেই তো এলুম।'

পাথর গলল বুঝি এতক্ষণে।

'শোন আহ্লাদী, তোমাকে একা খুঁজছিলুম। এখনই শাশুড়ী এসে পড়বেন। একটু সাবধান করে দিই। এঁদের কাছে বল না যেন তুমি আমার সমবয়সী। এঁরা জানেন যে আমার বয়স এখন তেইশ চলছে। আমার স্বামীর বয়স এখন তেত্রিশ। আমি দু'বছরের বড় তাঁর চেয়ে।' ত্রস্ত চোখের চাউনিতে কাতর মিনতি।

ফিস ফিস করে বলা কথাগুলো। এর মধ্যেও আহ্লাদী লক্ষ্য করেছে যে, অসীমা তাকে তুই না বলে তুমি বলেছে, বর কথাটা ব্যবহার না করে স্বামী কথাটা ব্যবহার করছে। ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চায় তাকে অসীমা।

'এঁরা সকলে জানেন ফটিক আমার দাদা। বিলাতে আমি ওকে চিঠি লিখি না, পাছে আবার চিঠিপত্র থেকে জানাজানি হয়ে যায়, ও আমার ছোট। সব সময় সশঙ্ক থাকি পাছে আমার আসল বয়স ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে। এ হয়েছে আমার এক শাস্তি।'

চাপা ভাঙা ভাঙা গলায় বলা কথাগুলো আহ্লাদীর কানে আসছে। সে তাকিয়ে অন্য দিকে।

'দিদির বিয়ের সম্বন্ধ করতে ছোটভাই যাবে, এই সঙ্কোচে ফটিক কোনদিন আমার বিয়ের খোঁজখবরে যায়নি কোথাও। বলত লজ্জা করে। আমার

বিয়ের সময় বম্বের এক কোম্পানীতে কাজ করত। সেই কোম্পানীই ওকে বিলেত পাঠিয়েছে। মারা যাবার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মায়ের মুখে কেবল ওই ফটিকের কথা।'······

গলা ভিজে এসেছে। আড়ষ্টতা একটু একটু করে কাটছে।

···'সঙ্গে ওটি তোর ছেলে? আমারও তাই মনে হয়েছিল। শাশুড়ী ভেবেছেন দেওর। তোর ছেলেপিলে ক'টি? চারটি ছেলে চারটি মেয়ে? পারিস তো একথা চেপে যাস আমার বরের কাছে আর শাশুড়ীর কাছে! একটু সাবধান থাকাই ভাল।'···

'বউমা!'

মাথার কাপড় টেনে দিল অসীমা। সাড়া দিতে দিতে শাশুড়ী উঠে আসছেন উপরে।

শেষ অনুরোধ এল চোখের ভাষায়।

সেই ভাষাতেই আশ্বাস জানাল আহ্লাদী।

কী ভাবিস তুই আমাকে অসীমা!

তবু কি সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে।

'দিদির সঙ্গে কী সব প্রাণের গল্প হচ্ছে—বউমা!'

'বলছে শাশুড়ী খেতে দেন না।'

হাসছেন বৃদ্ধা।

'তেমন বউ আমি আনিনি। নিজে দেখে শুনে যাচাই করে বউ এনেছি ঘরে।'

শাশুড়ী বউকে কি যেন ইশারা করায় অসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত চায়ের জল চড়াতে। ঘরের বাইরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছে সে। চোখোচোখি হল বন্ধুর সঙ্গে।

অসীমা ভয় পাচ্ছিস কেন! সে বুদ্ধিটুকু আমার আছে বুঝলি?

শাশুড়ী আরম্ভ করলেন তাঁর দুঃখের কথা। এ-সব কথা বউমার সম্মুখে বলা যায় না! তাঁর দশটি পাঁচটি নয় ওই একটি মাত্র ছেলে। চার বছর বিয়ে হয়েছে আজও বউমার সন্তান হ'ল না। এরই জন্য তিনি বউমাকে নিয়ে তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন। সবই তাঁর হাতে।

আহ্লাদী সায় দিল—'হবে, হবে। বাবা তারকনাথের কৃপা নিশ্চয়ই হবে।'

বৃদ্ধার হঠাৎ খেয়াল হল যে তিনি এতক্ষণ নিজের কথাই বলছেন।

'আপনার থাকা হয় কোথায়?'

'থাকি বিদেশে। বাঃ, আপনাদের বাড়িখানি ভারি সুন্দর। আর কি ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছেন। ফুলের টব দেখছি জানালার উপর। ছেলের খুব ফুলের শখ বুঝি? তা তো হবেই। ঠাকুর-ঘর নেই? তেতলায়? চলুন দেখি আপনার ঠাকুর-ঘর। বাঃ কী সুন্দর করে সাজিয়েছেন ঠাকুর ঘর।'

'থাকা হয় বিদেশে কোথায়?'

'অজ পাড়াগাঁ। সেখানে থাকতে থাকতে আমরাও পাড়াগেঁয়ে হয়ে গেছি একেবারে। শিয়ালের ডাক না শুনলে রাতে ঘুম হয় না। কাঁকড়া, গলদাচিংড়ি কিছুই পাওয়া যায় না সে দেশে। থাকার মধ্যে আছে শুধু এক ষষ্ঠীতলা। সেখানকার ষষ্ঠী-ঠাকরুণ কিন্তু খুব জাগ্রত।'

'আপনার ছেলেপিলে ক'টি?'

'টিয়াপাখীও আছে দেখছি আপনার বাড়িতে। কোন কিছুর ত্রুটি নেই। ও টিয়াপাখী কি অসীমার? আমাদের ওখানকার ষষ্ঠীতলায় আমি অসীমার নামে একখানা ইট বাঁধবো। সেখানে ইট বাঁধা নিষ্ফলা যেতে আমি আজও দেখিনি। আচ্ছা এবার আমরা চলি; আমাদের বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে।'

'সে কী কথা!'

'না না, চা জলখাবার না হয় আর একদিন এসে খেয়ে যাব। যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে। পথে মনে হ'ল আপনি সেদিন আসতে বলেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কাজ সেরে আবার আমাদের সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। না না, আর এক মিনিটও দাঁড়াবার সময় নেই। আমার চেয়ে তাড়া, যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার। ওর আবার রাত্রিতে আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। না না খাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড় কথা হ'ল? দেখাশোনা হল, সুখ-দুঃখের কথা হল এগুলো কি কিছু না? অসীমা! বেরিয়ে আয় রান্নাঘর থেকে। দেখলি তো আহ্লাদীদিদি তোর কথা ভোলে নি। না না চা করতে হবে না। সময় নেই। সেই এতটুকুনি দেখেছি তোকে; তোর সঙ্গে কি আমার শিষ্টাচারের সম্বন্ধ। বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকলে কি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাই। তোর শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলিস, আহ্লাদীদি চিরকাল কি রকম তড়বড়ে মানুষ।'

খিল খিল করে হাসতে হাসতে সে বৃদ্ধাকে প্রণাম করে।

দ্বিধা কাটিয়ে অসীমাও এসে টিপ করে একটা প্রণাম করল আহ্লাদীকে।

'হয়েছে হয়েছে, থাক থাক! সুখে স্বামীর ঘর করো।'

পায়ের উপর অসীমার আঙুলের চাপটা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী জোরে মনে হয় আহ্লাদীর। তার অভিনয়ের মজুরি বোধহয়।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে শাশুড়ী বললেন—'ধন্যি মেয়ে বাবা !'

অসীমা চায়ের কেটলিটা নামিয়ে রেখে উনুনের দিকে মুখ করে বসল।

আর পথে, ছেলের কাছে এমন মজার গল্পটা করতে গিয়ে হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল আহ্লাদীর।

## জামাইবাবু

১

মেজদির বিয়ে। বেশ মনে আছে ; দিব্যি নাদুসনুদুস বর। মণিদি বলল, 'বাব্‌বা ! কী মোটা !' ছোট পিসিমা মেয়ের দোষ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'জমিদার মানুষ, ক্ষীর দুধ খেয়ে মানুষ· '

ভেঁপো বলে পাড়ায় একটা অখ্যাতি ছিল। তাই জন্যেই বোধ হয় ঐ অল্পবয়সেও বুঝতে পেরেছিলাম যে জামাইবাবুর রুচি আর কথাবার্তা বেশ মার্জিত নয়। বড়দির সঙ্গে গল্প করছিলেন, 'ব্রহ্মচারী থাকব বলেই ঠিক করেছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি করতে পারত তা হলে তো কথাই ছিল না··।'

২

মেজদিকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হল না। মা চব্বিশ ঘণ্টাই মেজদির উপর চটে আছেন। লজ্জায় তাঁর নাকি আর দশজনের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। মেজদিরও আবার রাগলে জ্ঞান থাকে না, বলেন, 'আমি তো আর স্বয়ংবরা হতে যাইনি।'

ওবাড়ির জ্যাঠাইমা ঠেস্ দিয়ে বলেন, 'আসছে পুজোয় বোধ হয় নিয়ে যাবে !'

মেজদি আমাদের কাছে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করেন—বিয়ের কনে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ি ছিলেন কিনা। বাবা খোঁজ করে জানলেন জামাইয়ের জমিদারীর আয় বছরে চুরাশি টাকা ; আর সম্পত্তির মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ বাড়ির দুখানি ঘর।

৩

জামাইবাবু আমাদের বাড়িতেই চলে এলেন—শ্বশুরমশায়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা-টেষ্টা করেন···

চাকরিও হল।

কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন, 'আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোট খালি ঘরটায় করে দিস্। আর দেখিস মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিস্।' বড়দির কাছে বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম বিয়ে করা ইচ্ছে ছিল না।' পাড়ার বন্ধু নিলয়বাবুর কাছে বলেন, 'বৌটা কি ছিঁচকাঁদুনে, দাদা।' তবু পর পর তিনটি মেয়ে হয়।

মেজদার কাছে অযাচিত কৈফিয়ত দেন—'আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটু শিক্ষাদীক্ষার দরকার; নইলে পুরুষ মানুষ নিজের যা ইচ্ছে তা করতে পারে না।'

৪

গত কয় বছরের নিয়মমতো এবারেও মেজদির সময় এল। লেডী ডাক্তার বললেন, 'weak constitution, কী হয় বলা যায় না।'

হলও তাই।

ও বাড়ির জ্যাঠাইমা বললেন, 'বেশ গিয়েছে; নোয়া সিঁদুর নিয়ে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে। এই দেখো না।'

বলে লম্বা নামের ফর্দ আওড়িয়ে গেলেন। মা মেয়ে তিনটিকে দেখিয়ে বলেন, 'মরেও শান্তি দিল না—হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে রেখে গ্যাল!' জামাইবাবু মেয়েদের বাঁশি কিনে দিলেন।

৫

আমার ছোট বোন টুলু ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছে আর মাকে কী সব যেন বলছে।

যেতেই মা বলেন, 'তোরা যা না; তোরা এখানে কী কচ্ছিস?' পরে শুনলাম টুলু বুড়ীকে কোলে করে যখন কোণের ঘরে বসে আচার খাচ্ছিল, তখন জামাইবাবু সেখানে গিয়ে কী সব 'ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু' বলেছেন। ও তাই ছুটে ভাঁড়ার ঘরে পালিয়ে এসেছে!

মা বলেন, 'কাউকে যেন বলিস না। তোদের আবার যা সব মুখ আলগা —কী ঘেন্না…'

৬

শুনলাম জামাইবাবু রেলে বড় চাকরি পেয়েছেন। পান চিবুতে চিবুতে রামকেষ্ট ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করেন। তারপর মা আর বাবার পায়ের ধুলো জিবে ঠেকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসেন। বুড়ী, আর নেড়ী, বায়না ধরে বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়বে। বুলু বলে, 'বাবা আমার জন্যে একটা এততো বড় পুতুল এনো।' মা তাড়া দেন এখন পেছু ডাকিস না।

৭

কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে। আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

নিলয়বাবু বলেন, 'বেশ দিয়েছে থুয়েছে—চুয়োডাঙায় বিয়ে করে এল কিনা। মেসে এসে উঠেছে।' রেলের চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করতে আর সাহসে কুলোয় না।

মাকে এসে বলি।

মা বুড়ীকে বুকে চেপে ধরেন। নেড়ী বলে, 'বুলু বড় দুষ্টু ; না দিদিমা ? বাবা পুতুল আন্‌লে আর কাউকে দেব না—খালি খালি আমি-ই আর তুমি-ই, —না দিদিমা ?' মায়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আর মা ওদের উপর রাগ করেন না।

## ভদ্রার কোয়ালিটি

১৯৪৯ সালের মহেঞ্জদারো ইয়ারবুকের পাতা উলটাইতেছিলাম। 'হু ইজ হু' পরিচ্ছেদে একটি পাতায় হঠাৎ নজর পড়িল :

ডক্টর নরেশ ভদ্র। জন্ম ১৯০৫ সেপ্টেম্বর ; কুড়ুলহাটী, জেলা বর্ধমান, বাংলা। শিক্ষা—কুড়ুলহাটী হাই ইংলিশ স্কুল ; বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ; ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয়, উইসকন্‌সিন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডিগ্রী লইবার পর নানাপ্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ব্যবসায়িক কাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও অসীম কর্মপ্রেরণা তাঁহাকে গভীর অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি হইতে বিরত থাকিতে দেয় নাই। ইহার ফল তাঁহার ডক্টরেট ডিগ্রী। যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে জর্নালিজম ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কল সম্বন্ধে যে জাতীয় গবেষণাগার খোলা হইয়াছে, তিনি তাহার অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।'

আমাদের সেই নরেশ ভদ্র। আজকালকার দুনিয়ার কিছুই খবর রাখি না। তিন বৎসর হইতে অজ পাড়াগাঁয়ে আছি। তবুও ইয়াকুব দেখিয়া আপ-টু-ডেট থাকিবার চেষ্টা করি। সেই মেসের রুমমেট নরেশ ভদ্র। ভাগ্যিস সে ভদ্র, তাই তো মনে পড়িল। একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া দেখিয়াছিলাম আমার ধোপদুরস্ত বিছানার চাদরের কোণ দিয়া ডিজ লণ্ঠনের চিমনী মুছিতেছে। ভদ্র না হইলে কি আর কেহ অপরের অসাক্ষাতে, তাহার

চাদরের নিচের দিক দিয়া লণ্ঠনের কাচ মোছে ; চাদরের উপরের পিঠ দিয়া মোছা যে যায় না, তাহা তো নয়।

সেই নরেশ। বড়ই সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছে ইয়ারবুকে। আরও বড় করিয়া লেখা উচিত ছিল। অতবড় একজন মনস্বী লোকের জীবনী ; এই দুই কথায় সারিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধের সময় না হয় কাগজের অভাব ছিল, এখন তো আর তা নয়।

সারাদিন পান আর গুণ্ডি চিবাইত। প্রায় টেব্‌ল টেনিসের ব্যাটের মতন চওড়া চিবুকটিতে দু'কষ বহিয়া পানের রস গড়াইয়া পড়িত। আমরা তাহাকে বলিতাম অভদ্র।

ব্যবসায়ে ঝোঁক তাহার ছোটবেলা হইতেই। বহুদিন আগের কথা পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা হইতে দুই পয়সা হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছে। নরেশ তাহার পূজার পার্বণীর সঞ্চয় সাড়ে চার আনা দিয়া পোস্টকার্ড কিনিয়া রাখিয়াছিল—পরে দাম বাড়িলে বেশি দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া।

বার কয়েক বি. এস-সি ফেল করিবার পর সে পড়া ছাড়িয়া দেয়। কোন বিষয়ে পাস করিত জানি না ; কিন্তু প্রতিবার পরীক্ষার পর বলিত 'প্র্যাকটিকাল' খারাপ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় পাস করিতে পারিব না।

মেসে আমার ঘরে থাকিয়াই সে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে। বলিয়াছিল সায়েন্সের স্টুডেন্ট, সায়েন্সের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন ব্যবসা করা আমার দ্বারা পোষাইবে না।

কত রকমের ব্যবসা তাহাকে করিতে দেখিলাম। ধোপার কালি, স্নো, ক্রীম, জুতোর কালি, গন্ধ তেল, আরও কত কী মনে পড়িতেছে না। কোনোটাই পোষাইল না। কিছুদিন ধরিয়া এক একটি জিনিসের ব্যবসা চলে। তাহার পর দেখি নরেশ দুই দিন বিছানায় পড়িয়া থাকে। খায়ও না দায়ও না। কাহারও সহিত কথাও বলে না। তাহার পর হয়তো শুনি ধোপার কালিটি চলিতেছে না। তিন টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে। ধোপা এবং লণ্ড্রিগুলি নাকি বড় বড় মাড়োয়ারীদের কাছে বাঁধা ;—না হইলে কি বলিলেই হইল যে, তাহার ধোপার কালি দিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। বের করুক না দেখি এরকম ভায়লেট রং। গরিব লোকের ব্যবসা করিবার দিন আর নাই ! বাড়িতে আছে তো সবাই। কিন্তু বাবা ব্যবসা করিবার টাকা দিতে চান না।···আরো কত কী কথা সে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর বিরূপ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিত। বুঝিতাম সে এইবার টাকা চাহিবে। বলিবে পৃথিবীতে যদি লোক থাকে, বন্ধু থাকে, তাহা হইলে সে আমি।

বেশি কথা বাড়াইতে না দিয়া, নিজের চা জলখাবার বন্ধ করিয়া ভদ্রককে কিছু দিই। সে তাহাতেই খুশি। আবার কিছুকাল চলে অন্য জিনিসের ব্যবসা।

কাগজপত্র, গঁদের শিশি, বুরেট, কাঁচি, ওষুধের বোতল, লিটমাস্ পেপার, স্টোভ আর মেজার গ্লাসে ঘর ভরিয়া উঠে। স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে বসিয়া সে দিনরাত পানের পিচ ফেলে, আর একখানি মোটা নীল মলাটের ইংরাজি বই হইতে ফর্মুলা দেখিয়া নূতন উদ্যমে নূতন জিনিস তৈরী করিতে বসে। বিজ্ঞানের কিছু বুঝিতাম না। ভাবিতাম হয়তো বা এডিসন কি কুরীর মতো একটা কিছু করিয়াও ফেলিতে পারে। তখন হয়তো ভদ্রক আমারই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারিব। কতবার আমার এই বাসনা সফল হইতে একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

'মনকুসুম' সুগন্ধী তেলটি বাজারে বাহির করিবার পর তাহার কী আনন্দ, কী উৎসাহ। বিস্রস্তকেশা সুন্দরীর ছবি সমন্বিত শিশিটি হইতে সবুজ চটচটে তেল, স্নানের আগে আমার হাতে কোঁটা কোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিল। বলিল, এতেই হবে। এ তেল বেশির দরকার হয় না। ফাইন গন্ধটা! না?

বলিলাম, হাঁ। আর দিস না। বালিসের ওয়ারে সবুজ রং হয়ে যাবে।

সে দেখি দুঃখিত হইল।

বলিল, কখনই না। কে বললে, পাকা রং!

ছুটির দিন খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়াইব মনে করিলাম। নোংরা ঘরে ময়দার লেইএর বাটিতে দিনরাত মাছি ভনভন করিত। মাছির ভয়ে মশারিটি ফেলিয়া শুইব মনে করিতেছি। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ঘরে একটিও মাছি নাই। লেই-এর বাটির পাশেই বিরাট কাঁচের বোতলটিতে, ফিলটার কাগজযুক্ত কাঁচের ফানেল হইতে, টপ্ টপ্ করিয়া সবুজ তেল পড়িতেছে।

সেদিন শুইবার পর মুখে একটিও মাছি বসে নাই। রাতে ঘরে একটিও মশা ছিল না।

'মনকুসুম' তেল সুকেশা রমণীদের মনঃপূত হয় নাই। নিশ্চয়ই—কেন না তাহা বাজারে চলিল না।

কিছুদিন পরে ভয়ে ভয়ে, নেহাত সংকোচের সহিত ভদ্রককে 'মনকুসুমে'র মশামাছি বিতাড়নী ক্ষমতার কথা বলিয়াছিলাম। নোবেল হঠাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এবার হয়তো ভদ্রকের কপাল খুলিল।

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ বোতলেই নূতন লেবেল আঁটিয়াছিল।

কিন্তু প্রতিবার যেরূপ হইয়া আসিতেছিল, এবারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। বাজার জিনিস না লইলে বৈজ্ঞানিক কি করিতে পারে?

এইরূপই চলিয়া আসিতেছিল।

যুদ্ধ লাগিবার বছর তিনেক পরের কথা। সকলেই রাতারাতি বড়লোক হইয়া যাইতেছে। 'ভদ্রক-স্নো' মাখিবার পর মুখে এক পোঁচ ময়দা গোলা লাগিয়া থাকিলেও তাহা বাজারে পড়িয়া থাকিতে পায় নাই। ভদ্রক ইহা হইতেই কিছু টাকা পাইয়াছিল। বেশি আর কী! তবে তাহার পুঁজির অনুপাতে মন্দ রোজগার সে করে নাই।

আমি তাহাকে বিজ্ঞানের পথের রোজগার ছাড়িয়া অন্যরূপ ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জনের কথা বলি। মাড়োয়ারীদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, বুঝাইয়া শুনাইয়া, বকিয়া ঝকিয়া, তাহাকে অন্য ব্যবসা করিতে সম্মত করাই। তাহাকে দেখাইয়া দিই যে, সে সময় জিনিসের দাম বাড়িতেছে। চড়তি দাম—যাহা কেবল ফুলিয়া ফলিয়া উঠিবে। সে একদিন দেখি একগাড়ি কাগজ ব্ল্যাক মার্কেটে কিনিয়া আনিয়াছে। আমারই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ঘরে শুইবার স্থানের সংকুলান কঠিন হইয়া উঠে। ভদ্রক বলে যে চিঠির প্যাড তৈয়ারি করিবে। তাহাতে নাকি অনেক লাভ।

তাহার কথা ভাবিয়া নিজের অসুবিধার কথা ভুলি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দেখি যে তাহার বৈজ্ঞানিক মন প্যাড তৈয়ারির মতো মাড়োয়ারী ব্যবসার উপর বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। বুঝাইতে গেলে জবাব দেয়, সায়েন্স শিখেছিলাম কিসের জন্য?

হঠাৎ দেখিলাম কয়েক পিপা কডলিভার তেল কিনিয়া আনিয়াছে। বলিল, খুব সস্তা পেলাম।

বলিলাম, কিছুদিন চেপে রেখে, তারপর ঝেড়ে দে।

সে হাসিতে লাগিল। ভাবিলাম তাহারও ঐ মত। কিছুদিন পরে দেখি, সে আবার অসময়ে শুইয়া পড়িয়াছে। একদিন খাইল না, কাহারও সহিত কথাও বলিল না।

দুই দিন পরে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, বড্ড ঠকে গিয়েছি। শালা আমেরিকানরা জোচ্চর।

পরে সব শুনিলাম। আমেরিকান গ্যালন নাকি ব্রিটিশ গ্যালন অপেক্ষা পরিমাণে কম। সে গ্যালনের দাম শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে, দাঁওয়ে কডলিভার তেল পাইয়াছে। বিক্রয়ের সময় দেখে যে খরিদ্দাররা ব্রিটিশ

গ্যালনের হিসাব না হইলে কেনে না। বাজার দর বলিতে ব্রিটিশ গ্যালনের দরই বুঝায়। বেচারী প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়িয়াছে।

আবার এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাহার মাথায় খেলে। আমিই আবার কিছু টাকা দিই। কডলিভার তেলের সহিত চন্দনের তেল মিশাইয়া, সে একটি তেল বাজারে বাহির করিবে। নাম হইবে 'আল্ট্রা ভায়লেট অয়েল'। ছেলে বুড়ো সকলকে মাখিয়া এক ঘণ্টা রৌদ্রে বসিতে হইবে মাত্র। তাহার পরই নূতন ভারতের নূতন মানব জয়যাত্রার পথে দৌড়াইবে। কেহই আর তাহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। বৃদ্ধ লুপ্ত-যৌবন ফিরিয়া পাইবে। রিকেটি শিশু দাদামশায়ের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিবে,—গ্যাক্সোবালক তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পালাইবে। হ্যাণ্ডবিল, বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, চিঠিতে দেশ ছাইয়া যাইবে।

আল্ট্রা ভায়লেট তেল বাহির হইল। অর্থের অভাব, বিজ্ঞাপন কি করিয়া দেওয়া যাইবে। দৈনিক কাগজগুলিও আবার যুদ্ধের বাজারে বিজ্ঞাপনের দর লইয়া এমন নীচতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাদের নিকট যাওয়া শক্ত। সম্বলের মধ্যে প্যাড তৈয়ারি করিবার কাগজগুলি; তাহা বিক্রয় করিয়া বিজ্ঞাপনের খরচ চলিতে পারে।

আমিই তাহা করিতে বারণ করি। টাকা ধার করিয়া তাহাকে দিই—ঐ কাগজগুলিতে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইতে।

তাহার পর কিছুদিন চলে হ্যাণ্ডবিল ছাপানো ও ডাকে সারা ভারতের নানা স্থানে পাঠানোর কাজ। দিন নাই, রাত নাই, কেবল পার্সেল, প্যাকেট, ডাকটিকিট, আর গঁদের আঠার সমারোহ।

ফলাফলের জন্য মাস দুয়েক অপেক্ষা করি। সুপ্ত ভারতের কোনো স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। হইল কী? একশো হ্যাণ্ডবিলের মধ্যে একটিও যদি লোকে পড়িত, তাহা হইলে চিঠির বোঝায় আমার ঘর ভরিয়া ওঠা উচিত ছিল। না কিনুক, কিন্তু ওষুধের অভাবের বাজারে, লোকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যও তো চিঠি লিখিত। খোঁজ লইবার জন্যও তো লোক আসিত। আমার মধ্যে তো এক লোক, প্রেসের আরদালী আসে বাকি পয়সার তাগাদা করিতে, আর মেসের লেখী আসে অনুযোগ করিতে।

ভদ্রকের সন্ধানী মন হতাশা অপেক্ষা, কৌতূহলেই বেশি ভরিয়া উঠে।

হঠাৎ একদিন দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এতদিনে বুঝলাম। লোকাল ট্রেনে দুটো ছেলে গাড়িতে উঠতে পারছিল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। উঠতে আর পারে না। দৌড়ে হাতল ধরল। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে

পড়ে-টড়ে না যায়, এই ভেবে তাদের হাত থেকে খাতা বইগুলো জানলা দিয়ে নিলাম। হাতে নিয়ে দেখি দুজনেরই রাফ খাতা আমার হ্যাণ্ডবিলগুলো দিয়ে তৈরি। হ্যাণ্ডবিলের একপিঠ সাদা ছিল। যুদ্ধের বাজারে এক পিঠ সাদা হ্যাণ্ডবিল কি আর লোকে বিলোয়। সকলে বাড়ির ছেলেদের খাতা তোয়ের করে দিয়েছে।…তুই পড়েছিলি হ্যাণ্ডবিলটা? অপ্রস্তুত হইয়া জবাব দিই, না ঠিক পড়িনি। তবে তুই তো অনেকদিন পড়ে শুনিয়েছিস।

যাক, তাহলে ও হ্যাণ্ডবিল আমি ছাড়া আর কেউই পড়েনি—প্রেসে কম্পোজিটারটাও বোধ হয় না।

তাহার পর ভদ্রক ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

বছর দুয়েক পর দেখা। বলিল, ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি—সায়েন্স-টায়েন্স সব।

কী করছিস এখন?

জবাব দিল, ডক্টর ভদ্র, ডক্টর ভদ্র হে এখন আমি। সুটপরা দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই। যুদ্ধের সময়ে খাঁকীর সুট তো সকলেই পরিতে শিখিয়াছে। এখন বুঝিলাম যে সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হইয়াছে।—বোধ হয় নিজের গ্রামে প্র্যাক্টিস করিতেছে।

সে নিজেই ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া দিল—থিসিস দিয়ে ডক্টরেট—আমেরিকায়।

অনেক গল্প-সল্প হইল। কথায় কথায় জানিলাম তাহার থিসিসের বিষয় 'যুদ্ধকালীন একপিঠে লেখা ইস্তেহার'। আরও শুনিলাম, ম্যাকগেভিন বিশ্ববিদ্যালয় নাকি পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের স্নাতকোত্তর গবেষণার একমাত্র স্থান। নিজের অজ্ঞতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। পৃথিবীর একমাত্র ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে আমার সম্মুখে পাইয়া, ঐ বিদ্যাপীঠের উপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিল।…

ইয়ারবুকে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিবার বিরুদ্ধে একটি বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিব মনে করিতেছি।

## দিগ্‌ভ্রান্ত

রাখাল তরফদারের সেই গাছটাকে কাটা হচ্ছে। তাঁর গর্ব ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, সেই বিখ্যাত আমগাছটা। কাটছে মহেশপুর শ্মশানঘাটের কালু সর্দার আর তার ছেলে, বিনা পয়সায় গাছটা পেয়েছে বলে। এখানকার কেউ রাজী হয়নি। পাড়ার সকলে গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে। নির্বাক, বিষণ্ণ।

এই কি ছকুদা চেয়েছিল? এইজন্যই কি ছকুদা এই গাছটাকে বেছেছিল? এ ছাড়াও কত কী হতে পারে। হতাশা? অনুশোচনা? কে জানে কী।

কিসের থেকে যে কী হয়, কে বলতে পারে। ছকুদার শত্রু ছিল না; বৃদ্ধ রাখাল তরফদারও সৎ, পরোপকারী ব্যক্তি। স্বার্থের সংঘাত নাই; বয়সের ব্যবধান অন্তত পঞ্চাশ বছরের; মন-কষাকষি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু একটা ভুল বোঝাবুঝির পালা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। দুইজনের স্বভাবের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল ছিল বেশি। ছকুদা কথা কম বলত, আর একলা থাকতে ভালবাসত, বৃদ্ধ অনর্গল কথা বলে যেতেন যাকে সম্মুখে পেতেন তার সঙ্গে। কিন্তু দুই-জনেরই মন ছিল অনুসন্ধানী। অন্য দেশ হলে হয়তো দুইজনই বড় বৈজ্ঞানিক হতেন। ছকুদার ঝোঁক ছিল পশুপাখির দিকে; আর বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন গাছপালা, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে।

এই বয়সেও বৃদ্ধের স্বাস্থ্য ছিল অটুট। ভোরবেলাতে কি শীত কি গ্রীষ্ম ছাতা মাথায় দিয়ে যেতেন শেঠদের বাড়িতে। তারপর সারাদিন তাদের কাজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। কারও সঙ্গে দেখা হলে তার আর রক্ষা নাই; আরম্ভ হয়ে যেত গল্প; এই গল্পের ভয়েই সকলে তাঁকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত।

এ-হেন ব্যক্তিকে নিয়ে ছেলেছোকরারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। হেন রোগ নাই, যার অব্যর্থ মহৌষধ তরফদার মশায়ের জানা ছিল না। সদ্যোমৃত শিয়ালের পেট চিরে তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারলে নাকি গোদ সারে। এইরকম সব বিদঘুটে ওষুধ দিয়ে রোগ সারাবার গল্প, তাঁর মুখে শুনে ছেলেরা হেসে গড়িয়ে পড়ত। চন্দ্রগ্রহণের সময় ডালিমগাছের পরগাছা কেটে, তার ডাল কোমরে ধারণ করলে অর্শরোগ

সারে। একবার পরগাছা কাটতে গিয়ে তাঁর পায়ে ডালিমের কাঁটা ফোটে। পরে সেটা বিষিয়ে ওঠায় বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকতে হয় তাঁকে। লজেন্স দেবার লোভ দেখিয়ে আমরা একটি ছোট ছেলেকে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছিলাম যে, তিনি ডালিমের কাঁটা ফোটার ওষুধ জানেন কি না। ছকুদা সে সময় আমাদের দলের মধ্যে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তার অভ্যাসমতো একটাও কথা বলেনি। ছেলেটিকে আমরা শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে, যদি বৃদ্ধ জানতে চান কে তাকে পাঠিয়েছে, তাহলে সে যেন ছকুদার নাম করে। ছকুদা সম্মতিও দেয়নি, আপত্তিও করেনি; এর আগেও মুচকে হাসছিল, এর পরেও মুচকে হেসেছিল। রাখাল তরফদার ছেলেটির কান ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তাকে পাঠিয়েছে। এই থেকেই আরম্ভ।

বৃদ্ধের খুব বাগানের শখ ছিল। তাঁর বাগানে একটা আমগাছ ছিল, যেটা তিনি বোম্বাই আর ল্যাংড়া মিলিয়ে কলম তয়ের করেছেন বলে দাবি করতেন। পাড়ার লোকে ঠাট্টা করে এটাকে বলত ল্যাং-বোম আমের গাছ। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা সকলেই কতকটা এই কারণেই তরফদার মশাইকে গাছপালা ফলমূল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মনে করতেন।

একদিন গাছে চড়ে পেয়ারা খাওয়ার সময় ছকুদা বলল, 'দেখেছিস পেয়ারা বোঁটার দিক থেকে পাকতে আরম্ভ করে না, অথচ আম পাকতে আরম্ভ করে বোঁটার দিক থেকে।'

ফল পাকবার প্রক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তখন আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের দলের পাঁচুর কি জানি কেন মনে হল যে, বিজ্ঞানের এ একটা মৌলিক সমস্যা। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল, ফল দুটো পাকবার পদ্ধতিতে বিভিন্নতা দেখে। আমরা উস্কানি দিলাম যে, সত্যিই এর কারণটা জানা দরকার। ল্যাং-বোমের স্রষ্টিকর্তা ছাড়া আম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর কারই বা আছে এখানে? জ্ঞানী ব্যক্তির কাছেই জ্ঞান আহরণ করতে যেতে হয়। এখনই চল। ছকুদা কিছুতেই গেল না আমাদের সঙ্গে।

তরফদারমশাই বাগানেই ছিলেন।

'কী মনে করে?'

'আম সম্বন্ধে আপনার মতো তো কেউ জানে না এখানে। তাই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলল ছকুদা একটা কথা—'

'কে? ছকু? ছকু পাঠিয়েছে? বেরো! ফাজলামি করবার আর জায়গা পাওনি! ঠেঙিয়ে তোদের আমি—'

আর আমরা এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করিনি সেখানে। নিজেদের মধ্যে

বলাবলি করলাম, ছকুদার ডিপার্টমেন্ট হল জন্তু-জানোয়ার আর বুদ্ধের ডিপার্টমেন্ট হল গাছপালা। ছকুদা ওঁর ডিপার্টমেণ্টে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে উনি এত চটে উঠলেন। আর উনি নিজে কী করেন। ছকুদার ডিপার্টমেন্ট থেকে শিয়াল নিয়ে টানাটানি করেন কেন নিজের রুগীর চিকিৎসার সময়? অতি হিংসুটে আর বদ বুড়োটা! পশুপাখি পোকামাকড় সত্যিই ছকুদা ভালবাসত! সে বেজি কাঁধে বসিয়ে এক এক সময় বেড়াতে বার হত। ঘরের মটকায় যে শালিখপাখিটা বাসা বাঁধে সেটাও ওর পোষ মেনে গিয়েছিল; মধ্যে মধ্যে এসে বসতে পর্যন্ত দেখেছি ওর মাথার উপর! একবার একটা কাঠবেরালি পুষেছিল; সেটাকে গরম কোটের পকেটে ভরে নিয়ে একদিন স্কুলে এসেছিল। সেদিন হেডমাস্টারমশাই ছকুদাকে বেত মেরেছিলেন। হেলে-সাপ হাত দিয়ে ধরতে তাকে আমরা বহুদিন দেখেছি; বলত এগুলো কামড়াতে জানে না। আমাদের বাড়ির গোরুর চোখে একবার খোঁচা লেগে ঘা হয়েছিল; সাবানজলে ভিজানো ন্যাকড়া দিয়ে ও প্রত্যহ ঘা পরিষ্কার করে দিয়ে যেত।

আর কুকুরের বেলা তো কথাই নাই। ওর বাণ্টা নামের বোবা কুকুরটা চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ছকুদা বলত ছোটবেলা থেকে ভাতের মাড় খাওয়ানোর জন্যই কুকুরটা নাকি ডাকতে শেখেনি। বাণ্টাকে পেট ভরে ভাত না খাওয়াতে পারবার জন্য তার মনে মনে দুঃখ ছিল খুব। মনের কথা মনে রাখাই ছিল তার অভ্যাস, তবু আমরা বুঝতাম কোথায় তার ব্যথা। বাড়ির লোকে তাকে অপদার্থ মনে করত, কেউ যা করে না তাই সে করতে ভালবাসে, কেউ যা জানতে চায় না, সেই বিষয় জানবার উপর তার ঝোঁক; কাজের চেয়ে অকাজ বেশি। তবু ঠিক এই কারণেই আমরা তাকে ভালবাসতাম। একপাল কুকুর নিয়ে সে যখন জঙ্গলের দিকে যেত, তখন আমাদের সঙ্গে নিলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতাম। আমরা বলতাম শিয়াল শিকারে যাচ্ছি; কিন্তু শিয়াল মারা কোনোদিনই ছকুদার উদ্দেশ্য ছিল না। সে বলত, কুকুরদের জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ট্রেনিং দেবার জন্য। শিয়ালকে তাড়া করাই ছিল ট্রেনিং-এর প্রধান অঙ্গ।

পর পর তিনবার এক ক্লাসে ফেল করায় ছকুদাকে স্কুল ছাড়তে হয়। বাবা বললেন—'এবার ঘোড়ার ঘাস কাটো!' তাকে কাজের মানুষ করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় বাবা সেবার ছকুদাকে পাঠালেন ধান কাটিয়ে ধানের ভাগ আনতে ভাগচাষীর কাছ থেকে। ছকুদা গেল বাণ্টাকে সঙ্গে করে; সেখানে চার-পাঁচদিন থাকতে হবে। দু'দিন পরে রাখাল তরফদার ছকুদার বাবার

কাছে এসে বলে গেলেন, তাঁকে নিজে যেতে ধান-আনবার জন্য; ছেলের উপর নির্ভর করে থাকলে দু'আনা ধানও ঘরে আসবে না। ওদিক দিয়ে আসবার সময় তিনি দুদিনই দেখেছেন, ছকু মেঠো-ইঁদুরের গর্তের পাশে কোদাল নিয়ে বসে কুকুরটাকে উৎসাহ দিচ্ছে মাটি খোঁড়বার জন্য। বৃদ্ধের কথায় কান দেননি ছকুদার বাবা তখন। পরে যখন গোরুর গাড়িতে ধানের বস্তা নিয়ে ছকুদা বাড়ি ফিরল, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'মোটে এই ক'টা ধান?' ছকুদা বলল—'না, আরও খানিকটা আছে। এই বস্তাটায় আলাদা করে রাখা। ইঁদুরের গর্ত থেকে বার করেছি।'

আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না ছকুদার বাবা। 'সারাদিন ধরে এই করতিস! তুই ধান কাটিয়ে আনতে গিয়েছিলি, না বাঘ্টাকে ট্রেনিং দিতে গিয়েছিলি? বেরো! এখনই বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে!'

বোধ হয় এক-আধ ঘা প্রহারও দিয়েছিলেন।

সেই রাত্রিতে ছকুদা একবার এখান থেকে পালায়। তরফদারমশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবাকে—'কিছু টাকাকড়ি নিয়ে যায়নি তো বাড়ি থেকে? ওই ধান-টান বেচে?'

বাবা বলেছিলেন—'মনে তো হয় না!'

'তবে ফিরে আসবে শিগগিরই।'

তিন-চারদিন পর সে ঠিকই ফিরে এসেছিল। বাঘ্টা এ কয়দিন কিছু খায়নি। কেন নয়; ভাত দিয়েছিলেন ছকুদার মা; তবু খায়নি। কাঠবেরালিটাও পালিয়েছে।

বহু পীড়াপীড়িতে ছকুদা আমাদের কাছে বলেছিল যে, সে গিয়েছিল কলকাতায়। চিড়িয়াখানায় যদি কোনো চাকরি পাওয়া যায় সেই চেষ্টায়। হল না কিছু।

কলকাতার রাস্তা চিনে কেমনভাবে যে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল, সেইটাই সে সময় আমাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল। ছকুদা আমাদের চোখে আরও বড় হয়ে উঠল, এই পালাবার পর থেকে।

ঠিক হয়ে গেল রাখাল তরফদারের পিছনে এবার থেকে আরও বেশি করে লাগতে হবে।

শেঠদের পশ্চিম-বাগানে তাদের গোরু-মোষের বাথান। সেখানে একটা মোষের বাঁট থেকে ঢেমনা সাপ প্রতি রাত্রিতে দুধ খেয়ে যাচ্ছিল। মোষের বাঁটে সাপের দাঁতের দাগ দেখবার জন্য ছকুদা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল যে, একটা গোরু নিজের চোনা খাচ্ছে। ছকুদা বলল, গোরুরা নুন খেতে না পেলে মাঝে মাঝে চোনা খায়।

শেঠদের সংসারের দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার রাখাল তরফদারের উপর।

পাঁচুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধির ঝিলিক খেলে যায়।

'বুড়োটা নিশ্চয়ই গোরু-মোষের জন্য বরাদ্দ নুনের পয়সাটা মারছে।'

আমাদের কারও সন্দেহ নাই এ বিষয়ে। 'পাঁচু, তোরই তো সাহস সবচেয়ে বেশি আমাদের মধ্যে। শেঠদের গিন্নীঠাকরুনকে বলে আয়, তাঁদের গোরু-মোষগুলো চোনা খেয়ে খেয়ে মরছে, নুন না খেতে পেয়ে।'

গোমাতার সেবার কাজ, দেশের কাজ, দশের কাজ। দ্বিরুক্তি না করে পাঁচু ছুটে চলে গেল শেঠদের বাড়িতে।

শেটগিন্নী শুনে অবাক!

'নিজের চোনা খায়?'

'হ্যাঁ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।'

'তাই বলো! এই জন্য তাহলে দুধ উনুনে চড়ানোমাত্র ছানা কেটে গিয়েছিল পরশু!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। ছকুদা বলেছিল, ছানা কাটে ওরকম।'

'ওরে বিন্দি। ডাক্ তো দেখি তরফদারমশাইকে!' পাঁচু আর দাঁড়ায়নি সেখানে।

এর দিনকয়েক পরই তরফদারমশাই শেঠ-গৃহিণীকে বললেন যে, ছকুটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে; বাড়ির শাসন কড়া না হলে এমনিই হয়, ও ছেলে এই বয়সেই বাইরে রাত কাটাচ্ছে অথচ ওর মা-বাবা কিছু বলে না।

শেঠগিন্নী আবার পাড়ার লোকের কাছে বলেন যে, ছকুকে নাকি অর্ধেক রাত্রিতে পশ্চিম-বাগানে দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা বুঝি এসব কথার ইঙ্গিত। শুনে আমরা চটি; ছকুদা কিন্তু কোনো কথা বলে না; শুধু হাসেই, তাকে কিছুতেই তাতানো গেল না। শেষ পর্যন্ত আমরাই গেলাম বৃদ্ধকে চ্যালেঞ্জ করতে। বৃদ্ধ মিষ্টি কথায় জানালেন যে, ছেলেমানুষদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চান না; আর নিজের চোখকে তিনি অবিশ্বাসও করতে পারেন না।

আমাদের মনে পর্যন্ত খট্‌কা ধরে গেল। ছকুদাকে সেকথা বলাতে স্বীকার করল রাত্রে শেঠদের পশ্চিম-বাগানের বাথানে যাবার কথা।

'ছকুদা! ছি ছি ছি ছি ছকুদা!'

তখন ছকুদা পশ্চিম-বাগানে যাবার কারণটা বলে। শুনে আমরা থাতস্থ

হই। তখনই তাকে ধরে নিয়ে যাই শেঠগিন্নীর কাছে। ছকুদা তাঁর কাছে বলে যে, সে রাত্রিতে বাথানে থাকে কয়েকদিন থেকে, ঢেমনা সাপ কেমন করে মোষের বাঁট থেকে দুধ খায় তাই দেখবার জন্য। কাল রাত্রিতে প্রথম দেখতে পেল।

'সাপটাকে মারলি তো?'

'আমি মারি না কোনো জন্তুজানোয়ার।'

চলে আসবার আগে আমরা শেঠগৃহিণীকে উপদেশ দিয়ে এলাম, বাথানের চারিদিকে কার্বলিক এসিড ছিটিয়ে দেওয়াবার জন্য। এত ওষুধ জানেন তরফদারমশাই আর এটুকু জানেন না! আশ্চর্য!

বৃদ্ধের পিছনে লাগা আমাদের একটা খেলা হয়ে গেল। তিনি যত চটেন তত আমাদের উৎসাহ বাড়ে। করি আমরা, তিনি চটেন ছকুদার উপর।

এ বিষয়ে ছকুদার ঔদাসীন্যও একটু একটু করে কাটছিল। পিথো সাঁওতাল রাখাল তরফদারের কাছে গলগণ্ডের ওষুধ নিতে গিয়েছিল। তরফদারমশাই তাকে প্রত্যহ গোরুর দুধ খেতে বলেছিলেন। পিথো গরিব-মানুষ; প্রত্যহ গোরুর দুধ খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একরকম পোকা আছে যেগুলো নাকি পিঁপড়েদের গরু। আমরা ছকুদাকে বললাম, সেই পোকা দুটো খুঁজে বার করতে! শিমপাতার উল্টো দিক থেকে একটা আর শিমূলতলা থেকে আর একটা পিঁপড়েদের গোরু ছকুদা তখনই খুঁজে বার করে আনে। একটা খামের মধ্যে পোকা দুটোকে ভরে, আমরা পিথোকে পাঠালাম তরফদারমশায়ের কাছে। সে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এর দুধ খেলে তার গলগণ্ড সারবে কি না?

'কে পাঠাল তোকে এখানে? ছকুবাবু?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'আচ্ছা, যা এখন! আর জ্বালাতন করিস না।'

ছকুদা বয়সে আমার চেয়ে চার বছরের বড়। স্কুলে যায় না। কাজেই তার স্বাধীনতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। দুপুরে ছুটি। প্রত্যহ সে কুকুরের দল সঙ্গে নিয়ে পেরীসাহেবের কুঠির জঙ্গলের দিকে যেত। আমরাও যে স্কুল পালিয়ে তার সঙ্গে কোনোদিন কুঠির জঙ্গলের দিকে যাইনি, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি না।

রাখাল তরফদার পাড়ায় বলে বেড়াতে আরম্ভ করলেন যে, ছেলেরা স্কুল কামাই করে কুঠির জঙ্গলে যায় সিগারেট খাওয়ার জন্য। ছকুই হচ্ছে পালের

গোদা; ও-ই পাড়ার সব ছেলেদের খারাপ করে দিল। ও-ই শেখাচ্ছে সকলকে বিড়ি খেতে।

'এর একটা বিহিত করতেই হয় ছকুদা।'

ছকুদা বললে—'কাল দুপুরে।'

তার ঠোঁটের কোণের সাধা হাসিটুকু আজ আর নাই।

পরদিন বেলা দুটোর সময় বাণ্টা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির বারোয়ারী-তলার অশ্বথ গাছটার নিচে। ও এসেছে মালিকের পাইলট হিসাবে। অধীর হয়ে পিছনে তাকাচ্ছে। এসে পড়ল ছকুদা। নিচের ঠোঁট দুই আঙুল দিয়ে টেনে ধরে শিস দিচ্ছে। এত জোরে শিস এখানে আর কেউ দিতে পারে না।

ছুটে আসছে পাড়ার চার পাঁচটা কুকুর। যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। কুকুরগুলো এসেই বাণ্টার সঙ্গে মুখশোঁকাশুঁকি করে নিল। ওই আসছে ট্যানা। ওই এল মাথায় রুমাল বাঁধা ঘ্যাণ্টা আর হরেন। কুকুরগুলো ছুটে গেল তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বারোয়ারীতলায় নিয়ে আসবার জন্য। সবচেয়ে শেষে এল পাঁচু। তার হাতে একখানা কোদাল। বাড়ি থেকে লুকিয়ে কোদালখানা আনতে গিয়ে তার দেরি হয়েছে। ওই দেখেই কুকুরগুলো বুঝে গেল যে, আজ আর ছেলেখেলা নয় অন্য দিনকার মতো; আজ হবে সত্যিকার শিয়াল-শিকার; এতদিনকার ট্রেনিং-এর পরীক্ষা। উল্লাসে লাফালাফি করতে করতে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এই কুড়ের বাদশা মানুষগুলোকে।

এসে গেল কুঠির জঙ্গল। শরের ঝোপ, কুল, বাবলা, আর দরদ-ময়দা গাছের মধ্য দিয়ে জঙ্গলের পথ। ঝুরিভরা বটগাছটার কাছে গিয়ে কুকুরের দল থামে। ছকুদা গাছে উঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা খানকয়েক ছোট ছোট বাঁশের লাঠি নামিয়ে আনল। লাঠি-হাতে পাড়া থেকে বেরুলে বড় বেশি লোক-জানাজানি হয়ে যায়। তাই এই ব্যবস্থা।

দুর্গা! দুর্গা! আজ আসবার সময় বারোয়ারীতলায় প্রণাম করে এসেছে সকলে। এখন দেখা যাক। সবই ভগবানের হাত!

শিয়ালের গর্তের বিশ পঁচিশটা মুখ। এক একটা সুড়ঙ্গের মুখ এখানে আরম্ভ হয়ে বহুদূরে গিয়ে উঠেছে। এর সবগুলো শিয়ালরা ব্যবহার করে না; কতকগুলো আছে শুধু লোক ঠকাবার জন্য। এর মধ্যে কোন কোন সুড়ঙ্গ শিয়ালরা এখনও ব্যবহার করে তা বোঝে শুধু ছকুদা, বাণ্টা আর টম নামের ছোট্ট দোআঁশলা কুকুরটা! টম একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে পা দিয়ে

দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। অন্য কুকুরগুলোও গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্য গর্তের মুখগুলোকে পরখ করছে। এক একটা আবার গন্ধ পেয়েছে ভেবে ঢুকছে; আর একটু মাটি খোঁড়াখুঁড়ির পর গন্ধটা হারিয়ে গেল দেখে তখনই বেরিয়ে আসছে। বাণ্টাকে নিয়ে ছকুদা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে বহুদূরের শরের ঝোপের ধারের গর্তের মুখে। ছুট করে অন্য একটা মুখ দিয়ে একটা শিয়াল ছুটে পালাল। কয়েকটা কুকুর ছুটল তার পিছনে। ছকুদা চেঁচাল —'তোরা কেউ যাস না। হুলে! হুলে! করিস না। তাহলে কুকুরগুলো এখনই ফিরে আসবে; পাঁচু, তুই ওখান থেকে কোদাল দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে আয় এই দিকে।'

সুড়ঙ্গগুলো বেশি নিচে না। টমের সাহায্যার্থে পালা করে এক একজন সুড়ঙ্গ ধরে ধরে কোদাল চালিয়ে চলেছে। উপরের মাটি ধসে ধসে পড়ছে! ছকুদার কথায় সকলে বুঝে গিয়েছে যে, আর একটা শিয়াল ভিতরে আছে এখনও। হাঁপাতে হাঁপাতে কুকুরগুলো ফিরে এল। জিভ বেরিয়ে গিয়েছে তাদের শিয়ালের পিছনে ছুটে। ছকুদার শিকারের কৌশল হল—যাতে দুটো মুখ ছাড়া সুড়ঙ্গের বাকি মুখগুলো ভিতরের শিয়ালটা আর ব্যবহার করতে না পারে। কোদালের মাটি দিয়ে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল! শিয়ালটা একবার মুখ বার করে, গতিক সুবিধার নয় বুঝে আবার মুখ ঢুকিয়ে নিল গর্তর ভিতর। আর রক্ষা নাই তার। বোঝা গিয়েছে ঠিক কোথায় আছে।

'রেডি।'

লাঠি মারবার সময় সে কী উল্লাস ও উত্তেজনা! বাণ্টা আর টমের ভাগ্য ভাল যে তাদের উপর এক ঘাও লাঠি পড়েনি ওই গোলমালের মধ্যে। সাফল্যের উত্তেজনা কুকুরের দলের মধ্যে মানুষদের চেয়েও বেশি। গম্ভীর শুধু ছকুদা।

সন্ধ্যা তখন হব হব। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলে ছকুদার নির্দেশ মতো। বুনোশুয়োর বার হয় এখানে মাঝে মাঝে। সেইজন্য এই সতর্কতা। দেরি করে বাড়ি ফিরলে সকলকেই বকুনি খেতে হবে। তার উপর গা ছমছম করছে। ওই গাছটার পাখিগুলো হঠাৎ অমন কিচির-মিচির আরম্ভ করল কেন?'

ছকুদা বলল—'সাপটাপ কিছু হবে। আচ্ছা যা, তোরা এখন বাড়ি যা!'

ছকুদাকে এখন সেখানে বসে থাকতে হবে অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

পরের দিন সকাল বেলাতেও রাখাল তরফদার বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারলেন দুপুরে পাঁচিলের উপর শকুন বসায়। ল্যাং-বোম গাছটার একটা মোটা ডাল থেকে ঝুলছে এক মরা পেটফোলা শিয়াল। মাছি ভনভন করছে, পিঁপড়ে থুকথুক করছে, কাকে চোখ ঠোকরাচ্ছে!

মেথর পাওয়া গেল না তখন। বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ নাই। পাড়ার লোকে মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লাঠির ডগায় কাস্তে বেঁধে, গামছা পরা তরফদারমশাই দড়ি কাটবার জন্য গাছতলায় এগিয়ে এলেন! ধপ্ করে গাছের উপর থেকে মরা শিয়ালটা পড়ল নিচে। একটুর জন্য তার পায়ের উপর পড়েনি! গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়েছে দর্শকদের। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন যেন চেঁচাল গলা বিকৃত করে—'এইবার গোদের চিকিৎসা হবে রে-এ-এ-এ।'

আঙুল দিয়ে নাক টিপে, আর এক হাতে দড়ি ধরে টানতে টানতে রাখাল তরফদার শিয়ালটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন।

এই দিনই শেষ নয়। এর পর আরও বহুবার ওই ল্যাং-বোম আমের গাছে মরা শিয়াল, ধাড়ীশ, বনবিড়াল, সাপ, কাক, বক ইত্যাদি ঝুলতে দেখা গিয়েছে। কড়া পাহারা রেখেছেন তরফদারমশাই রাত্রিতে; কিন্তু কোনোদিন কাউকে ধরতে পারেননি।

ছকুদা মুদীখানার দোকান খোলবার পর ছেলেদের আড্ডা তার দোকান-ঘরে বসা আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু তরফদারমশায়ের আমগাছে মরা জানোয়ার ঝোলা তবু বন্ধ হয়নি। ছেলেদের এ একটা খেলা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; দুপুরে দোকান বন্ধ রেখে, ছকুদা কুকুর নিয়ে শিয়াল শিকারে বার হত।

ছকুদারই তো দোকান। কত আর ভাল চলবে। সামান্য পুঁজি। হিসাব রাখবার ক্ষমতা নাই। বাবা দোকান খুলে দিয়েছেন; তাই বাধ্য হয়ে দোকান চালানো। সকলেই জানত এ দোকান চলবে না। তবু যে ক'দিন চলে।

তরফদারমশাই মাঝে মাঝে ছকুদার বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করেন যে, যেখানে অতগুলো বকাটে ছোকরা সব সময় বসে বিড়ি-সিগারেট খায় সেখানে কোনো জিনিস কেনবার জন্য ঢুকতে সংকোচ বোধ হয় তার মতো খদ্দেরদের। দোকানও আবার সেই রকমই। কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নাই!······আরও কত রকমের অভিযোগ!

প্রায়ই এইসব নিয়ে ছকুদার বাবা বকাবকি করেন। কোনো উত্তর না দিয়ে ছকুদা শুনে যায়। আমাদের কাছে বলে—'নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবোলা জন্তুজানোয়ার মারা আরম্ভ করলাম, শুধু বুড়ো তরফদারটার মুখ বন্ধ করবার জন্য। কিন্তু অসম্ভব! আর এখানে থাকা চলবে না দেখছি।'

ওর দোকানেই আড্ডা। ও কিন্তু কোনোদিন তার মধ্যে এক-আধটার বেশি কথা বলত না। ছকুদা প্রাণ খুলে কথা বলত শুধু বাণ্টার সঙ্গে। বোবা কুকুরটার চোখের ভাষা সে বোঝে।

এই বাণ্টাই হয়েছিল তার পথের বাধা। একদিন ছকুদা আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে বাণ্টাকে রাখতে পারবি তোদের বাড়িতে?'

'চলে যাবে? পাগল না ক্ষ্যাপা!'

'ভাতের ফেন দিলেই ওর চলবে।'

'বলো তো বুড়োটার বাড়িতে ঢিল ফেলা আরম্ভ করি রাত্রিতে? না হয় ওর বাগানের সর্পগন্ধা, ঘৃতকুমারী আর যত গাছগাছড়া আছে উপড়ে ফেলে দিই?'

'না, না, সে কথা নয়।'

'তবে চলে যাবে বলছ? যাবে কোথায়?'

'প্রথমে যাব লখ্‌নৌ।'

'সেখানে কী?'

'চিড়িয়াখানায় কাজের চেষ্টায়।'

'যদি কাজ না দেয়?'

'দেখব চেষ্টা করে। গভর্নমেন্টের বনবিভাগেও শুনেছি অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়।'

'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তোমার ছকুদা। সব জায়গায় ঘুরতে গেলে যে টাকা লাগে।'

'সে টাকা আমি জমাচ্ছি।'

'তার চেয়ে জেলার ভেটারিনারি হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের কাজ শেখ না। তবু তো কাছাকাছি থাকবে।'

'রুগ্ন জানোয়ার আমার ভাল লাগে না।'

আমাকে বারণ করেছিল কাউকে বলতে; কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আমি না বলে থাকতে পারিনি। এ নিয়ে আমাদের বিস্তর সলাপরামর্শ চলে। টাকা জমিয়ে ও রেখেছে কোথায়, সেই খবরটা জানবার জন্য আমরা

তক্কে তক্কে থাকি। আমাদের মধ্যে পাঁচুরই এসব কাজে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

ঠিক খুঁজে বার করেছে সে। শুনে আমরা খুব হাসি। ছকুদার কাণ্ড! টাকা রাখবার আর জায়গা পেল না সে। অদ্ভুত!

দোকানঘরের দেয়ালের একটা পুরনো ইঁদুরের গর্তের মধ্যে সে লুকিয়ে গুঁজে রেখে দেয় নোট।

ঠিক হল ছকুদার যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। যেমন করেই হোক। ও যেন কিছুতেই টের না পায়, দেখিস।

পাঁচু দশ টাকার নোট বার করে এনেছে খানকয়েক ইঁদুরের গর্তের মধ্য থেকে। এ নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করি নিজেদের মধ্যে। কিন্তু খবরদার!

দিনকয়েক পর এক সকালে হুলস্থূল কাণ্ড পাড়ায়। কী ভেবে ছকুদা এই গাছটাকেই বেছেছিল জানি না। রাখাল তরফদারের ল্যাং-বোম আমগাছের ঠিক সেই ডালটা থেকে তার দেহ ঠিক সেই রকম ঝুলছে। নিচে বাণ্টা বসে।

দোকানঘরের দেয়ালের গর্তটা থেকে নিচু পর্যন্ত খোঁড়া, মেঝেতে একটা শাবল পড়ে আছে। ও বোধ হয় ভেবেছিল যে ইঁদুরটা খুনসুড়ি করেছে ওর সঙ্গে।

গাছের গুঁড়ির উপর শেষ কোপ মেরে কালুসর্দার আর তার ছেলে একটু দূরে সরে গেল। মড়মড় করে একটা শব্দ হল, রাখাল তরফদারের কীর্তি-গরিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময়।

নিজেদের বিবেক পরিষ্কার নয় বলেই বোধ হয় ভাবতে ভাল লাগছে যে, ছকুদা এই চেয়েছিল।

## বন্দি-কপালিয়া

আপিসে অবশ্য একবার গিয়েছিলেন হাজরিটা দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু না গেলে ক্ষতি ছিল না। খেলার জোরেই তাঁর চাকরি; আর বড়সাহেবই এ অঞ্চলের লন্-টেনিস-অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট। কাজেই সাতখুন মাপ।

আপিস থেকে ফিরে পিণ্টু বোস বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে শিথিল করে দিয়েছেন। বিকালের

কঠোর পরীক্ষার প্রস্তুতির অঙ্গ এগুলো। রেডিওর গানের আওয়াজ খুব আস্তে করে দেওয়া হয়েছে, যাতে স্নায়ুগুলো সুরের মৃদু মধুর সুড়সুড়ি খেয়ে ঝিমিয়ে পড়তে পারে কিছুক্ষণের জন্য। অথচ ঘুমিয়ে পড়তে চান না তিনি। কারণ ঘুমের পর খোলা রৌদ্রের তীব্র আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চোখের অনেক সময় লাগে। নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করবার কি আর জো আছে! খোকা ঘ্যান ঘ্যান করছে তখন থেকে।

'ওগো, খোকার পেট কামড়াচ্ছে না তো? একটু টিপেটুপে দেখ তো পেটটা!'

'না পেট তো স্বাভাবিক।'

'খিদে পায়নি তো?'

'খাওয়ার সময় তো এখনও হয়নি। কি রে খোকা বিস্কুট খাবি? হ্যা বিস্টু। বিস্কুট কখনো বলবে না ছেলেটা।'

'মালবিকা, কটা বাজল?'

'একটা বাজতে তিন মিনিট।'

'এইবার তোড়জোড় আরম্ভ করতে হয়।'

'হ্যা।'

'নইলে আবার শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করতে হবে। তোমার সাজগোজ আরম্ভ করে দাও এইবার।'

'আজ সাজগোজ তোমার।'

'আমার তয়ের হয়ে নিতে দেরি হবে না। দেরি হয় তোমাদেরই।'

'না, না, মোটেই দেরি হবে না।'

'র‍্যাকেটের গাটের তেলটা মুছে দাও।'

'সে আমি আগেই মুছে রেখেছি।'

'ওটা আবার কান্না জুড়ল কেন? বিস্কুট শেষ হয়ে গেল বুঝি?

'হ্যা।'

'ওকে একটু ঘষে মুছে নাও জামা ইজের পরবার আগে। আর তুমিও সেরে নাও চট করে।'

'হ্যা যাই।'

এইবার উঠলেন পিণ্টু বোস ইজিচেয়ার থেকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখছেন। ক্যাম্বিসের জুতোয় খড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে। তোয়ালে, রুমাল, মোজা, গেঞ্জি, জামা, হাফপ্যাণ্ট, দুখানা র‍্যাকেট, একটি অ্যাটাচিকেসে অতিরিক্ত কিছু জিনিস এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে দিয়েছে মালবিকা।

'Che॰ ing gumটা কোথায় ?'

ওঘর থেকে মালবিকা বলল—'ওই অ্যাটাচিকেসের মধ্যে। ভাজামশলাও আছে কৌটোতে।' তার কোনো কাজে ত্রুটি নেই।

খোকার পোশাক বদলানো হল। সে আবার কান্না জুড়েছে।

'ওর আজ হল কী ? এই রকম কাঁদুনে ছেলে নিয়ে কি অত লোকজনের মধ্যে যাওয়া উচিত ? তুমি বাড়িতে থেকে গেলেই পারতে মালবিকা।'

'আমি যাবই। টুর্ণামেন্টে তোমার সেমিফাইন্যাল খেলা ; আর আমি দেখব না ? সেখানে কাঁদে তো ও গাড়ির মধ্যে বসে থাকবে রামটহলের কাছে। খোকা! ছি, কাঁদে না! খোকা গাড়িতে চড়ে বেড়ু করতে যাবে আমাদের সঙ্গে ? হ্যাঁ, ভোঁ ভোঁ। ওরে রামটহল, খোকাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বস তো।'

ঘড়ি দেখলেন পিণ্টু বোস। হ্যাঁ, এইবার সময় হল। সব ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করছে মালবিকা। দেয়ালের মা কালীর ছবিখানিকে প্রণাম করে, পিণ্টু বাদ এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। রামটহল গাড়ির সম্মুখের সিট্ থেকে খোকাকে তুলতে যাবে অমনি ওয়াক করে একঝলক বমি করে ফেলল খোকা সিটের উপর। হাঁ হাঁ করে উঠলেন পিণ্টু বোস। ছুটে এল মালবিকা। জল আনতে ছুটল রামটহল।

'জানি। ঠিক এই যাওয়ার সময়। তোমার আর গিয়ে কাজ নেই মালবিকা। তুমি খোকাকে নিয়ে বাড়িতে থাক।'

গাড়ির সিট্ পরিষ্কার করা হল। খোকাকে ধোয়ানো-পোঁছানো হল। ততক্ষণে পিণ্টু বোসের মেজাজ আবার একটু নরম হয়ে এসেছে। ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে বললেন—'উঠে পড় গাড়িতে। আর দেরি করো না।'

দুর্গা! দুর্গা! গাড়ি চলতে আরম্ভ করবার পর মালবিকা বলল—'এই জন্যই খোকাটা তখন থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছিল।'

অর্থাৎ, ছেলেমানুষে দুধ তুলেছে ; ওতে কোনো দোষ হয় না। ওটাকে যাত্রার পথের বিঘ্ন বলে ভাববার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

দুর্গা দুর্গা। চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রণাম করল মালবিকা 'তুমিও নোমো কর খোকা। হ্যাঁ, এমনি করে।' খোকার হাত জোড় করিয়ে কপালে ঠেকিয়ে দিল সে।

ঘন করতালির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন খেলতে নামলেন। দুই জনেরই মুখে জোর করে আনা হাসি। যুগোস্লাভিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় কুলোভিক। ডেভিস কাপে খেলেছেন। গত বৎসর উইম্বলডন্ প্রতিযোগিতায় উনি শেষ ষোল জনের মধ্যে উঠেছিলেন। এখানকার ফাইন্যালে উনিই জিতবেন একথা

সকলের জানা। তাই টেনিসকোর্টে নামবার সময় পিণ্টু বোসের দেহভঙ্গি আড়ষ্ট ; পা যেন জড়িয়ে আসছে। এ জিনিস শ্যেনদৃষ্টি দর্শকদের নজর এড়ায় না। সকলের সহানুভূতি তার দিকে।...তোমার কপাল! 'টাই'-এর অন্য লাইনে পড়লে তোমার ফাইন্যালে যাওয়া আটকায় কে? এর আর কী করবে বলো!...

দর্শকদের চাউনির এই নীরব ভাষা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বলেই পিণ্টু বোস কিছুতেই সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছেন না!

আরম্ভ হয়েছে খেলা। কুলোভিকের বুলেটের মতো সার্ভিস একটাও তুলতে পারছেন না। যত সাবধান হয়ে খেলতে চাচ্ছেন, তত খেলা খারাপ হচ্ছে। এত খারাপ যে পিণ্টু বোস খেলবে সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। প্রথম সেট্ কুলোভিক জিতল ছয়-এক গেমে।

হাওয়া বদলাল দ্বিতীয় সেট্ থেকে। মরিয়া হয়ে মেরে খেলা আরম্ভ করেছে পিণ্টু বোস। হারতেই যখন হবে, তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারার চেয়ে পিটিয়ে খেলে হারাই ভাল—এই হচ্ছে তার মনোভাব। কুলোভিকের সার্ভিস বুলেটের চেয়েও জোরে রিটার্ন করছে। প্রতিটি বল এই রকম জোরে জোরে মারছে। আশ্চর্য! একটা বল কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়ছে না, একটা বল নেটে গিয়ে লাগছে না! ঠিক কোর্টের যে দিকটা খালি সেই দিকটায় বল গিয়ে পড়ছে। ভলি, হাফ্ ভলি, ফোর্ হ্যাণ্ড, ব্যাক্হ্যাণ্ড সব যার তার আয়ত্তে। ঘোড়ার মতো ছুটতে হচ্ছে কুলোভিক্কে। যেদিকে ইচ্ছা, যেমন-ভাবে ইচ্ছা তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পিণ্টু বোস। মনে হচ্ছে যেন বাইরের কোনো শক্তির সঞ্চার হয়েছে তার মধ্যে। দর্শকরা অবিরাম করতালি দিচ্ছে তার মণিবন্ধের ভেলাকি দেখে। সব চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে কুলোভিক্। এমন মারাত্মক নিপুণতার সঙ্গে তাল রাখবার সামর্থ্য তাঁর নেই।

পাঁচ সেট্ খেলবার দরকার হল না! তুমুল হর্ষধ্বনি আর করতালির মধ্যে খেলা শেষ হল। তিন-এক এ জিতেছে পিণ্টু বোস।

সাংবাদিকরা ফটো তুলে নিল—পরাজিত কুলোভিক্ নেটের ওপার থেকে করমর্দন করছে বিজেতা পিণ্টু বোসের সঙ্গে।

দর্শক, সাংবাদিক, অটোগ্রাফ-শিকারী পরিচিত অপরিচিতের ভিড় ঠেলে পিণ্টু বোস এগিয়ে গেলেন মালবিকা আর খোকার দিকে। বড়সাহেব হেসে দূর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বহু লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার একটু কাছে আসতে চায়, কিন্তু এখন তার সময় নেই। ম্যাসাজ (Message) সে করবে না; স্নান এখন করবে না এখানে; কাপড় জামা

বদলাবে বাড়ি গিয়ে ; আবার দেখা হবে পরে। এস মালবিকা। গাড়ি নিরাপদে বার করতে পারলে হয় এখন এই ভিড়ের মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি ; আবার দেখা হবে।

'খোকা ! খোকা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ?'

'গাড়ির দোলানিতে ঢুলুনি আসছে।'

'ও কি খুব জ্বালাতন করেছিল তোমাকে ?'

'না, কান্নাকাটি মোটেই করেনি। প্রথমে লোকজন দেখে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারপর আলাপ জমিয়ে নিল পাশের সিটের লোকদের সঙ্গে। কে যেন বলে দিল, ও তোমার ছেলে। তারপর থেকে কি খাতির ওর আর আমার। টফি চকোলেটের ছড়াছড়ি। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সকালে ব্যায়াম কর কিনা। তুমি সকালে ভিজা ছোলা খাও সে কথাও আমি বলে দিয়েছি। তোমার বড়সাহেবের স্ত্রীও একবার এসে খোকাকে আদর করে গেলেন। কাল রাত্রিতে তাঁদের বাড়ির পার্টিতে আমাকে বার বার যেতে বলে গেলেন তোমার সঙ্গে। আমি বলি, ছেলে সামলাবার লোক নেই আমার বাড়িতে। কিছুতেই শুনবেন না সে কথা। বললেন ছেলেকে নিয়ে আসতে—কোনো সংকোচের কারণ নেই—তাঁর বাড়িতেও ছোট ছেলে-মেয়ে আছে—ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবার লোক থাকবে—কোনো চিন্তার কারণ নেই—প্রেসিডেন্টের পার্টি—তাতে ফাইন্যালিস্টের স্ত্রী আসবেন না তাও কি হয়—ফাইন্যালিস্ট বলা বোধ হয় ভুল হল, বিজেতা বলা উচিত—কালকে মিস্টার বোসের জয়লাভ সুনিশ্চিত—আপনার কোনো আপত্তি শোনা হবে না—আসতেই হবে।...'

আরও কত কথা বলে চলেছে মালবিকা। তার মধ্যে কতক কতক কানে যাচ্ছে পিন্টু বোসের। রামধনুর সেতু বেয়ে, হাওয়ায় উড়ে চলেছে বিজয়ী বীর, স্বর্গের সিংহদ্বারে হানা দিতে।

ভোরবেলাতেই বড়সাহেবের ফোন।

অভিনন্দন ! রাত আটটায় পার্টি—মনে আছে তো ? মিসিজ বোসকে নিয়ে আসবেন। কোনো ওজর শোনা হবে না। কুলোভিক্ ও ফুজিকাওয়াও আসবেন পার্টিতে। বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়রা সকলেই থাকবেন। যে কুলোভিক্‌কে হারিয়েছে, সে যে অনায়াসে ফুজিকাওয়াকে পরাজিত করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আচ্ছা গুড্ লাক্।

মালবিকা তিনখানা কাগজ নিয়েছে আজ। তিনখানাতেই পিন্টু বোস আর কুলোভিকের ছবি। খেলার পাতার হেডলাইনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে

গেলেন পিণ্টু বোস। প্রথমখানায় আছে—'দৈত্য-হন্তারক পিণ্টু বোস।'

দ্বিতীয় কাগজখানায়—'সম্পূর্ণ একতরফা খেলা। টেনিসে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' তৃতীয়খানায় আছে—'সাবাস পিণ্টু বোস! কুশোভিক্‌ হয়েছেন তাঁর চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের কাছে।'

কাগজ পড়বেন কি; ফোন আর দর্শনপ্রার্থীদের কল্যাণে স্নানাহার বন্ধ হবার যোগাড়! পাড়ার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আজ দলে দলে আসছে পিণ্টু বোসের অটোগ্রাফ নেবার জন্য; এতদিন মনে পড়েনি। কয়েকজন সাংবাদিক দেখা করে গেলেন। একজন খেলার সাজ-সরঞ্জামের দোকানদার এসে অনুমতি নিয়ে গেলেন, তাঁদের প্রস্তুত একটা নূতন র‍্যাকেটের নাম তাঁরা পিণ্টু বোস রাখতে চান। কাল সেমিফাইন্যালের দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর নিরিবিলিতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে নিতে পেরেছিলেন; আজ ফাইন্যালের দিন সে উপায় আর নেই।

দুটো থেকে খেলা আরম্ভ। তার আধঘণ্টা আগে সেখানে পৌঁছে যাওয়াই ভাল। ভয় ভয় করে, যদি কালকের মতো অত ভাল আজ না খেলতে পারেন! এত শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও প্রশংসার পর আজ যদি তাঁর খেলা খারাপ হয়! আজকের কাগজে রাশিফল দেখবার প্রচণ্ড ইচ্ছা অতিকষ্টে দমন করেন। যদি খারাপ লেখা থাকে—দরকার কি ওসব বিপদ ডেকে আনবার, সামান্য কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য!

'খোকা! খোকা কোথায়?'

'ওই যে খেলা করছে বারান্দায়। আজ একেবারে লক্ষ্মী ছেলে।'

'সব ঠিক করে রেখেছ তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব আর বলতে হবে না।'

'রাত্রিতে পার্টিতে যাবার কাপড়চোপড়?'

'হ্যাঁ। আমার, তোমার, খোকনের সব আলাদা আলাদা করে রাখা আছে।'

'এইবার তয়ের হয়ে নাও। সময় হয়ে এল। রামটহলকে ডাক তো; খোকাকে কালকের মতো নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাক।'

বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পক্ষে এই সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

মালাবিকা খোকাকে নিয়ে গিয়ে গাড়ির সম্মুখের সিটে বসাল।

'ভোঁ ভঁক্‌-ভঁক্‌। খোকা এই দেখ কেমন বাজছে—ভঁক্‌ ভঁক্‌। রামটহল খোকার পাশে এসে বস তো! মধ্যে মধ্যে হর্ন বাজাস, তাহলেই চুপ করে থাকবে।'

একটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

পিণ্টু বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খোকাকে আদর করা আরম্ভ করলেন। তাকে তুলে উপরে ছুঁড়ে দেন, আর নিচে পড়বার সময় আবার লুফে নেন। খোকন হেসে কুটি কুটি। বারকয়েক এইরকম করার পর, খোকনকে আবার গাড়ির সিটে বসিয়ে তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকলেন।

'মালবিকা, আর সময় নেই। তুমি একবার দেখ তো খোকাকে।'

মালবিকা এসে খোকাকে বারকয়েক লোফালুফি করবার পর, আবার মোটর গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে গেল।

পিণ্টু বোস প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

স্ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালেন—'না।'

'একটু দুধ দাও খোকাকে।'

দুধ খাইয়ে আবার খোকাকে এনে বসানো হল মোটর গাড়ির সিটে।

'ভোঁ উঁক্ উঁক্ উঁক্ উঁক্।' খোকার খুব স্ফূর্তি।

ভাগ্য আজ বোধ হয় বিরূপ, কিন্তু পিণ্টু বোস উদ্যোগী পুরুষ; হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় হয়ে গিয়েছে। খোকাকে নামিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে খেলা আরম্ভ করলেন।

'খোকা, আনি-মানি-জানি না করতে পার? এই এমনি করে—এমনি করে। আনি-মানি জানি না; পরের ছেলে মানি না। আনি-মানি জানি না; পরের ছেলে মানি না।'

বারকয়েক খোকনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ঘুরপাক খেতে হল পিণ্টু বোসকে।

খোকার এ খেলা পছন্দ নয়। মালবিকাও চায় না যে একবড় ম্যাচ খেলার আগে তার স্বামী এমন ভাবে ঘুরপাক খান। খেলবার সময় যদি মাথা ঘোরে বা গা বমিবমি করে ওঠে! ভাবতেও ভয় হয়।

'তুমি ছাড়, আমি দেখছি। দৌড়তে পার খোকা? দেখি খোকা কেমন দৌড়তে পার আমার সঙ্গে।'

হাতের আঙুল ধরে মালবিকা খোকাকে কিছুক্ষণ দৌড় করাবার চেষ্টা করল। এতক্ষণকার ধস্তাধস্তিতে খোকা ক্লান্ত হয়েছে; কিছুতেই দৌড়তে রাজী নয়। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে স্বামী-স্ত্রীর মুখচোখে।

'একটা তেইশ। রামটহল খোকাকে নিয়ে একটু ব'স তো গাড়িতে। ভোঁ উঁক উঁক খোকন!'

'একটু জল খাইয়ে দেখলে হয়।'

শেষ চেষ্টা। গাড়ির সিটে উপবিষ্ট খোকাকে একটু জল খাইয়ে দিতে গেল মালবিকা। খোকা কিছুতেই খাবে না। ধস্তাধস্তি বেধে গেল। ঠাস করে খোকার গালে এক চড় লাগাল মালবিকা।

'বদ ছেলে কোথাকার! দিন দিন বদ হচ্ছেন!'

খোকা কান্না জুড়েছে। এই ছেলেটার জন্য সব মাটি হল বুঝি আজ। এতক্ষণকার এত চেষ্টা সব বিফল হল। খোকাকে কিছুতেই কালকের মতো গাড়ির সম্মুখের সিটে বসি করানো গেল না। কপাল।

দেড়টা বেজে গিয়েছে। মা কালীর ছবিতে প্রণাম করে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উঠে গাড়িতে বসলেন। গাড়ি স্টার্ট দিল।

দুর্গা! দুর্গা!

ফাইন্যাল খেলা। সমারোহ কালকের চেয়ে অনেক বেশি।

পিণ্টু বোস প্রথম থেকে পিটিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। ফুজিকাওয়া সাবধানী খেলোয়াড়। তার প্রতিটি বল ওজন করে মারা। ঠাণ্ডা মেজাজ; মুখ দেখে মনের ভাব বোঝাবার উপায় নাই। চোখ-ধাঁধানো খেলার পক্ষপাতী সে নয়; কোনো রকমে পয়েন্ট জেতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আজ পিণ্টু বোসের হল কী? যা মারে তাই ভুল হয়। নেটে লাগে, না হয় বাইরে চলে যায়। র‍্যাকেটের সেই যাদু-পরশ গেল কোথায়! নিক্তিতে-মাপা কালকের সেইসব মার কি একেবারে ভুলে গেল? এত নাস্তানাবুদ কেন?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারছে পিণ্টু বোস। পড়তা খারাপ তার আজ।

দর্শকদের সহানুভূতি ক্রমেই হারাচ্ছে।

'কব্জিতে ব্যথা নাকি বাবা!' 'কাল আন্দাজে ভাল খেলেছিলে।' 'দুম দাম্ করে এলোপাতাড়ি মারলেই কি তাকে টেনিস খেলা বলে! নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো!' 'এখানে মুগুর ভাঁজতে আসনি পিণ্টু বোস!' 'হোপ্‌লেস্।' 'কপাল যেদিন খারাপ হয়, সেদিন এমনি হয়!'

একটা সেটও নিতে পারে নি পিণ্টু বোস। পর পর তিন সেট হারায়, খেলা শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান, অটোগ্রাফ-শিকারী, সব আছে, কালকের মতন; কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি। নেটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে জেতা ও বিজিতের করমর্দনও আছে। নেই শুধু কালকের সেই পিণ্টু বোস। রানার্স-আপ্ কাপটা নেবার সময় সে জোর করেও মুখে হাসি আনতে পারল না।

তার আর এখন এখানে অপেক্ষা করবার সময় নেই। স্ত্রী আর খোকাকে

নিয়ে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। রাত আটটায় প্রেসিডেন্টের দেওয়া ডিনার পার্টি। স্নান করে পোশাক বদলে যেতে হবে।

'এ আমি আগেই বুঝেছিলাম।'—এই হল স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কথা গাড়িতে।

মালবিকারও মতদ্বৈধ নেই এ বিষয়ে। তাই সে চুপ করে রয়েছে।

খোকা কী যেন বলতে চায়। গাড়ির হর্ন সংক্রান্ত কী যেন একটা জরুরি কথা তার মনে পড়েছে। প্রথমে মাকে ডাকল। তারপর বাবাকে ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। দুইজনই অন্য দিকে তাকিয়ে।

ডিনারে যাওয়ার ইচ্ছা নেই; তবু যেতে হবে। না গেলে দেখায় খারাপ। বড়সাহেব কী ভাববেন। বিদেশী খেলোয়াড়রা ভাববে যে পিণ্টু বোস এল না হেরে গিয়েছে বলে। মালবিকাকেও যেতে হবে ছেলে নিয়ে বড়সাহেবের স্ত্রীর অনুরোধ। অনুরোধ না, হুকুম।

না না, খেলোয়াড়দের মন হবে উদার। হারজিতে কী আসে যায়। তো আর নয়, এ হচ্ছে খেলা। সাড়ে সাতটার সময় গেলে, ঠিক আটটা সময় বড়সাহেবের ওখানে পৌঁছানো যাবে।

মালবিকা বলল—'হ্যাঁ, আগে পৌঁছে কোনো লাভ নেই।'

রওনা হবার আগে মালবিকা গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'বাড়ি ছেড়ে আবার পাড়ায় টহল মারতে বেরোস না যেন রামটহল!'

অত বড় পার্টি। প্রথমে গিয়েই কী দেখবে, কী বলবে, কী করবে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে মনে মনে। নিরিবিলিতে ভাববারও কি জো আছে। খোকন ঘ্যান ঘ্যান করছে। পার্টি আরম্ভ হবার পর কান্না জুড়লে কেলেঙ্কারি; রামটহলকেও সঙ্গে নিয়ে আসা হয়নি। প্রায় এসে গেল বড়সাহেবের বাড়ি।

'কী হয়েছে খোকন? ওখানে গিয়ে খোকা কত বিস্কুট খাবে, টফি খাবে চকোলেট খাবে। না খোকা?'

একটা বিদ্‌কিচ্ছি আওয়াজ বার হল খোকার গলা থেকে।

অ্যাঁ! কী হল?

খোকা বমি করে ফেলেছে—নিজের জামা ইজেরে, মালবিকার কাপড়ে-চোপড়ে। গাড়ির সিটেও। ঘ্যাঁচ করে একটা হেঁচকা টান পড়ে গাড়ি থামল।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট দেরি। এই নোংরা কাপড় পরে পার্টিতে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় নেই। যে যা ভাবে ভাবুক।

ঠাস্ করে খোকার গালে এক চড় মারল মালবিকা।

—শেষ—